তাওহীদের ডাক

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১২

আরাকানে রোহিঙ্গা উৎপীড়ন

এক রক্তমাখা ইতিহাস ও মানবতার লজ্জা

সাক্ষাৎকার :

মুহতারাম আমীরে জামা'আত

- তাওহীদের পরিচয়
- রামাযান পরবর্তী করণীয় সমূহ
- বিদ'আতের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ
- মসজিদে নববীর ইতিহাস
- ভারতে মুসলমানদের মুখোমুখি

Contents

The Call to Tawheed

তাওহীদের ডাক

১০ম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১২

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
সম্পাদক
মুযাফফর বিন মুহসিন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
নূরুল ইসলাম
নির্বাহী সম্পাদক
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০৭২১-৮৬১৬৮৪
মোবাইল : ০১৭৪৪৫৭৬৫৮৯
ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com
ওয়েব : www.at-tahreek.com/tawheederdak

মূল্য : ২০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও মহানগর প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

➪ **সম্পাদকীয়** ২
➪ **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা** ৩
➪ **আক্বীদা**
তাওহীদের পরিচয় ৫
শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন
➪ **তারবিয়াত**
রামাযান পরবর্তী করণীয় সমূহ ৮
আব্দুল আলীম
➪ **তাজদীদে মিল্লাত**
বিদ'আতের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ ১০
শরীফুল ইসলাম মাদানী
➪ **আহলেহাদীছ আন্দোলন**
দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন ১৩
ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
➪ **বিশেষ নিবন্ধ**
মসজিদে নববীর ইতিহাস ১৬
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
➪ **মনীষীদের লেখনী থেকে**
আধুনিক যুগের নতুন ফিৎনা ২০
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদভী
➪ **সাক্ষাৎকার**
মুহতারাম আমীরে জামা'আত ২৬
➪ **সাময়িক প্রসঙ্গ**
আরাকানে রোহিঙ্গা উৎপীড়ন : এক রক্তমাখা ইতিহাস ও মানবতার লজ্জা ২৯
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহীম
➪ **পরশ পাথর**
গ্রীক তরুণী ও আমেরিকান প্রফেসরের আলোকিত জীবনে ফেরা ৩৬
রেযওয়ানুল ইসলাম
➪ **ধর্ম ও সমাজ**
ভারতে মুসলমানদের মুখোমুখি ৩৯
ফিরোজ মাহবুব কামাল
➪ **শিক্ষাঙ্গণ**
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন যুগান্তকারী সেই মানুষগুলো ৪৪
এস.এম. রিয়াযুল ইসলাম
➪ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়**
আমাদের শারীরিক গঠন ও আল্লাহ্‌র অসীম কুদরত ৪৭
হারুন ইয়াহইয়া
➪ **তারুণ্যের ভাবনা**
সুন্নাতের দুর্ভিক্ষ ও দৃপ্ততেজী তারুণ্য ৪৯
ইলিয়াস বিন আলী আশরাফ
➪ **জীবনের বাঁকে বাঁকে** ৫১
➪ **সংগঠন সংবাদ** ৫৪
➪ **সাম্প্রতিক মুসলিম বিশ্ব** ৫৫
➪ **সাধারণ জ্ঞান** ৫৬

Contents

সম্পাদকীয়

দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন-২০১২

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ প্রতি দুই বছর অন্তর দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন আয়োজন করে থাকে। সারা দেশ থেকে বাছাইকৃত অগ্রসরমান সচেতন কর্মী, সুধী এবং বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। আমন্ত্রিত অতিথি, সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম ও কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণের বক্তব্যে তারা অনুপ্রাণিত হন। জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, তাৎপর্যপূর্ণ দিক-নির্দেশনা এবং সাংগঠনিক কর্মকৌশল প্রাপ্ত হয়ে সারা দেশে তাওহীদী জাগরণ সৃষ্টি করেন। উক্ত ধারাবাহিকতায় আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন-২০১২ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ। মূলতঃ কর্মীদের চেতনাকে উজ্জীবিত ও শাণিত করাই এর আসল উদ্দেশ্য। যা দাওয়াতী ময়দানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ দৃঢ় তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত এদেশের একক যুবসংগঠন। ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী যে লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল আজও সেই লক্ষ্য নিয়েই কাজ করে যাচ্ছে। আগামীতেও নিজস্ব সাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে আঁকড়ে ধরেই পথ চলবে ইনশাআল্লাহ। ইসলামের নামে সমাজে প্রচলিত শিরক-বিদ'আত মিশ্রিত আক্বীদা ও আমলের বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চিরদিনই আপোসহীন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে কালিমামুক্ত করে নির্ভেজাল তাওহীদ ও সুন্নাতের মশাল জ্বালানোই এর আসল সংগ্রাম। মানবরচিত যেকোন দর্শন, মতবাদ, থিউরি, ইজমকে উপেক্ষা করে একমাত্র মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আদর্শকে প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব পালন করছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'।

আল্লাহ প্রেরিত বৈপ্লবিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কর্মীদের অবদান অবিস্মরণীয়। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ প্রতিকূল পরিবেশে জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য সংগ্রাম পরিচালনা করতে গিয়ে 'যুবসংঘ'কে অসংখ্য বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যারা শিরক-বিদ'আতের বশংবদ তারা তথাকথিত ইসলামের ধ্বজা নিয়ে যুবসংঘের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে। আর যারা ইহুদী-খ্রিষ্টানদের দোসর তারা পাশ্চাত্যের রসদ পান করে রাজনীতির অযুহাত দিয়ে যুলুম-অত্যাচার ও কারাগারের নির্মম খড়গ চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু 'যুবসংঘ' সমস্ত বাধাকে ডিঙ্গিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছে। ফলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রহমত এসেছে; বিজয় তাদেরকে হাতছানি দিয়ে স্বাগত জানিয়েছে। তাক্বওয়া ও খুলূছিয়াতই এর একমাত্র কারণ অন্য কিছু নয়।

তাক্বওয়ার বলে বলিয়ান প্রকৃত কর্মী দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে মানুষের দ্বারে গেলে বাতিল মাথা নত করতে বাধ্য। কারণ আল্লাহর বাণী, 'বলুন! হক্ব এসেছে বাতিল চুরমার হয়েছে। বাতিল তো নিশ্চিহ্ন হয়েই থাকে' *(বানী ইসরাঈল ৮১)*। উক্ত দাওয়াত সর্বস্তরের মানুষের মাঝে দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। এটা মূলতঃ ইলাহী প্রভাব। সুতরাং পৃথিবীতে তাক্বওয়ার কোন জুড়ি নেই। আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন ঘোষণা, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথেই আছেন যারা তাক্বওয়াশীল এবং সৎকর্মপরায়ণ' *(নাহল ১২৮)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ' যে তাক্বওয়া অবলম্বন করবে আল্লাহ তার পথ উন্মুক্ত করে দিবেন। আর তাকে তিনি কোথায় থেকে রুযী দান করেন সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করবে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হবেন, আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করবেই' *(তালাক ২-৩)*। এদিকে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি তোমাদেরকে তাক্বওয়া অর্জনের জন্য অছিয়ত করছি। কারণ তাক্বওয়া সকল কিছুর শিকড়' *(আহমাদ হা/১১৭৯১, সনদ ছহীহ)*।

উক্ত বাণীগুলোই 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কর্মীদের একমাত্র সম্বল। রাসূল (ছাঃ) যখন গারে ছাওরের মধ্যে অবস্থান করছিলেন তখন আবুবকর (রাঃ) শঙ্কিত হলে রাসূল (ছাঃ) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি চিন্তা করো না আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন' *(তওবা ৪০)*। কাফের-মুশরিকরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাদেরকে দেখতে পায়নি। অথচ তাঁরা সেখানেই ছিলেন। আল্লাহ তাঁদের জন্য রহমতের বেষ্টনি করে দিয়েছিলেন। ইবরাহীম (আঃ)-কে যখন আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হচ্ছিল তখন তিনি বলেছিলেন, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই সর্বোত্তম তত্ত্বাবধায়ক'। সঙ্গে সঙ্গে আগুন ঠাণ্ডা ও শীতল হয়ে গিয়েছিল। রহমতে ইলাহীর কারণে আগুন তাকে না পুড়িয়ে শীতল-ছায়া দান করেছিল। এগুলোই তাক্বওয়ার অনন্য দৃষ্টান্ত *(আলে ইমরান ১৭৩; বুখারী হা/৪৫৬৩)*। আরো যে কত দৃষ্টান্ত ইসলামের সোনালী ইতিহাসে জ্বলজ্বল করছে তার ইয়ত্তা নেই। যিনি যত তাক্বওয়াশীল বলে আল্লাহ্র কাছে মনোনীত হয়েছেন তিনি তত সফলতা লাভ করেছেন। আর এটা দুনিয়াবী সফলতা নয়; পরকালীন সফলতা।

ছাহাবায়ে কেরামের ধারা মোতাবেকই 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কর্মীরা সর্বক্ষেত্রে নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন। আমরা একান্তভাবে আশা করছি তাক্বওয়ার শিক্ষাই হবে এই সম্মেলনের মূল শিক্ষা। আল্লাহ যেন তাক্বওয়াশীল দাঈ হিসাবে 'যুবসংঘে'র কর্মীদেরকে কবুল করেন নেন। আল্লাহ তা'আলা সম্মেলনকে কবুল করুন এবং কর্মীদেরকে যথাযথ প্রতিদান দান করুন-আমীন!!

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়

আল-কুরআনুল কারীম :

١– يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ–

‘হে মুমিনগণ, আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে ব্যয় কর, সে দিন আসার পূর্বে, যে দিন থাকবে না কোন বেচাকেনা, না কোন বন্ধুত্ব এবং না কোন সুপারিশ। আর কাফেররাই যালিম’ *(বাকারা ২৫৪)*।

٢– قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ-

‘আমার বান্দাদের বল, যারা ঈমান এনেছে, যেন তারা ছালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, ঐ দিন আসার পূর্বে যে দিন কোন বেচা-কেনা থাকবে না এবং থাকবে না বন্ধুত্বও’ *(ইবরাহীম ৩১)*।

٣– فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

‘অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর, শ্রবণ কর, আনুগত্য কর এবং তোমাদের নিজেদের কল্যাণে ব্যয় কর, আর যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়, তারাই মূলতঃ সফলকাম’ *(তাগাবুন ১৬)*।

٤– لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ–

‘তোমরা কখনো ছওয়াব অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না ব্যয় করবে তা থেকে, যা তোমরা ভালবাস। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত’ *(আলে ইমরান ৯২)*।

٥– إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ–

‘নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারীগণ এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেয়, তাদের জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান’ *(হাদীদ ১৮)*।

٦– مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ-

‘কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, ফলে তিনি তার জন্য বহু গুণে বাড়িয়ে দেবেন। আর আল্লাহ সংকীর্ণ করেন ও প্রসারিত করেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরানো হবে’ *(বাকারা ২৪৫)*।

٧– إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتابَ اللهِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُورَ- لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ–

‘নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে, ছালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ যে রিযিক দিয়েছেন তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করতে পারে যা কখনো ধ্বংস হবে না যাতে তিনি তাদেরকে তাদের পূর্ণ প্রতিফল দান করেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বাড়িয়ে দেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, মহানগুণগ্রাহী’ *(ফাতির ২৯-৩০)*।

٨– وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ–إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ-

‘তোমরা যা কিছু ব্যয় কর অথবা যে কোন মানত কর তা অবশ্যই আল্লাহ জানেন। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। তোমরা যদি ছাদাকা প্রকাশ কর, তবে তা উত্তম। আর যদি তা গোপন কর এবং ফকীরদেরকে তা দাও, তাহলে তা তোমাদের জন্য অধিকতর উত্তম এবং (এর মাধ্যমে) তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ মুছে দেবেন। আর তোমরা যে আমল কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত’ *(বাক্বারাহ ২৭০-২৭১)*।

١٠– وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ–

‘আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও নিজেদেরকে সুদৃঢ় রাখার লক্ষ্যে সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা উঁচু ভূমিতে অবস্থিত বাগানের মত, যাতে পড়েছে প্রবল বৃষ্টি। ফলে তা দ্বিগুণ ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেছে। আর যদি তাতে প্রবল বৃষ্টি নাও পড়ে, তবে হালকা বৃষ্টি (যথেষ্ট)। আর আল্লাহ তোমরা যা আমল কর, সে ব্যাপারে সম্যক দ্রষ্টা’ *(বাক্বারা ২৬৫)*।

١١– قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ-

‘বল, নিশ্চয় আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেন এবং সঙ্কুচিত করেন। আর তোমরা যা কিছু আল্লাহর জন্য ব্যয় কর তিনি তার বিনিময় দেবেন এবং তিনিই উত্তম রিযিকদাতা’ *(সাবা ৩৯)*।

١٢– وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ–

‘আর তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় কর এবং নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। আর সৎকর্ম কর। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন’ *(বাক্বারা ১৯৫)*।

١٣- مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ-

‘যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা উৎপন্ন করল সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ দানা। আর আল্লাহ যাকে চান তার জন্য বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ’ *(বাক্বারা ২৬১)*।

١٤– يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ-

‘হে মুমিনগণ, তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের দানকে বাতিল করো না। সে ব্যক্তির মত, যে তার সম্পদ ব্যয় করে লোক

Contents

দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং বিশ্বাস করে না আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি' *(বাক্বারা ২৬৪)*।

১৫- وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ وَتَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصابَها وابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌّ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ-

আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও নিজেদেরকে সুদৃঢ় রাখার লক্ষ্যে সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা উঁচু ভূমিতে অবস্থিত বাগানের মত, যাতে পড়েছে প্রবল বৃষ্টি। ফলে তা দ্বিগুণ ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেছে। আর যদি তাতে প্রবল বৃষ্টি নাও পড়ে, তবে হালকা বৃষ্টি (যথেষ্ট)। আর আল্লাহ তোমরা যা আমল কর, সে ব্যাপারে সম্যক দ্রষ্টা *(বাক্বারা ২৬৫)*।

হাদীছে নববী থেকে :

১৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ-

হাদীছে কুদসীতে রাসূল (ছঃ) বলেন, 'আল্লাহ বলেন যে, তুমি ব্যয় কর হে আদম সন্তান! তাহলে আমি তোমার জন্য ব্যয় করব' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৬২)*।

১৮- عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ-

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কিছু দান করে, তার জন্য সাতশত গুণ নেকী লিপিবদ্ধ হয়' *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৮২৬ সনদ ছহীহ)*।

২০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ .... وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَمْ تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِيْنُهُ-

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সাতজন ব্যক্তিকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন ছায়া প্রদান করবেন, যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না...(তাদের একজন হল) ঐ ব্যক্তি যে এমন সংগোপনে দান করে যে, তার বাম হাতও জানতে পারে না যে, তার ডান হাত কি দান করেছে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০১)*।

২১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكانِ يَنْزِلاَنِ ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً ، وَيَقُولُ الآخَرُ : اللهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكاً تلفاً-

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা আসমান থেকে অবতীর্ণ হন এবং আল্লাহ্র পথে ব্যয়কারী দানশীল মুমিনের জন্য দো'আ করে বলেন, হে আল্লাহ! দানশীলকে আপনি তার পূর্ণ প্রতিদান দিন। অপরজন কৃপণের জন্য বদদো'আ করে বলেন, হে আল্লাহ আপনি কৃপণকে ধ্বংস করুন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৬০)*।

২২-عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ-

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই দান কবরের শাস্তিকে মিটিয়ে দেয় এবং ক্বিয়ামতের দিন মুমিন তার দানের ছায়াতলে ছায়া গ্রহণ করবে' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৮৪)*।

২৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ-

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'দান মানুষের সম্পদকে হ্রাস করে না। আর তা বান্দাকে ক্ষমা করে, তার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে। যে আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় প্রকাশ করে আল্লাহ তাকে উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৮৯)*।

২৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ-

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার সকল আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল ব্যতীত- ছাদাক্বায়ে জারিয়া, এমন জ্ঞান যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং সৎকর্মশীল সন্তান যে তার জন্য দো'আ করে' *(মুসলিম হা/১৬৩১; আবুদাঊদ হা/২৮৮০)*।

২৭- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ-

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'গোপনে কৃত দান আল্লাহ্র ক্রোধকে নির্বাপিত করে দেয়' *(ছহীহুল জামে' হা/৩৭৬০, ছহীহাহ হা/১৯০৮)*।

২৮- عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنْ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ -

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমার ভাইয়ের মুখের দিকে তোমার মুচকি হাসি, তোমার সৎকাজের নির্দেশ, অসৎকাজ থেকে নিষেধ, পথিককে পথ দেখানো, অন্ধব্যক্তিকে পথ দেখানো, রাস্তা থেকে পাথর, কাঁটা, হাড় প্রভৃতি অপসারণ, তোমার বালতি থেকে তোমার ভাইয়ের বালতিতে কিছু পানি ঢেলে দেয়া এসবই এক একটি ছাদাকাহস্বরূপ' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৯১১, হাদীছ ছহীহ)*।

২৯- عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ-

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মিসকীনকে ছাদাকা প্রদান কেবল ছাদাকা হিসাবেই গণ্য হবে, আর আত্মীয়-স্বজনকে দান করার মধ্যে ছাদাকা ও আত্মীয়তা উভয়ই নিহিত' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৯৩৯)*।

৩০- عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ-

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা তোমাদের অসুস্থদের আরোগ্যের জন্য দান কর' *(ছহীহুল জামে' হা/৩৩৫৮, সনদ হাসান)*।

সারবস্তু

১. দান হল ঈমানের পূর্ণতা এবং যথার্থ ইসলামের পরিচায়ক।
২. দানের মাঝে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা ও নির্ভরতার প্রমাণ নিহিত।
৩. দানের মাধ্যমে আল্লাহ্র ভালবাসা এবং মানুষের ভালবাসা অর্জন করা যায়।
৪. দান সামাজিক সংহতি ও সম্প্রীতির সেতুবন্ধন রচনাকারী।
৫. দানের মাধ্যমে কৃপণতার অপবিত্রতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
৬. দান করলে সম্পদে বরকত বৃদ্ধি পায়।
৭. দানের মাধ্যমে পাপমোচন হয়।
৮. লোক দেখানো দান আল্লাহ্র কাছে কবুল হয় না।
৯. সর্বোত্তম দান হল ছাদাকায়ে জারিয়া।
১০. কেবল অর্থ-সম্পদ নয়, সামান্য একটি সদাচরণও ছাদাকার সমতুল্য।

তাওহীদের পরিচয়

-শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন

তাওহীদ শব্দটি (وحد) ক্রিয়ামূল থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ কোন জিনিসকে একক হিসাবে নির্ধারণ করা।

তাওহীদের বিষয়টি বোঝার জন্য একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ জানা প্রয়োজন যে, 'না' বাচক ও 'হ্যাঁ' বাচক উক্তি ব্যতীত তাওহীদের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। অর্থাৎ এককৃত বস্তু ব্যতীত অন্য বস্তু হতে কোন বিধানকে অস্বীকার করে এককৃত বস্তুর জন্য তা সাব্যস্ত করা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, 'আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই'–একথার সাক্ষ্য দেয়া ব্যতীত কোন ব্যক্তির তাওহীদ পূর্ণ হবে না। যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য প্রদান করবে, সে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য সকল বস্তুর ইবাদতকে অস্বীকার করে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য তা সাব্যস্ত করবে। কারণ শুধুমাত্র 'না' বাচক বাক্যের মাধ্যমে কোন বস্তুকে গুণাগুণ থেকে মুক্ত করা হয়। আর শুধুমাত্র 'হ্যাঁ' বাচক বাক্যের মাধ্যমে কোন বস্তুর জন্য কোন বিধান সাব্যস্ত করলে সেই বিধানে অন্যের অংশ গ্রহণকে বাধা প্রদান করে না। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি বলেন যে, 'অমুক ব্যক্তি দাঁড়ানো'। এই বাক্যে আপনি তার জন্য দণ্ডায়মান হওয়াকে সাব্যস্ত করলেন। তবে আপনি তাকে একক ব্যক্তি হিসাবে দণ্ডায়মান গুণের জন্য সাব্যস্ত করলেন না। হতে পারে এই গুণের মাঝে অন্যরাও শরীক আছে। অর্থাৎ অমুক ব্যক্তির সাথে অন্যান্য ব্যক্তিগণও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। আর যদি বলেন, 'যায়েদ ব্যতীত আর কেউ দাঁড়ানো নেই' তবে আপনি দণ্ডায়মান হওয়াকে শুধুমাত্র যায়েদের সাথে নির্দিষ্ট করে দিলেন। এই বাক্যে আপনি দন্ডায়মানের মাধ্যমে যায়েদকে একক করে দিলেন এবং দাঁড়ানো গুণটিকে যায়েদ ব্যতীত অন্যের জন্য হওয়াকে অস্বীকার করলেন। এভাবেই তাওহীদের প্রকৃত রূপ বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। অর্থাৎ 'নাফী' (না বোধক) ও 'ইছবাত' (হ্যাঁ বোধক) বাক্যের সমন্বয় ব্যতীত তাওহীদ কখনো প্রকৃত তাওহীদ হিসাবে গণ্য হবে না।

মুসলিম বিদ্বানগণ তাওহীদকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। যা নিম্নরূপ–

১) তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ (توحيد الربوبية) :

২) তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ (توحيد الألوهية) :

৩) তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত (توحيد الأسماء والصفات) :

(ক) তাওহীদে রুবূবিয়্যাহর পরিচয় :

সৃষ্টি, রাজত্ব, কর্তৃত্ব ও পরিচালনায় আল্লাহকে এক হিসাবে বিশ্বাস করার নাম তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ্। নিম্নে তার ব্যাখ্যা করা হল–

১. সৃষ্টিতে আল্লাহর একত্ব : আল্লাহ এককভাবে সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা। তিনি ভিন্ন অন্য কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ 'আল্লাহ ছাড়া কোন স্রষ্টা আছে কি? যে তোমাদেরকে আকাশ ও যমীন হতে জীবিকা প্রদান করে? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই' *(ফাতির ৩)*। কাফিরদের অন্তঃসারশূন্য মা'বূদদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আল্লাহ বলেন, أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لاَ يَخْلُقُ أَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ 'সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তারই মত, যে সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?' *(নাহল ১৭)*। সুতরাং এটা সুপ্রমাণিত যে, আল্লাহ তাআ'লাই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। তিনি সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। আল্লাহ্র নিজস্ব কর্ম এবং মাখলূকাতের কর্ম সবই আল্লাহর সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। তাই আল্লাহ মানুষের কর্মসমূহেরও স্রষ্টা–একথার উপর ঈমান আনলেই তাকদীরের উপর ঈমান আনা পূর্ণতা লাভ করবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন– وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ 'আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমাদের কর্মসমূহকেও সৃষ্টি করেছেন *(আস-সাফফাত ৯৬)*। মানুষের কাজসমূহ মানুষের গুণের অন্তর্ভুক্ত। আর মানুষ আল্লাহ্র সৃষ্টি। কোন জিনিসের স্রষ্টা উক্ত জিনিসের গুণাবলীরও স্রষ্টা।

যদি বলা হয় আল্লাহ ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রেও তো সৃষ্টি কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেছেন–تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ 'আল্লাহ সৃষ্টিকর্তাদের মধ্যে উত্তম সৃষ্টিকর্তা' *(মুমিনূন ১৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন ছবি অংকনকারীদেরকে বলা হবে, তোমরা দুনিয়াতে যা সৃষ্টি করেছিলে, তাতে রূহের সঞ্চার কর। উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর এই যে, আল্লাহ্র মত করে কোন মানুষ কিছু সৃষ্টি করতে অক্ষম। মানুষের পক্ষে কোন অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্ব দেয়া সম্ভব নয়। কোন মৃত প্রাণীকেও জীবন দান করা সম্ভব নয়। আল্লাহ ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে সৃষ্টি করার অর্থ হল নিছক পরিবর্তন করা এবং এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত করা মাত্র। মূলতঃ তা আল্লাহরই সৃষ্টি। ফটোগ্রাফার যখন কোন বস্তুর ছবি তুলে, তখন সে উহাকে সৃষ্টি করে না। বরং বস্তুটিকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন করে মাত্র। যেমন মানুষ মাটি দিয়ে পাখির আকৃতি তৈরী করে এবং অন্যান্য জীব-জন্তু বানায়। সাদা কাগজকে রঙ্গিন কাগজে পরিণত করে। এখানে মূল বস্তু তথা কালি, রং ও সাদা কাগজ সবই তো আল্লাহর সৃষ্টি। এখানেই আল্লাহর সৃষ্টি এবং মানুষের সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

২. রাজত্বে আল্লাহর একত্ব : মহান রাজাধিরাজ একমাত্র আল্লাহ। তিনি বলেন, تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 'সেই মহান সত্তা অতীব বরকতময়, যার হাতে রয়েছে সকল রাজত্ব। আর তিনি প্রতিটি বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান' *(মুলক ১)*।

আল্লাহ আরো বলেন, قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ 'হে নবী! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সব কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে? যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যার উপর কোন আশ্রয় দাতা নেই *(মুমিনূন ৮৮)*। সুতরাং সর্বসাধারণের বাদশাহ একমাত্র আল্লাহ তাআ'লা। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে বাদশাহ বলা হলে তা সীমিত অর্থে বুঝতে হবে।

আল্লাহ অন্যের জন্যেও রাজত্ব ও কর্তৃত্ব সাব্যস্ত করেছেন। তবে তা সীমিত অর্থে। যেমন তিনি বলেন, أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ 'অথবা তোমরা যার চাবি-কাঠির (নিয়ন্ত্রণের) মালিক হয়েছো' *(নূর ৬১)*। আল্লাহ আরো বলেন, إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ 'তবে তোমাদের স্ত্রীগণ অথবা তোমাদের আয়ত্বাধীন দাসীগণ ব্যতীত' *(মুমিনূন ৬)*।

আরো অনেক দলীলের মাধ্যমে জানা যায় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরও রাজত্ব রয়েছে। তবে এই রাজত্ব আল্লাহর রাজত্বের মত নয়। সেটা অসম্পূর্ণ রাজত্ব। তা ব্যাপক রাজত্ব নয়। বরং তা একটা নির্দিষ্ট

Contents

সীমারেখার ভিতরে নিয়ন্ত্রিত। তাই উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, যায়েদের বাড়ীতে রয়েছে একমাত্র যায়েদেরই কর্তৃত্ব ও রাজত্ব। তাতে আমরের হস্তক্ষেপ করার কোন ক্ষমতা নেই এবং বিপরীত পক্ষে আমরের বাড়ীতে যায়েদও কোন হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তারপরও মানুষ আপন মালিকানাধীন বস্তুর উপর আল্লাহ প্রদত্ত নির্ধারিত সীমা-রেখার ভিতরে থেকে তাঁর আইন-কানুন মেনেই রাজত্ব করে থাকে। এজন্যই রাসূল (ছাঃ) অকারণে সম্পদ বিনষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ‘যে সমস্ত ধন-সম্পদ আল্লাহ তোমাদের জীবন ধারণের উপকরণ স্বরূপ দান করেছেন, তা তোমরা নির্বোধ লোকদের হাতে তুলে দিওনা’ *(নিসা ৫)*। মানুষের রাজত্ব ও মুলূকিয়াত খুবই সীমিত। আর আল্লাহর মালিকানা ও রাজত্ব সর্বব্যাপী এবং সকল বস্তুকে বেষ্টনকারী। তিনি তাঁর রাজত্বে যা ইচ্ছা, তাই করেন। তাঁর কর্মের কৈফিয়ত তলব করার মত কেউ নেই। অথচ সকল মানুষ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

৩. পরিচালনায় আল্লাহর একত্ব :

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এক ও অদ্বিতীয় ব্যবস্থাপক এবং পরিচালক। তিনি সকল মাখলূকাত এবং আসমান-যমীনের সব কিছু পরিচালনা করেন। আল্লাহ বলেন, أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ‘সৃষ্টি করা ও আদেশ দানের মালিক একমাত্র তিনি। বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ তা‘আলা অতীব বরকতময়’ *(আ‘রাফ ৫৪)*। আল্লাহর এই পরিচালনা সর্বব্যাপী। কোন শক্তিই আল্লাহর পরিচালনাকে রুখে দাঁড়াতে পারে না। কোন কোন মাখলূকের জন্যও কিছু কিছু পরিচালনার অধিকার থাকে। যেমন মানুষ তার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং কর্মচারীদের উপর কর্তৃত্ব করে থাকে। কিন্তু এ কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট একটি সীমার ভিতরে। উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হল যে, তাওহীদে রুবূবিয়্যাতের অর্থ সৃষ্টি, রাজত্ব এবং পরিচালনায় আল্লাহকে একক হিসাবে বিশ্বাস করা।

(খ) তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ্ (توحيد الألوهية) :

ইবাদতকে আল্লাহ্র জন্য এককভাবে নির্দিষ্ট করার নাম তাওহীদে উলূহিয়্যাহ। মানুষ যেভাবে আল্লাহর ইবাদত করে এবং নৈকট্য হাসিলের চেষ্টা করে, অনুরূপ অন্য কাউকে ইবাদতের জন্য গ্রহণ না করা। তাওহীদে উলূহিয়্যাতের ভিতরেই ছিল আরবের মুশরিকদের গোমরাহী। এ তাওহীদে উলূহিয়াকে কেন্দ্র করেই তাদের সাথে জিহাদ করে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) তাদের জান-মাল, ঘরবাড়ী ও জমি-জায়গা হরণ করাকে হালাল মনে করেছিলেন। তাদের নারী-শিশুদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করেছিলেন। এই প্রকার তাওহীদ দিয়েই আল্লাহ রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলেন এবং সমস্ত আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন। যদিও ‘তাওহীদে রুবূবিয়্যাত’ এবং ‘তাওহীদে আসমা ওয়াস্ সিফাত’ও নবীদের দাওয়াতের বিষয়বস্তু ছিল, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই নবীগণ তাদের স্বজাতীয় লোকদেরকে ‘তাওহীদে উলূহিয়া’র প্রতি আহবান জানাতেন। মানুষ যাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য কোন প্রকার ইবাদত পেশ না করে, সদাসর্বদা রাসূলগণ তাদের উম্মতদেরকে এই আদেশই দিতেন। চাই সে হোক নৈকট্যশীল ফেরেশতা, আল্লাহর প্রেরিত নবী, আল্লাহর সৎকর্মপরায়ণ অলী বা অন্য কোন মাখলূক। কেননা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করা বৈধ নয়। যে ব্যক্তি এই প্রকার তাওহীদে ত্রুটি করবে, সে নিঃসন্দেহে কাফির-মুশরিক। যদিও সে ‘তাওহীদে রুবূবিয়াহ’ এবং ‘তাওহীদে আসমা ওয়াছ ছিফাতে’র স্বীকৃতি প্রদান করে থাকে। সুতরাং কোন মানুষ যদি এ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকারী, একমাত্র মালিক এবং সব কিছুর পরিচালক, কিন্তু আল্লাহর ইবাদতে যদি অন্য কাউকে শরীক করে, তবে তার এই স্বীকৃতি ও বিশ্বাস কোন কাজে আসবে না। যদি ধরে নেয়া হয় যে, একজন মানুষ ‘তাওহীদে রুবূবিয়াতে’ এবং ‘তাওহীদে আসমা ওয়াছ ছিফাতে’ পূর্ণ বিশ্বাস করে, কিন্তু সে কবরের কাছে যায় এবং কবরবাসীর ইবাদত করে কিংবা তার জন্য কুরবানী পেশ করে বা পশু যবেহ করে তাহলে সে কাফির এবং মুশরিক। মৃত্যুর পর সে হবে চিরস্থায়ী জাহান্নামী। আল্লাহ বলেন, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ‘নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি শিরকে লিপ্ত হবে, আল্লাহ তার উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই’ *(মায়েদা ৭২)*। কুরআনের প্রতিটি পাঠকই একথা অবগত আছে যে, নবী (ছাঃ) যে সমস্ত কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করেছেন, তাদের জান-মাল হালাল মনে করেছেন এবং তাদের নারী-শিশুকে বন্দী করেছেন ও তাদের দেশকে গণীমত হিসাবে দখল করেছেন, তারা সবাই একথা স্বীকার করত যে, আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক। তারা এতে কোন সন্দেহ পোষণ করত না। কিন্তু যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে অন্যেরও উপাসনা করত, তাই তারা মুশরিক হিসাবে গণ্য হয়েছে এবং তাদের জান-মাল হালাল বিবেচিত হয়েছে।

(গ) তাওহীদুল্ আসমা ওয়াছ ছিফাত (توحيد الأسماء والصفات) :

‘তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাতে’র অর্থ হল, আল্লাহ নিজেকে যে সমস্ত নামে নামকরণ করেছেন এবং তাঁর কিতাবে নিজেকে যে সমস্ত গুণে গুণান্বিত করেছেন সে সমস্ত নাম ও গুণাবলীতে আল্লাহকে একক ও অদ্বিতীয় হিসাবে মেনে নেওয়া। আল্লাহ নিজের জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন, তাতে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, তার ধরণ বর্ণনা এবং কোনরূপ উদাহরণ পেশ করা ব্যতীত আল্লাহর জন্য তা সাব্যস্ত করার মাধ্যমেই এ তাওহীদ বাস্তবায়ন হতে পারে। সুতরাং আল্লাহ নিজেকে যে নামে পরিচয় দিয়েছেন বা নিজেকে যে গুণাবলীতে গুণান্বিত করেছেন, তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক। এ সমস্ত নাম ও গুণাবলীর আসল অর্থ কি হতে পারে তা কেবল আল্লাহর উপর ন্যস্ত করে তার উপর ঈমান আনতে হবে। নিজের পক্ষ থেকে সে ব্যাপারে কোন ধারণা বর্ণনা করা বা দৃষ্টান্ত পেশ করা যাবেনা। এই প্রকারের তাওহীদে আহলে কিবলা তথা মুসলমানদের বিরাট একটি অংশ গোমরাহীতে পতিত হয়েছে। এক শ্রেণীর লোক আল্লাহ্র ছিফাতকে অস্বীকারের ক্ষেত্রে এতই বাড়াবাড়ি করেছে যে, এ কারণে তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে। আর এক শ্রেণীর লোক মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছে। আর এক শ্রেণীর লোক আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের কাছাকাছি। কিন্তু সালাফে ছালেহীনের মানহাজ হল, আল্লাহ নিজের জন্য যে নাম নির্ধারণ করেছেন এবং নিজেকে যে সকল গুণে গুণান্বিত করেছেন, সে সকল নাম ও গুণাবলীর উপর ঈমান আনয়ন করতে হবে।

আল্লাহর কতিপয় নামের দৃষ্টান্ত :

১. الحي القيوم : আল্লাহ তাআ'লার অন্যতম নাম হচ্ছে, ‘আল হাইয়্যুল কাইয়্যূম’। এই নামের উপর ঈমান রাখা আমাদের উপর ওয়াজিব। এই নামটি আল্লাহর একটি বিশেষ গুণেরও প্রমাণ বহন করে। তা হচ্ছে, আল্লাহ্র হায়াতের পরিপূর্ণতা। যা কোন সময় অবর্তমান ছিলনা এবং কোন দিন শেষও হবে না। অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লা চিরঞ্জীব। তিনি সবসময় আছেন এবং সমস্ত মাখলূকাত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও তিনি অবশিষ্ট থাকবেন। তাঁর কোন ধ্বংস বা ক্ষয় নেই।

Contents

২. السميع : আল্লাহ নিজেকে 'আস সামীঈ' বা শ্রবণকারী নামে অভিহিত করেছেন। তার উপর ঈমান আনা আবশ্যক। শ্রবণ করা আল্লাহর একটি গুণ। তিনি মাখলূকাতের সকল আওয়াজ শ্রবণ করেন। তা যতই গোপন ও অস্পষ্ট হোক না কেন।

আল্লাহর কতিপয় সিফাতের দৃষ্টান্ত :

আল্লাহ বলেন, وَقَالَتْ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ 'ইয়াহুদীরা বলে আল্লাহর হাত রুদ্ধ হয়ে গেছে। বরং তাদের হাতই রুদ্ধ। তাদের উক্তির দরুন তারা আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হয়েছে, বরং আল্লাহর উভয় হাত সদা উম্মুক্ত, যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন' *(মায়েদা ৬৪)*। এখানে আল্লাহ তাআ'লা নিজের জন্য দু'টি হাত সাব্যস্ত করেছেন। যা দানের জন্য সদা প্রসারিত। সুতরাং আল্লাহর দু'টি হাত আছে। এর উপর ঈমান আনতে হবে। কিন্তু আমাদের উচিৎ আমরা যেন অন্তরের মধ্যে আল্লাহ্‌র হাত কেমন হবে সে সম্পর্কে কোন কল্পনা না করি এবং কথার মাধ্যমে যেন তার ধরণ বর্ণনা না করি ও মানুষের হাতের সাথে তুলনা না করি। কেননা আল্লাহ বলেছেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 'কোন কিছুই তাঁর সদৃশ্য নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' *(শুরা ১১)*। আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 'হে মুহাম্মাদ! আপনি ঘোষণা করে দিন যে, আমার প্রতিপালক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপকাজ, অন্যায়, অসংগত বিদ্রোহ ও বিরোধিতা এবং আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা, যার পক্ষে আল্লাহ কোন দলীল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি, আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই, (ইত্যাদি কাজ ও বিষয় সমূহ) হারাম করেছেন' *(আ'রাফ ৩৩)*। আল্লাহ আরো বলেন, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا 'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নাই, সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না, নিশ্চয়ই কর্ণ, চক্ষু, অন্তর ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে' *(বানী ইসরাঈল ৩৬)*। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র হাত দু'টিকে মানুষের হাতের সাথে তুলনা করল, সে আল্লাহর বাণী 'কোন কিছুই তাঁর সদৃশ্য নয়'–একথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং আল্লাহর বাণী, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ 'তোমরা আল্লাহর জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করো না *(নাহল ৭৪)*–এর বিরুদ্ধাচরণ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র গুণাবলীর নির্দিষ্ট কোন কৈফিয়ত বর্ণনা করল, সে আল্লাহর ব্যাপারে বিনা ইলমে কথা বলল এবং এমন বিষয়ের অনুসরণ করল, যে সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান নেই।

আল্লাহর ছিফাতের আরেকটি উদাহরণ পেশ করব। তা হল আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত হওয়া। কুরআনের সাতটি স্থানে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে 'তিনি আরশের উপরে বিরাজমান'। প্রত্যেক স্থানেই (استوى على العرش) 'ইসতাওয়া আলাল আরশি' বাক্যটি ব্যবহার করেছেন। আমরা যদি আরবী ভাষায় 'ইসতিওয়া' শব্দটি অনুসন্ধান করতে যাই তবে দেখতে পাই যে, (استوى) শব্দটি সবসময় (على) অব্যয়ের মাধ্যমে ব্যবহার হয়ে থাকে। আর (استوى) শব্দটি এভাবে ব্যবহার হলে 'সমুন্নত হওয়া' এবং 'উপরে হওয়া' ব্যতীত অন্য কোন অর্থে ব্যবহার হয় না। সুতরাং الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ সৃষ্টিজগতের উপরে সমুন্নত হওয়া ছাড়াও আরশের উপরে বিশেষ একভাবে সমুন্নত। প্রকৃতভাবেই আল্লাহ আরশের উপরে। আল্লাহ্‌র জন্য যেমনভাবে সমুন্নত হওয়া প্রযোজ্য, তিনি সেভাবেই আরশের উপরে সমুন্নত। আল্লাহ্‌র আরশের উপরে হওয়া এবং মানুষের খাট-পালং ও নৌকায় আরোহণের মধ্যে কোন সামঞ্জস্যতা নেই। এমনিভাবে মানুষের যানবাহনের উপরে চড়া এবং আল্লাহর আরশের উপরে সমুন্নত হওয়ার মাঝে কোন সামঞ্জস্যতা নেই।

আল্লাহ তাআ'লা বলেন, وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ 'তিনি তোমাদের আরোহণের জন্য সৃষ্টি করেন নৌযান ও চতুষ্পদ জন্তু যাতে তোমরা তার উপর আরোহণ করতে পার, তারপর তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা ওর উপর স্থির হয়ে বস এবং বলঃ পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের জন্য বশীভূত করেছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে বশীভূত করতে। আর আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করব' *(যুখরুফ ১২-১৪)*। সুতরাং মানুষের কোন জিনিসের উপরে উঠা কোনক্রমেই আল্লাহর আরশের উপরে হওয়ার সদৃশ হতে পারে না। কেননা আল্লাহ্‌র মত কোন কিছু নেই।

যে ব্যক্তি বলে যে, 'আরশের উপরে আল্লাহ্‌র সমুন্নত হওয়া'র অর্থ আরশের অধিকারী হয়ে যাওয়া, সে প্রকাশ্য ভুলের মাঝে রয়েছে। কেননা এটা আল্লাহ্‌র কালামকে আপন স্থান থেকে পরিবর্তন করার শামিল এবং ছাহাবী এবং তাবেঈদের ইজমার সম্পূর্ণ বিরোধী। এ ধরনের কথা এমন কিছু বাতিল বিষয়কে আবশ্যক করে, যা কোন মুমিনের মুখ থেকে উচ্চারিত হওয়া সংগত নয়। কুরআন মাজীদ আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ বলেন, إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 'আমি এই কুরআনকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার' *(যুখরুফ ৩)*। আরবী ভাষায় ইসতাওয়া শব্দের অর্থ 'সমুন্নত হওয়া' এবং 'স্থির হওয়া'। আর এটাই হল 'ইসতিওয়া' শব্দের আসল অর্থ। সুতরাং আল্লাহ্‌র বড়ত্বের শান মোতাবেক আরশের উপর যেভাবে বিরাজমান হওয়া প্রযোজ্য, সেভাবেই তিনি বিরাজমান। যদি 'ইসতিওয়া'র (সমুন্নত হওয়ার) অর্থ ইসতিওলা (অধিকারী) হওয়ার মাধ্যমে করা হয়, তবে তা হবে আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন করার শামিল। আর যে ব্যক্তি এরূপ করল, সে কুরআনের ভাষা যে অর্থের উপর প্রমাণ বহণ করে, তা অস্বীকার করল এবং অন্য একটি বাতিল অর্থ সাব্যস্ত করল।

তাছাড়া 'ইসতিওয়া'-এর যে অর্থ আমরা বর্ণনা করলাম, তার উপর সালাফে ছালেহীন ঐকমত্য (ইজমা) পোষণ করেছেন। কারণ উক্ত অর্থের বিপরীত অর্থ তাদের থেকে বর্ণিত হয়নি। কুরআন এবং সুন্নাহতে যদি এমন কোন শব্দ আসে সালাফে ছালেহীন থেকে, যার প্রকাশ্য অর্থ বিরোধী কোন ব্যাখ্যা না পাওয়া যায়, তবে সে ক্ষেত্রে মূলনীতি হল উক্ত শব্দকে তার প্রকাশ্য অর্থের উপর রাখতে হবে এবং তার মর্মার্থের উপর ঈমান রাখতে হবে।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, সালাফে ছালেহীন থেকে কি এমন কোন কথা বর্ণিত হয়েছে যা প্রমাণ করে যে, 'ইসতাওয়া' অর্থ 'আলা' (আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন)? উত্তরে আমরা বলব হ্যাঁ, অবশ্যই তা বর্ণিত হয়েছে। যদি একথা ধরে নেয়া হয় যে, তাঁদের পক্ষ থেকে এর প্রকাশ্য তাফসীর বর্ণিত হয়নি, তবুও এ সমস্ত ক্ষেত্রে সালাফে ছালেহীনের মানহাজ (নীতি) হল, কুরআন এবং সুন্নাহর শব্দ যে অর্থ নির্দেশ করবে, আরবী ভাষার দাবী অনুযায়ী শব্দের সে অর্থই গ্রহণ করতে হবে।

('ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম' গ্রন্থ থেকে গৃহীত)।

রামাযান পরবর্তী করণীয় সমূহ

আব্দুল আলীম

রামাযান মাস প্রতিবছর এলাহী প্রশিক্ষণের মাস হিসাবে আমাদের মাঝে আগমন করে মানুষকে তাক্বওয়ার প্রশিক্ষণ দিতে এবং যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা থেকে ধুয়ে-মুছে খাঁটি মুমিন বানাতে। মানুষকে সংযম শিখাতে, নিয়মিত ছালাত-ছিয়ামের প্রশিক্ষণ দিতে, দুনিয়াবিমুখ হয়ে আখেরাতমুখী করার প্রশিক্ষণে রামাযানের ভূমিকা অতুলনীয়। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা মুত্তাক্বী হতে পার' *(বাক্বারাহ ১৮৩)*। মাহে রামাযানের এই শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে একজন মানুষ সোনার মানুষে পরিণত হতে পারে। সেজন্য রামাযান আসার সাথে সাথে মানুষকে অনেক বেশী সংযমী হতে দেখা যায়। আগের তুলনায় এ মাসে তাদেরকে ছালাত, ছিয়াম ইত্যাদিতে অধিক মশগূল থাকতে দেখা যায়। অন্যান্য সময়ের চেয়ে এ মাসে মসজিদগুলো মুছল্লীতে পরিপূর্ণ থাকে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, রামাযান চলে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের অনেকে ধীরে ধীরে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে থাকে! মাহে রামাযানে আমরা আল্লাহ্‌র নিকট অনেক ভাল ভাল কাজ করার অঙ্গীকার করে থাকি, কিন্তু রামাযান বিদায় নিলে তার সাথে আমাদের অঙ্গীকারও বিদায় নেয়। অথচ আল্লাহ বলেন, وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا 'তোমরা আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না' *(নাহ্‌ল ৯১)*। বিশ্‌র আল-হাফীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কিছু মানুষ রামাযানে ইবাদত-বন্দেগী করতে গিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে, কিন্তু রামাযান চলে গেলে তারা আবার সব আমল ছেড়ে দেয়–আপনি এদের সম্পর্কে কি বলবেন? জবাবে তিনি বলেছিলেন, بِئْسَ الْقَوْمُ لَا يَعْرِفُوْنَ اللهَ إِلَّا فِيْ رَمَضَانَ 'ঐ সম্প্রদায় নিকৃষ্ট সম্প্রদায়, যারা রামাযান মাস ছাড়া অন্য সময়ে আল্লাহকে চিনে না'। ইমাম আহমাদ (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, বিশ্রাম কখন? তিনি বলেছিলেন, عِنْدَ وَضْعِ أَوَّلِ قَدَمٍ فِيْ الْجَنَّةِ 'জান্নাতে প্রথম পা রাখার সময়'। সেজন্য একজন মুমিনকে মৃত্যু অবধি নিয়মিত আমল করে যেতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ 'অতএব, তুমি সরল পথে অবিচল থাকো, যেমনিভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছ' *(হূদ ১১২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ 'আল্লাহ্‌র নিকট অধিক পছন্দনীয় আমল হচ্ছে, নিয়মিত আমল- যদিও তা পরিমাণে কম হয়' *(বুখারী, হা/৫৮৬১)*।

অতএব, রামাযানের মত অন্য মাসেও আমাদেরকে নিয়মিত আমল করে যেতে হবে। এক্ষণে আমরা কতিপয় আমলের কথা বলবো, যেগুলির প্রতি যত্নশীল হলে আমরা ইনশাআল্লাহ নিয়মিত আমলকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারব।

১. আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা : নিয়মিত আমলের উপর অবিচল থাকার জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। সেজন্য আপনি নিম্নোক্ত দো'আটি বেশী বেশী পড়ুন– رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ 'হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর আপনি আমাদের অন্তরসমূহকে বিপথগামী করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন। নিশ্চয়ই আপনিই সবকিছুর দাতা' *(আলে ইমরান ৮)*।

২. ছালাত আদায়ের প্রতি যত্নশীল হওয়া : আমরা রামাযানে যেমন ছালাত আদায় করতাম, রামাযানের পরেও তেমন তা আদায় করব। কেননা ছালাত হচ্ছে বান্দা এবং তার প্রভুর মধ্যে বন্ধনস্বরূপ। আপনি কি আপনার প্রভুর সাথে বন্ধন ছিন্ন করতে চান? এই ছালাত হচ্ছে একজন মুমিন এবং একজন কাফেরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী বিষয়। সেজন্য ওলামায়ে কেরাম ছালাত পরিত্যাগকারীকে কাফের হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। নবী (ছাঃ) ছালাত পরিত্যাগকারীর সাথে সংগ্রাম করার কথা বলেছেন।

৩. ফজরের ছালাত আদায়ের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া : নবী (ছাঃ) বলেছেন, لَيْسَ صَلاَةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا 'মুনাফিক্বদের জন্য ফজর এবং এশার

ছালাতের চেয়ে ভারী আর কোন ছালাত নেই। তারা যদি জানত যে, এই দুই ছালাতে কত ফযীলত রয়েছে, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এই ছালাতদ্বয়ে উপস্থিত হত' *(বুখারী, হা/৬৫৭)*। ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا 'ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে, তার চেয়ে উত্তম' *(মুসলিম, হা/১৭২১)*।

৪. ক্বিয়ামুল লায়ল আদায় করা : রামাযানের রাত্রিগুলিতে আমরা যেমন তারাবীহ্‌র ছালাত আদায় করেছি, অন্যান্য মাসগুলিতে তেমনি আমরা ক্বিয়ামুল লায়ল বা তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করব। কারণ এই ছালাত মানুষের গাফলতি দূর করে দেয়। তাহাজ্জুদের ফযীলত বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ 'ফরয ছালাতের পর সর্বোত্তম ছালাত হচ্ছে তাহাজ্জুদের ছালাত' *(মুসলিম, হা/২৮১২)*।

৫. মসজিদে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায়ের প্রতি যত্নবান হওয়া : রাসূল (ছাঃ) জামা'আতে ছালাতের অপরিসীম গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। এক হাদীছে তিনি জামা'আতে অনুপস্থিতদের বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। জামা'আতে ছালাতের উপকারিতা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِـى جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَـرَاءَةٌ مِـنَ النِّفَـاقِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ওয়াস্তে টানা ৪০ দিন জামা'আতে শরীক হবে এবং তাকবীরে তাহরীমা পাবে, তার দু'টি বিষয় থেকে নিষ্কৃতি লাভ অবধারিত হয়ে যাবে- জাহান্নামের আগুন থেকে এবং মুনাফেক্বী থেকে' *(তিরমিযী, হা/২৪১, আলবানী (রহঃ) হাদীছটিকে 'হাসান' বলেছেন)*।

৬. নিয়মিত প্রত্যেক দিন কুরআন তেলাওয়াত করা : রামাযানে বেশী বেশী কুরআন ে তলাওয়াতের সুন্দর অভ্যাসটি সারা বছর ধরে রাখতে হবে। কুরআন তেলাওয়াত পরিত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট অভিযোগ করবেন। এরশাদ হচ্ছে, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا 'রাসূল বললেন, ে হ আমার পালনকর্তা! নিশ্চয়ই আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে' *(ফুরক্বান ৩২)*। কুরআন মানুষের হৃদয়ে জ্যোতি সৃষ্টি করে এবং তাকে অনেক পাপ থেকে রক্ষা করে। কুরআন তেলাওয়াত করলে তা ক্বিয়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশকারী হিসাবে কথা বলবে *(আহমাদ, হা/৬৬২৬)*।

৭. ছিয়াম পালনে যত্নশীল হওয়া : রামাযানের বিদায়ের মধ্য দিয়ে ছিয়ামও বিদায় গ্রহণ করে না; বরং রামাযানের বাইরে অন্য মাসেও ছিয়াম পালনের বিধান রয়েছে। যেমন : শাওয়ালের ৬টি ছিয়াম, প্রত্যেক সোম এবং বৃহস্পতিবারে ছিয়াম পালন, প্রত্যেক আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে ছিয়াম পালন ইত্যাদি। এসব নফল ছিয়ামের অসংখ্য ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الـــدَّهْرِ 'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন করল এবং সাথে সাথে শাওয়ালের ৬টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল' *(মুসলিম, হা/২৮১৫)*। তিনি আরো এরশাদ করেন, تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ 'সোম এবং বৃহস্পতিবারে (মানুষের) আমল (আল্লাহ্র নিকট) পেশ করা হয়। অতএব, আমি ভালবাসি যে, ছিয়াম পালন অবস্থায় আমার আমল পেশ করা হবে' *(তিরমিযী, হা/৭৪৭, সনদ ছহীহ)*। আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের ছিয়ামের ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ صَوْمُ الشَّهْرِ كُلِّهِ 'প্রত্যেক মাসে তিন দিন ছিয়াম পালন সারা মাস ছিয়াম পালনের সমান' *(মুসলিম, হা/২৭৯৩)*।

৮. যিক্র-আযকারের প্রতি যত্নশীল হওয়া : যিক্র-আযকার এবং ইস্তেগফার হালকা আমল হলেও এর উপকারিতা অনেক বেশী। যিক্র-আযকার মানুষের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং হৃদয়কে শক্তিশালী করে। সেজন্য আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত যিক্র-আযকার, দো'আ এবং ইস্তেগফার বেশী বেশী পাঠ করতে হবে।

৯. ভাল মানুষের সাথে সঙ্গ দেওয়া : বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠীর সঙ্গ একজন মানুষের জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَـــةً 'সৎ সঙ্গী এবং অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হচ্ছে আতর বিক্রেতা এবং কামারের মত। আতর বিক্রেতা হয় তোমাকে আতর প্রদান করবে, না হয় তুমি তার কাছ থেকে আতর কিনে নিবে, আর না হয় তুমি অন্ততঃ তার কাছ থেকে সুঘ্রাণ পাবে। পক্ষান্তরে কামার হয় তোমার কাপড় পুড়িয়ে দিবে, আর না হয় তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে' *(বুখারী, হা/৫৫৩৪)*। কথায় বলে, 'সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে'। 'সৎসঙ্গে স্বর্গবাস আর অসৎসঙ্গে সর্বনাশ'। একজন সৎসঙ্গীর কারণে একজন মানুষ রামাযানের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সোনার মানুষে পরিণত হতে পারে। পক্ষান্তরে কোন অসৎসঙ্গীর খপ্পরে পড়লে বিপরীতটাও ঘটতে পারে। অতএব, সর্বদা সৎ মানুষের সাথে সঙ্গ দিতে হবে এবং অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলতে হবে।

এছাড়া গান-বাজনা ও যাবতীয় অশ্লীলতা সম্পূর্ণ পরিহার করতে হবে। কারণ এগুলি একজন মানুষকে খুব সহজে বিভ্রান্ত করে ফেলে। ছাহাবায়ে কেরামসহ অন্যান্য সৎ মানুষদের জীবনী সম্পর্কে পড়াশুনা করতে হবে। কেননা তাঁদের জীবনীতে সারা জীবন কঠোর সাধনার বহু নমুনা আমরা পাব। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের দেখতে যেতে হবে, তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে। দান-ছাদাক্বা করতে হবে। যে কোন ভাল কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে। মিথ্যা, পরনিন্দা, তোহমত ইত্যাদির চর্চা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

পরিশেষে বলব, যিনি মাহে রামাযানের প্রভু, তিনি গোটা বছরের প্রভু। সুতরাং রামাযানের ইবাদতের ধারা সারা বছর অব্যাহত রাখতে হবে, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে মূল্যায়ন করতে হবে। ইবনে ওমর (রাঃ) বলতেন, إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ 'সন্ধ্যা হলে সকালের অপেক্ষা করো না, আর সকাল হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না' *(বুখারী, হা/৬৪১৬)*। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'সময়ের অপচয় মৃত্যু অপেক্ষা ভয়ানক। কেননা মৃত্যু তোমাকে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। কিন্তু সময়ের অপচয় তোমাকে আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে'। ইবনে হিব্বান (রহঃ) বলেন, أَفْضَلُ ذَوِي الْعُقُولِ مَنْزِلَةً أَدْوَمُهم لنَفْسِهِ مُحاسَبَةً 'ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে মর্যাদাবান, যে সবসময় নিজের হিসাব-নিক্বাশ করে চলে'। মহান আল্লাহ আমাদেরকে নিয়মিত আমল করার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন।

[লেখক : মাস্টার্স অধ্যয়নরত, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদীআরব]

বিদ‘আতের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

শরীফুল ইসলাম মাদানী

আল্লাহ তা‘আলা মানব জাতিকে আশরাফুল মাখলূকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে দুনিয়াতে প্রেরণ করে তাদের জন্য ইসলামকে একমাত্র দ্বীন হিসাবে মনোনীত করে তার যাবতীয় বিধি-বিধান অহী মারফত জানিয়ে দিয়েছেন এবং তা বাস্তবায়ন করার জন্য যুগে-যুগে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। অতএব, আল্লাহর মনোনীত ইসলাম ধর্ম পরিচালিত হবে একমাত্র আল্লাহর বিধান ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেখিয়ে দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী। মানব রচিত বিধান অনুযায়ী ইসলাম পরিচালিত হতে পারে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই আল্লাহ তা‘আলা দ্বীন-ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন যার মধ্যে সামান্য সংযোজন-বিয়োজন করার অধিকার পৃথিবীর কোন মানুষকে দেওয়া হয়নি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, বর্তমানে দ্বীন-ইসলামের মধ্যে এমন কতগুলি কাজ ইবাদত হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে যার কোন ভিত্তি কুরআন ও ছহীহ হাদীছে নেই। আর এই সকল কাজই হল বিদ‘আত যার অবধারিত পরিণাম জাহান্নাম। এই নিবন্ধে বিদ‘আতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হল।

বিদ‘আতের শাব্দিক অর্থ :

البدعة শব্দটি মাসদার যা بدع ফে‘ল হতে নির্গত। যার শাব্দিক অর্থ হল, আরম্ভ করা, সৃষ্টি করা, আবিষ্কার করা ইত্যাদি। ইমাম নববী (রহঃ) বিদ‘আত শব্দের অর্থ লিখেছেন, البدعة كل شيء عمل على غير مثال سابق এমন সব কাজ করা বিদ‘আত, যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই।

বিদ‘আতের পারিভাষিক অর্থ :

(ক) ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, البدعة في الشرع : هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم. ‘শরী‘আতের মধ্যে বিদ‘আত হল এমন নব আবিষ্কার, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ছিল না’।[১]

(খ) শায়খুল হাদীছ ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, إن البدعة : ما لم يشرعه الله من الدين, فكل من دان بشيء لم يشرعه الله فذاك بدعة, و إن كان متأ ولا فيه. ‘বিদ‘আত হল আল্লাহ তা‘আলা দ্বীনের মধ্যে যা বিধিবদ্ধ করেননি। অতএব ঐ সকল কাজের প্রতি অনুগত হওয়া যা আল্লাহ তা‘আলা বিধিবদ্ধ করেননি সেটাই বিদ‘আত, যদিও তা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ হয়’।[২]

তিনি অন্যত্র বলেন, البدعة : ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات. ‘বিদ‘আত হল ইবাদত এবং বিশ্বাসের মধ্যে যা কিতাব (কুরআন), সুন্নাহ অথবা বিগত উম্মতের ইজমার বিপরীত’।[৩]

(গ) আল্লামা জুরজানী (রহঃ) বলেন, البدعة : هي الفعلة المخالفة للسنة, سميت بالبدعة لأن قائلها ابتدعها من غير مقال إمام, وهي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون, ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي. ‘বিদ‘আত হল : সুন্নাতের বিপরীত কাজ করা। এটাকে বিদ‘আত নামকরণ করা হয়েছে। এজন্য বক্তা ইমামের (নবীর) বাণীর বাইরের কথা উদ্ভাবন করেছে। আর ইহাই নব আবিস্কৃত কাজ যার উপর ছাহাবী ও তাবেঈগণ ছিলেন না এবং যা শারঈ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত নয়’।[৪]

(ঘ) ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) বলেন, البدعة عبارة عن فعلة تصادم الشريعة بالمخالفة, أو توجب التعاطي عليها بالزيادة أو النقصان. ‘বিদ‘আত এমন কাজকে বলা হয় যার মাধ্যমে বিরোধিতার দ্বারা শরী‘আতকে আঘাত করা হয়। অথবা শরী‘আতে কম-বেশী করার অভ্যাসকে ওয়াজিব করে নেওয়া হয়’।[৫]

(ঙ) ইমাম শাতেবী (রহঃ) বলেন, البدعة : عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة, يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. ‘বিদ‘আত বলা হয় দ্বীন-ইসলামে এমন কর্মনীতি বা কর্মপন্থা চলু করাকে, যা শরী‘আতের বিপরীত এবং যা করে আল্লাহর ইবাদতের ব্যাপারে আতিশয্য ও বাড়াবাড়ি করাই লক্ষ্য হয়’।[৬]

তিনি অন্যত্র বলেন, البدعة المذمومة هي التي خالفت ما وضع الشارع من الأفعال أو التروك. ‘নিকৃষ্ট বিদ‘আত হল, আল্লাহ তা‘আলা যে সকল কাজ করার ও বর্জন করার বিধান দান করেছেন তার ব্যতিক্রম করা’।[৭]

বিদ‘আতের প্রকারভেদ :

ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন মানদণ্ড থেকে বিদ‘আতের শ্রেণীভেদ করেছেন। নিম্নে তা আলোচিত হল।

(১) শারঈ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হওয়া অথবা না হওয়ার দিক থেকে বিদ‘আত দুই প্রকার। যথা :

(ক) البدعة الحقيقية তথা প্রকৃত বিদ‘আত : বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ইমাম শাতেবী (রহঃ) আল-ই‘তিছাম নামক গ্রন্থে বলেছেন, إن البدعة الحقيقية التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم ولا في الجملة ولا في التفصيل ولذلك سميت بدعة لأنها مخترعة على غير مثال سابق ‘প্রকৃত বিদ‘আত হল, যার সমর্থনে শরী‘আতের কোন দলীল নেই। না আল্লাহর কিতাব, না তাঁর রাসূলের সুন্নাত, না ইজমার কোন দলীল, না এমন কোন দলীল পেশ করা যায় যা বিজ্ঞজনের নিকট গ্রহণযোগ্য। না সংক্ষিপ্তভাবে, না বিস্ত ারিত। এ জন্যে এর নাম দেওয়া হয়েছে ‘বিদ‘আত’। কেননা তা মনগড়া, শরী‘আতে যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই’।[৮]

১. ইমাম নববী (রহঃ), তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত ৩/২২ পৃঃ।
২. শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া, আল-ইসতিক্বামাহ ১/৪২ পৃঃ।
৩. ঐ, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ৮/৩৪৬ পৃঃ।
৪. জুরজানী, আত-তা‘রীফাত ১/৬২ পৃঃ।
৫. ইমাম সুয়ূতী, আল-আমরু বিল ইত্তেবা ওয়ান নাহী আনিল ইবতিদা, ৮৮ পৃঃ।
৬. ইমাম শাতেবী, আল-ই‘তিছাম ১/৩৭।
৭. ঐ, আল-মুওয়াফাকাত ২/৩৪২ পৃঃ।
৮. ইমাম শাতেবী (রহঃ), আল-ই‘তিছাম ১/২৮৬ পৃঃ।

Contents

উদাহরণ :

(১) আযানের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর দরুদ পাঠ করা বিদ'আতে হাক্বীকী। কেননা তা কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও ইজমায়ে ছাহাবা দ্বারা সাব্যস্ত নয়।

(২) শবে বরাতকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন প্রকার ইবাদতে লিপ্ত হওয়া বিদ'আতে হাক্বীক্বী। কেননা, এর কোন ভিত্তি ইসলামী শরী'আতে নেই।

(৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ভালবাসার দোহাই দিয়ে তাঁর জন্ম দিবস পালনের লক্ষ্যে ঈদে মিলাদুন নবী পালন করা বিদ'আতে হাক্বীক্বী। কেননা, এর কোন ভিত্তি ইসলামী শরী'আতে নেই।

(৪) আল্লাহ তা'আলার কথিত প্রেমিক সেজে আল্লাহু আল্লাহু বলে যিকির টানা বিদ'আতে হাক্বীক্বী। ইসলামী শরী'আতে যার কোন ভিত্তি নেই।

(খ) البدعة الإضافية স্থান, সময় ও পদ্ধতিগত বিদ'আত। যার দু'টি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইবাদত যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ

দ্বারা প্রমাণিত এবং অপর দৃষ্টিভঙ্গিতে বিদ'আত যা মূলত কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হলেও এর স্থান, সময় ও পদ্ধতি সুন্নাহ পরিপন্থী।

উদাহরণ :

(১) আযানের পরে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরুদ পাঠ করা শরী'আত সম্মত। কিন্তু উচ্চ স্বরে দরুদ পাঠ করা সুন্নাত পরিপন্থী যা বিদ'আতে ইযাফী বা বাড়তি বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত।

(২) জুম'আর খুৎবা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া সুন্নাত। পক্ষান্তরে মসজিদের ভেতরে খতীবের সামনে দাঁড়িয়ে নিম্ন স্বরে আযান দেওয়া সুন্নাত পরিপন্থী যা বিদ'আতে ইযাফী-এর অন্তর্ভুক্ত।

(৩) পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের পূর্বে ও পরে সর্বমোট ১২ রাক'আত ছালাত যাকে সুনানুর রাওয়াতেব বলা হয়। তা জামা'আতবদ্ধ ছাড়াই একাকী আদায় করা শরী'আত সম্মত। পক্ষান্তরে উল্লেখিত ছালাতগুলো জামা'আতবদ্ধভাবে আদায় করা সুন্নাহ পরিপন্থী যা বিদ'আতে ইযাফী-এর অন্তর্ভুক্ত।

(৪) কুরআন তেলাওয়াত একটি উত্তম ইবাদত যার প্রতিটি হরফের বিনিময়ে দশটি করে নেকী অর্জন করা যায়। কিন্তু ছালাতে রুকু এবং সিজদা অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত সুন্নাত পরিপন্থী যা বিদ'আতে ইযাফী-এর অন্তর্ভুক্ত।

(৫) মৃত ব্যক্তির জন্য শোক পালন করা শরী'আত সম্মত। কিন্তু শোক পালনের নামে দাঁড়িয়ে এক বা দু'মিনিট নীরবতা পালন করা অথবা কিছু সংখ্যক মানুষ মৃতের বাড়িতে একত্রিত হয়ে সকলে মিলে শোক পালন করা সুন্নাত পরিপন্থী যা বিদ'আতে ইযাফী-এর অন্তর্ভুক্ত।

(৬) শা'বান মাস বেশী বেশী ছিয়াম পালনের মাস, যে মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবচেয়ে বেশী নফল ছিয়াম পালন করেছেন। কিন্তু মধ্য শা'বানে শবেবরাতের উদ্দেশ্যে দিনে ছিয়াম ও রাতে ছালাত আদায় করা ইসলামী শরী'আত পরিপন্থী যা বিদ'আতে ইযাফী-এর অন্তর্ভুক্ত।

(৭) ফরয ছালাতের পরে একাকী দো'আ বা মুনাজাত করা শরী'আত সম্মত। এ সময় দো'আ করার জন্য রাসূল (ছাঃ) অনেকগুলো দো'আ আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন যা পাঠ করতে কমপক্ষে পনের মিনিট সময় লাগবে। কিন্তু উক্ত সময় ইমাম ও মুক্তাদীর সম্মিলিত মুনাজাত যা রাসূল (ছাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত নয় তা বিদ'আতে ইযাফী-এর অন্তর্ভুক্ত।

অতএব, বিদ'আতে হাক্বীক্বী এবং বিদ'আতে ইযাফী-এর মধ্যে পার্থক্য হল, ইসলামে যার কোন ভিত্তি নেই এমন কিছুকে নেকীর কাজ মনে করে পালন করা বিদ'আতে হাক্বীকী। পক্ষান্তরে যে ইবাদত মৌলিকভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু স্থান, সময় ও পদ্ধতি কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী হলে তাকে বিদ'আতে ইযাফী বলা হয়।

(২) কর্মে বাস্তবায়ন এবং বর্জনের দিক থেকে বিদ'আত দু'প্রকার−

(ক) البدعة الفعلية তথা কর্মে বিদ'আত : ইহা এমন কর্মকে বলা হয় যা ইসলামী শরী'আত সমর্থিত নয়। অথচ উক্ত কর্মের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করতে চায়।

বিদ'আতীরা এই প্রকার বিদ'আত সবচেয়ে বেশী করে থাকে। যেমন- শবেবরাতের নিয়তে শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে ১০০ রাক'আত ছালাত আদায় করা । শবে মে'রাজের নিয়তে ২৭ রজবের রাতে ইবাদত করা। ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করা সহ বিভিন্ন দিবস পালন করা ইত্যাদি যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বিরোধী।

(খ) البدعة التركية তথা বর্জনের মাধ্যমে বিদ'আত : তা হল, ইসলামী শরী'আতে বৈধ অথবা ওয়াজিব কোন বিষয়কে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে বর্জন করা। যেমন- আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে হালাল কোন পশুর গোশত না খাওয়া যেমনভাবে হিন্দুরা গরুর গোশত খায় না। আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে বিবাহ না করা যেমনভাবে খ্রিষ্টান পাদ্রীরা বিবাহ করে না।

(৩) বিশ্বাস ও কর্মে বাস্তবায়নের দিক থেকে বিদ'আত দু'প্রকার−

(ক) البدعة الإعتقادية তথা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিদ'আত : তা হ'ল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত প্রশিদ্ধ বিষয়ের বিপরীত কোন বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, যদিও সে তার বিশ্বাস অনুযায়ী আমল না করে।[৯]

যেমন- খারেজী, শী'আ, মু'তাযেলা, মুরজিয়া, জাহমিয়া, ক্বাদারিয়া সহ বিভিন্ন পথভ্রষ্ট দলগুলির আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদা বা বিশ্বাস।

(খ) البدعة العملية তথা কর্মে বিদ'আত : তা হ'ল, এমন কোন কাজকে ইবাদত হিসাবে পালন করা যা ইসলামী শরী'আত সমর্থিত নয়।[১০] অর্থৎ সুন্নাত পরিপন্থী আমল করা।

মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) কর্মের মাধ্যমে বিদ'আতের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, সুন্নাত আনুযায়ী

৯. আলী মাহফূয, আল-ইবদা' ফী মায়াররিল ইবতিদা', পৃঃ ৪৬।
১০. তদেব।

আমল করতে গেলে ছয়টি বিষয়ে সুন্নাতের অনুসরণ করতে হবে।[১১] তা হল,

(১) السبب তথা কারণ বা উদ্দেশ্য : অর্থাৎ কেউ যদি এমন কোন কারণে বা উদ্দেশ্যে ইবাদত করে যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পরিপন্থী, তাহলে তা সুন্নাত বিরোধী আমল হিসাবে গণ্য হবে যা আল্লাহ তা'আলা কবুল করবেন না। যেমন- তাহাজ্জুদের ছালাত একটি উত্তম ইবাদত। কিন্তু শবেবরাত অথবা শবেমে'রাজের উদ্দেশ্যে রাতে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করা বিদ'আত। কেননা উল্লেখিত কারণ বা উদ্দেশ্য কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়।

(২) الجنس তথা শ্রেণী বা প্রকার : অর্থাৎ কেউ যদি এমন শ্রেণী বা প্রকারের ইবাদত করে যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয় তা সুন্নাত পরিপন্থী ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট কবুল হবে না। যেমন- উট, গরু ছাগল অথবা ভেড়া বা দুম্বা দ্বারা কুরবানী করা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু উল্লেখিত পশুর পরিবর্তে কেউ যদি ঘোড়া দ্বারা কুরবানী করে তাহলে তা সুন্নাত পরিপন্থী ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে যা আল্লাহ তা'আলা কবুল করবেন না।

(৩) القدر তথা পরিমাণ : অর্থাৎ যতটুকু ইবাদত কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কেবল ততটুকুই পালন করতে হবে। এর অতিরিক্ত করলে তা সুন্নাত পরিপন্থী আমল হিসাবে গণ্য হবে যা আল্লাহ তা'আলার নিকট কবুল হবে না। যেমন- যোহরের চার রাকা'আত ফরয ছালাতের স্থানে পাঁচ রাক'আত আদায় করলে সুন্নাত পরিপন্থী হবে। অনুরূপভাবে তারাবীহ-এর ছালাত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো ১১ রাকা'আতের বেশী আদায় করেননি। কিন্তু যদি কেউ এই সুন্নাতকে উপেক্ষা করে ২০ রাক'আত আদায় করে তাহলে তা সুন্নাত পরিপন্থী ইবাদতে পরিণত হবে যা আল্লাহ তা'আলার নিকট কবুল হবে না।

(৪) الكيفية তথা পদ্ধতি : অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে ইবাদত যে পদ্ধতিতে আদায় করেছেন সেই ইবাদত ঠিক সেই পদ্ধতিতে আদায় করলেই কেবল সুন্নাতের অনুসরণ করা হবে। কিন্তু যদি কেউ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পদ্ধতিকে বাদ দিয়ে নিজের মস্তিস্কপ্রসূত পদ্ধতিতে ইবাদত করে তাহলে তা সুন্নাত পরিপন্থী আমলে পরিণত হবে যা আল্লাহ তা'আলার নিকট কবুল হবে না। যেমন- দো'আ বা মুনাজাত একটি উত্তম ইবাদত। কিন্তু তা হতে হবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পদ্ধতি অনুযায়ী। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন যে পদ্ধতিতে মুনাজাত করেছেন, তখন ঠিক সেই পদ্ধতিতে মুনাজাত করতে হবে। কিন্তু ফরয ছালাতের পরে, ঈদের ছালাতের পরে, মৃত মানুষকে দাফন করার পরে, বিবাহ বৈঠকে বর্তমানে প্রচলিত দলবদ্ধ মুনাজাত সুন্নাত পরিপন্থী যা স্পষ্ট বিদ'আত।

(৫) الزمان তথা সময় : অর্থাৎ যে সময় যে ইবাদত কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত, ঠিক সেই ইবাদত সেই সময় পালন করতে হবে। সময়ের ব্যতিক্রম করলে সুন্নাত পরিপন্থী আমলে পরিণত হবে যা আল্লাহর নিকট গ্রহণ হবে। যেমন- কেউ যদি ফযীলতের মাস হিসাবে রামাযান মাসে পশু যবেহের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করতে চায়, তাহলে তা বিদ'আত হবে। কেননা পশু যবেহের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল শুধুমাত্র কুরবানী ও আক্বীকাহ-এর দ্বারাই হবে যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

(৬) المكان তথা স্থান : অর্থাৎ যেই স্থানে যেই ইবাদত কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত, ঠিক সেই ইবাদত সেই স্থানে পালন করতে হবে। স্থান পরিবর্তন করলে সুন্নাত পরিপন্থী আমলে পরিণত হবে যা আল্লাহর নিকট কবুল হবে না। যেমন- রামাযানের শেষ দশকে মসজিদে ই'তিকাফ করা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু কেউ যদি মসজিদের পরিবর্তে বাড়িতে ই'তিকাফ করে তাহলে তা সুন্নাত পরিপন্থী আমলে পরিণত হবে যা আল্লাহ তা'আলার নিকট কবুল হবে না।

(৪) হুকুমগত দিক থেকে বিদ'আত দু'প্রকার–

(ক) البدعة المكفرة তথা কুফরী বিদ'আত : তা হল, কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত ইসলামী শরী'আতের অকাট্য কোন বিষয়কে অস্বীকার করা। যেমন- কোন ফরযকে ফরয হিসাবে গ্রহণ না করা, কোন হালাল বস্তুকে হারাম মনে করা, কোন হারাম বস্তুকে হালাল মনে করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ-নিষেধের ব্যতিক্রম বিশ্বাস করা ইত্যাদি।

(খ) البدعة غير المكفرة তথা কুফরী নয় এমন বিদ'আত : ইহা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত ইসলামী শরী'আতের কোন বিষয়কে অস্বীকার করা নয়। যেমন- মারওয়ানিয়্যাহদের বিদ'আত যারা ছাহাবাদের মর্যাদাকে অস্বীকার করে। তারা কোন ছাহাবীকে মর্যাদাবান বলে স্বীকার করে না এবং কোন ছাহাবীকে কাফেরও বলে না।

বিদ'আতে হাসানা ও সায়্যিআহ এই দুই ভাগে ভাগ করা যাবে কি?

প্রথমত যারা বিদ'আতকে হাসানা তথা ভাল বিদ'আত এবং সায়্যিআহ তথা খারাপ বিদ'আত এই দুই ভাগে ভাগ করে এবং বলে বিদ'আতে হাসানা ইসলামী শরী'আতে বৈধ, তারা স্পষ্ট ভুলের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. 'নিশ্চয়ই সকল প্রকার বিদ'আত ভ্রষ্টতা' *(ইবনু মাজাহ, হা/৪২)*। অতএব, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক প্রকার বিদ'আতের উপর ভ্রষ্টতার হুকুম জারী করেছেন যা হেদায়াতের বিপরীত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ 'তারাই হেদায়াতের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা এবং মাগফিরাতের পরিবর্তে আযাব ক্রয় করেছে। আগুনের উপর তারা কতই না ধৈর্যশীল' *(বাকারাহ ১৭৫)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ – وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ 'আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোন হেদায়াতকারী নেই। আর আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন, তার জন্য কোন পথ ভ্রষ্টকারী নেই। আল্লাহ কি মহাপরাক্রমশালী প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন? *(সূরা যুমার ৩৬-৩৭)*।

দ্বিতীয়তঃ সকল প্রকার বিদ'আতই ভ্রষ্টতা যার ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈনে ইযাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তাদের কেউ বিদ'আতে হাসানা এবং সায়্যিআহ এই দুই ভাগে ভাগ করেননি।

তৃতীয়ত আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে ইসলামী শরী'আতের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ। কেননা ইবাদতের মূল হল নিষিদ্ধ, যতক্ষন পর্যন্ত জায়েয হওয়ার দলীল না পাওয়া যায়। ইসলামী শরী'আতে বিদ'আতে হাসানা বিধিবদ্ধ হওয়ার কোন দলীল নেই। অতএব, বিদ'আতে হাসানার দোহাই দিয়ে এমন কোন কাজকে বিধিবদ্ধ করা হারাম যার কোন ভিত্তি ইসলামী শরী'আতে নেই।

[লেখক : লীসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদীআরব]

১১. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, আল-ইবদা' ফী কামালিশ শারঈ ওয়া খাতারিল ইবতিদা', পৃঃ ২১-২৪।

দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

১ম যুগে (২৩-৩৭৫) সিন্ধু এলাকায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের কেন্দ্রসমূহ :

সিন্ধুতে হাদীছ চর্চা মূলতঃ ২য় শতাব্দী হিজরীর প্রথম দিকে শুরু হয়। কিন্তু ৪র্থ শতাব্দী হিজরী পর্যন্ত তা তেমন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেনি। এর কারণ হ'তে পারে মোটামুটি দু'টি। ১- খেলাফতের পূর্বাঞ্চলীয় হিন্দুস্থান ও সিন্ধু এলাকা একটি স্থায়ী প্রশাসনিক অঞ্চলের মর্যাদার বদলে বরং অনেকটা সামরিক কলোনী এলাকা হিসাবে গণ্য হওয়ায় এই এলাকায় আভ্যন্তরীণ শান্তি ও স্থিতিশীলতার যথেষ্ট অভাব ছিল- যা ইল্‌মে হাদীছের চর্চার জন্য আবশ্যিক পূর্বশর্ত ছিল। ২- যাতায়াতের কষ্ট ও অসুবিধার কারণে হেজায ও আরবের ইসলামী কেন্দ্রগুলির সঙ্গে সিন্ধু তথা ভারতবর্ষের যোগাযোগ সহজ ও নিরাপদ ছিলনা। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল ব্যবসায়ী আরবগণই এদেশে আসা-যাওয়ার ঝুঁকি ও কষ্ট স্বীকার করেছেন। ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর স্বনামধন্য পর্যটক মাকদেসীও তাঁর সফর বৃত্তান্তে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

তৃতীয় শতাব্দী হিজরীর শেষার্ধে (২৭০/৮৮৩ খৃঃ) মানছূরাহ ও মুলতানে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র কায়েম হ'লে এলাকায় সার্বিকভাবে অগ্রগতির সূচনা হয়। সিন্ধতে আরবদের শাসন তিনশত বৎসর যাবত কায়েম ছিল। তন্মধ্যে স্বাধীন যুগটি উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ভ্রমণকারীদের বর্ণনা মোতাবেক এই এলাকা তখন শান্তি ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ ছিল। এই সময়ে ইলমে হাদীছের যে অগ্রগতি সাধিত হয়, তা মূলতঃ আভ্যন্তরীণ শান্তি ও স্থিতিশীলতার কারণেই সম্ভব হয়েছিল। এখানকার জ্ঞানপিপাসু ছাত্ররা ইলমে হাদীছে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য হেজায, সিরিয়া, ইরাক, মিসর প্রভৃতি এলাকায় গমন করতেন এবং ঐ সমস্ত এলাকার ওলামায়ে কেরাম এই সব এলাকায় আগমন করতেন। বলাবাহুল্য চতুর্থ শতাব্দী হিজরীতে এসে সমস্ত সিন্ধু ইলমে হাদীছের চর্চায় ভরপুর হ'য়ে ওঠে। ফলে অন্যান্য মাযহাবের লোক কিছু কিছু থাকলেও আহ্‌লেহাদীছের সংখ্যা এখানে সর্বদা বেশী ছিল। এই সময় ইল্‌মে হাদীছের কেন্দ্র হিসাবে প্রধানতঃ দেবল ও মানছূরাহ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল। তবে পঞ্চম শতাব্দী হিজরীতে এসে কুছদার (বেলুচিস্তান)-কেও আমরা উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকায় দেখতে পাই।

সিন্ধুর কেন্দ্র সমূহ ও সেখানকার মুহাদ্দিছবৃন্দ

১-দেবল : দেবল সিন্ধুর প্রসিদ্ধ প্রাচীন বন্দর নগরী যা বর্তমান করাচী ও থাট্টার মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত ছিল। এখানেই মুহাম্মাদ বিন কাসিমের (৬৬-৯৬ হিঃ) হাতে সিন্ধুর রাজা দাহিরের পতন ঘটে। এই বন্দরের মাধ্যমেই আরব জগতের সঙ্গে সিন্ধুর ব্যবসায়িক ও ধর্মীয় যোগাযোগ সাধিত হয়। মুহাম্মাদ বিন কাসিম এখানে একটি মসজিদ কায়েম করেন ও প্রাথমিক ভাবে চার হাযার আরব মুসলিমকে এখানে এনে আবাদ করেন। ক্রমে এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এটি স্বাধীন মানছূরা রাজ্যের প্রধান বন্দর নগরীতে পরিণত হয়। শহরে লোকসংখ্যা এত বেড়ে যায় যে, একশত শহরতলীয় গ্রাম সমৃদ্ধ এই বন্দর নগরীতে ২৮০/৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের এক ভূমিকম্পে কেবলমাত্র এই নগরীতেই দেড় লাখ লোক মৃত্যুবরণ করেন। ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাথে সাথে এই নগরী ইসলামী শিক্ষা ও ইল্‌মে হাদীছ চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। এমনকি আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে এখানে বেশ কয়েকজন হাদীছের রাবীও জন্মগ্রহণ করেন। এইসব মুহাদ্দিছ ওলামায়ে দ্বীনের নিরলস তা'লীম ও দা'ওয়াতের ফলেই সিন্ধু ও হিন্দুস্থান এলাকায় আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে।

দেবলের মুহাদ্দিছবৃন্দ :

১- আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হারূণ দেবলী আল-রাযী (২৭৫-৩৭০ হিঃ)ঃ ইনি দেবলে জন্মগ্রহণ করেন। বাগদাদে গিয়ে জা'ফর বিন মুহাম্মাদ আল-ফারিয়াবী (মৃঃ ৩০১ হিঃ) এবং ইব্রাহীম বিন শারীক কূফীর নিকটে হাদীছ শিক্ষা করেন। হাদীছের রাবী হওয়া ছাড়াও তিনি ইলমে কিরাআতে পারদর্শী ছিলেন। আহমাদ বিন আলী আল-বাদা (মৃঃ ৪২০ হিঃ), আবু ইয়ালা বিন দূমা (৩৪৬-৪৩১), কাযী আবুল 'আলা ওয়াসেত্বী (মৃঃ ৪৩১ হিঃ) তাঁর শিষ্য ছিলেন।

২- শু'আইব বিন মুহাম্মাদ আবুল কাসিম দেবলী : ইনি ইবনু আবী ক্বাত্ব'আন নামে খ্যাত। ইনি মিসরে গিয়ে হাদীছ শিক্ষা করেন। তিনি হাদীছ বর্ণনা করেন। আবু সাঈদ বিন ইউনুস তাঁর নিকট থেকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছেন। ৩০৫ হিজরীতে তিনি ইছফাহান গমন করেন এবং ৩১৩ হিজরীর দিকে তিনি দামেশকে গিয়ে হাদীছ বর্ণনা করেন।

৩- মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আবু জা'ফর দেবলী (মৃঃ ৩২২/৯৩৪ খৃঃ) : হাদীছ শিক্ষার জন্য ইনি মক্কা সফর করেন। তিনি মুহাদ্দিছ হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন। তিনি মুহাম্মাদ বিন যাম্বুর, মুহাম্মাদ বিন আলী আছ-ছায়েগ এবং সাঈদ বিন আবদুর রহমান আল-মাখযূমী হ'তে হাদীছ বর্ণনা করেন। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আল-মুকরী (মৃঃ ২৮১ হিঃ), আহমাদ বিন ইবরাহীম বিন ফাররাস মাক্কী আল-আত্তার, আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ আল-হাজ্জাজ (মৃঃ ৩৬৮ হিঃ) প্রমুখ বিদ্বানগণ তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করতেন। ইলমে হাদীছে পারদর্শী হওয়া ছাড়াও তিনি সুফিয়ান ইবনু ওয়ায়না (১০৭-১৯৮ হিঃ)-এর 'কিতাবুত তাফসীর' সাঈদ বিন আবদুর রহমান আল মাখযূমী (মৃঃ ২৪৯ হিঃ)-এর নিকট হ'তে এবং আবদুল্লাহ বিন মুবারক (১১৮-১৮১ হিঃ) -এর 'কিতাবুল বির্র ওয়াছ ছিলাহ' তাঁর শিষ্য হুসাইন আল-মারওয়াযী (মৃঃ ২৪২ হিঃ)-এর নিকট হ'তে শিক্ষা করেন। ৩২২ হিজরীতে তিনি মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন।

৪- আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ আবুল আব্বাস দেবলী (মৃঃ ৩৪৩/৯৫৪ খৃঃ)ঃ ইলমে হাদীছ শিক্ষার জন্যই ইনি সে যুগে মুসলিম বিশ্বের প্রায় সকল হাদীছ শিক্ষার কেন্দ্রগুলিতে সফর করেন। মক্কাতে তিনি স্বদেশী মুহাদ্দিছ আবু জা'ফর দেবলী (মৃঃ ৩২২ হিঃ) ও মুফায্‌যাল বিন মুহাম্মাদ আল-জুন্দী (মৃঃ ৩০৮)-এর নিকট থেকে হাদীছ শিক্ষা করেন। এমনিভাবে বছরাতে আবু খলীফা আল-ক্বাযী (মৃঃ ৩০৫ হিঃ), বাগদাদে জাফর বিন মুহাম্মাদ ফারইয়াবী (মৃঃ ৩০১ হিঃ), মিসরে আলী বিন আব্দুর রহমান ও মুহাম্মাদ বিন রাইয়ান, দামেশকে হাফেয আহমাদ বিন ওমায়ের বিন হাওসা (মৃঃ ৩২০), বৈরুতে আবু আব্দুর রহমান মাকহূল, হাফেয হুসাইন বিন আবু মা'শার (মৃঃ ৩১৮), তাস্‌তারে আহমাদ বিন যুহায়ের তাস্‌তারী (মৃঃ ৩১২), আসকার

মুকাররমে হাফেয আবদান বিন আহমাদ জাওলাক্বী (২১০-৩০৬) ও নিশাপুরে আবুবকর মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ইবনে খুযায়মা (মৃঃ ৩১১) ছাড়াও সমকালীন অন্যান্য মুহাদ্দিছগণের নিকট হ'তেও হাদীছ শিক্ষা করেন। ইবনে খুযায়মার মৃত্যুর আগেভাগেই তিনি নিশাপুর পৌঁছে যান এবং তৎকালীন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই শিক্ষানগরীতে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি হাদীছের শিক্ষক হিসাবে দরস দিতে থাকেন। তাঁর খ্যাতনামা ছাত্রমন্ডলীর মধ্যে 'মুস্তাদরাকে হাকেম'-এর বিশ্ববিশ্রুত সংকলক হাফেয আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ হাকেম নিশাপুরী (৩২১-৪০৫) অন্যতম। ৩৪৩ হিজরীতে তিনি নিশাপুরেই ইন্তেকাল করেন। সেই প্রাচীনযুগে শুধুমাত্র ইলমে হাদীছের অন্বেষণে একজন ভারতীয় বিদ্বানের এইভাবে বিশ্বভ্রমণ সত্যিই আশ্চর্যের বিষয় বৈ-কি!

৫- হাসান বিন মুহাম্মাদ বিন আসাদ দেবলী (মৃঃ ৩৫০/৯৬১ খৃঃ)ঃ ইনি আবু ইয়ালা মূছেলী (মৃঃ ৩০৭)-এর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। তাঁর সনদের সূত্র খ্যাতনামা ছাহাবী জাবির বিন আব্দুল্লাহ (মৃঃ ৭৮ হিঃ) পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ৩৪০ হিজরীর দিকে তিনি দামেশকে হাদীছের প্রচার ও শিক্ষাদান শুরু করেন। তাম্মাম তাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্য ছিলেন।

৬- মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ দেবলী (মৃঃ ৩৫৪/৯৬৫ খৃঃ)ঃ ইনি অত্যন্ত নেককার ও সাধক আলেম ছিলেন। তিনিও ইলমে হাদীছের জ্ঞান লাভের জন্য বিদেশে গমন করেন। তিনি বছরার আবু খলীফা ফযল বিন হাবাব আল-জামহী (মৃঃ ৩০৫), বাগদাদের জা'ফর বিন মুহাম্মাদ আল-ফারিয়াবী (মৃঃ ৩০১ হিঃ), আসকার মুকাররমের আবদান বিন আহমাদ আস্-সুক্কারী (২১০-৩০৩) প্রমুখ বিদ্বানদের নিকট হ'তে হাদীছ শিক্ষা করেন। আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ হাকেম নিশাপুরী (৩২১-৪০৫) তাঁর অন্যতম প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন।

৭- খালাফ বিন মুহাম্মাদ দেবলী (মৃঃ ৩৬০ হিঃ)ঃ তিনি আলী বিন মূসা দেবলীর নিকট হ'তে দেবলে হাদীছের ইল্ম হাছিল করেন। পরে তিনি বাগদাদ গমন করেন ও সেখানে হাদীছের দরস দিতে থাকেন। সেখানে আবুল হোসায়েন বিনুল জুন্দী (৩০৬-৩৯৬) ও আহমাদ বিন ওমায়ের তাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্য ছিলেন।

৮- ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ দেবলী (মৃঃ ৩৪৫/৯৫৬ খৃঃ)ঃ ইনি মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ আবু জা'ফর দেবলীর (মৃঃ ৩২২/৯৩৪ খৃঃ) পুত্র ছিলেন। ইনিও পিতার ন্যায় হাদীছের রাবী ছিলেন। তিনি বাগদাদের হাফেয মূসা বিন হারূণ আল-বাযযায (মৃঃ ২৯৪ হিঃ) এবং মক্কার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ বিন আলী আছ-ছায়েগ আল-কাবীর (মৃঃ ২৯১) ও অন্যান্য ওলামায়ে হাদীছের নিকট হ'তে হাদীছ বর্ণনা করেন।

৯- আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আবুল আব্বাস দেবলী (মৃঃ ৩৭৩ হিঃ)ঃ ইনি একজন দুনিয়াত্যাগী হাফেয ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মুহাদ্দিছ ও ফক্বীহ ছিলেন। সপ্তাহে মাত্র একটি কাপড় নিজ হাতে সেলাই ও জুমআর দিনে সোয়া দিরহাম মূল্যে বিক্রয়ের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সর্বদা ছিয়াম ও তেলাওয়াতের মধ্যে দিন গুযরান করতেন। বহু কারামতের অধিকারী ছিলেন। রামাযানে সাহারীর সময় কেবলামুখী হ'য়ে তেলাওয়াতে রত থাকা অবস্থায় মিসরে তাঁর মৃত্যু ঘটে। কথিত আছে যে, তাঁর জানাযায় মিসরের সমস্ত লোক হাযির হয়েছিল, কেউ বাড়ীতে অবশিষ্ট ছিল না।

১০- আলী বিন মূসা দেবলীঃ ইনি খালাফ বিন মুহাম্মাদ দেবলীর (মৃঃ ৩৬০ হিঃ) উস্তায ছিলেন। ইনি দেবল ও বাগদাদ উভয় স্থানে হাদীছের দরস দিয়েছেন। আলী বিন মূসা চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর মুহাদ্দিছ ছিলেন।

১১- মুহাম্মাদ বিন হুসাইন আবুবকর দেবলীঃ তিনি মুহাম্মাদ বিন নুছাইর ইবনু আবী হামযাহ এবং জা'ফর বিন হামাদান ইবনু আবী দাউদ-এর নিকট হ'তে কিরাআত শিক্ষা করেন। তিনি একজন বিশ্বস্ত রাবী ছিলেন। হাফেয আবুল হাসান আলী বিন ওমর দারাকুতনী এবং আব্দুল বাকী বিনুল হাসান তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর অন্যতম উস্তাদ ইবনু আবী দাউদ নিশাপুরী ৩৩৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। সে হিসাবে বলা চলে যে, তিনি চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর মানুষ ছিলেন।

১২- হাসান বিন হামেদ বিনুল হাসান দেবলী (মৃঃ ৪০৭/১০১৬ খৃঃ)ঃ ইনি একই সঙ্গে কবি, সাহিত্যিক, মুহাদ্দিছ ও বড়দরের ব্যবসায়ী ছিলেন। এতগুলো গুণের একত্র সমাবেশ ঘটায় তৎকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ আরবী কবি আবু তাইয়িব আহমাদ আল-মুতানাব্বী (৩০৩-৩৫৪ হিঃ) একদা বাগদাদে তাঁর বাড়ীতে মেহমান হয়ে বলেন, لو كنت مادحا تاجرا لمدحتك 'যদি আমি কোন ব্যবসায়ীর প্রশংসা করে কবিতা লিখতাম তবে আপনাকেই প্রশংসা করতাম।' তিনি আলী বিন মুহাম্মাদ বিন সাঈদ আল-মূছেলী (মৃঃ ৩৫৯ হিঃ), দা'লাজ (মৃঃ ৩৫১), মুহাম্মাদ আন-নাককাশ (মৃঃ ৩৫১),আবু আলী ছুমারী (মৃঃ ৩৬০) প্রমুখ বিদ্বানগণের নিকট হ'তে হাদীছ শ্রবণ করেন। ইল্মে হাদীছের প্রতি তাঁর এত বেশী আগ্রহ ছিল যে, যখন তিনি হাদীছ বর্ণনা করতেন তখন দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরত। ইল্মে হাদীছে তিনি এতই ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন যে, দামেশক ও মিসরের মত শিক্ষা নগরীতে তিনি হাদীছ শিক্ষা দিতেন। তিনি বিশ্বস্ত রাবী ছিলেন। ৪০৭ হিজরীতে মিসরে পরলোক গমন করেন। উপরের আলোচনা থেকে ধারণা করা যায় যে, সে যুগের দেবলী মুহাদ্দিছগণ সমস্ত ইসলামী দুনিয়ায় অত্যন্ত পরিচিত ও সমাদৃত ছিলেন। ফলে তাঁদের তৎপরতা দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশেও পরিব্যপ্ত ছিল। তবুও স্বদেশ তাঁদের খিদমত হ'তে মাহরূম হয়নি। বরং তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে দেবল ও তৎসন্নিহিত এলাকায় আহলেহাদীছ জনগণের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান থাকে।

২য় কেন্দ্র : মানছূরাহ

সিন্ধু প্রদেশের হায়দারাবাদ শহর হ'তে ৪৭ মাইল উত্তর-পূর্বে শাহজাদপুর শহর থেকে আট মাইল দূরে সিন্ধু নদীর তীরে (করাচীর সন্নিকটে) প্রাচীন মানছূরা নগরীর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। সিন্ধু বিজয়ী সেনাপতি মুহাম্মাদ বিন কাসিম (৬৬-৯৬ হিঃ)-এর পুত্র সেনাপতি আমর বিন মুহাম্মাদ (মৃঃ ১২৬/৭৪৪ খৃঃ) ১১০ হিজরী মোতাবেক ৭২৮ খৃষ্টাব্দে এই শহর প্রতিষ্ঠা করেন। তখন হতে সপ্তম শতাব্দী হিজরী পর্যন্ত 'মানছূরাহ' ছিল সিন্ধুর রাজধানী ও সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ নগরী। মানছূরাতে ইল্ম ও আলিমের খুব কদর ছিল। অধিকাংশ অধিবাসী আহলেহাদীছ হওয়ার কারণে এখানে স্বাভাবিকভাবেই ইল্মে হাদীছ চর্চা খুব বেশী ছিল। মসজিদগুলি হাদীছের আলোচনায় সর্বদা গুলযার থাকত। এখানকার মুহাদ্দিছগণ সর্বদা হাদীছের দরস ও তাদরীসে মশগুল থাকতেন। তাঁরা হাদীছ বিষয়ক কেতাবাদি লিপিবদ্ধ করতেন। লেখনীর ক্ষেত্রে কাযী আবুল আব্বাস মানছূরীর নাম সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

মানছূরার মুহাদ্দিছবৃন্দ :

১-আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আবুল আব্বাস তামীমী আল-মানছূরী

মানছূরা এই খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ বাল্যকালে স্বদেশে শিক্ষালাভের পর উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বিদেশ গমন করেন। তিনি পারস্যে

মুহাদ্দিছ আবুল আব্বাস বিন আছরাম (মৃঃ ৩৩৬ হিঃ) এবং বছরায় আবু রওক আহমাদ আল-হাযরানী (মৃঃ ৩৩২ হিঃ)-এর নিকট হ'তে হাদীছ শিক্ষা করেন ও বর্ণনা করেন। তিনি পারস্যের পশ্চিম এলাকা আরজান-এর ক্বাযী নিযুক্ত হন। ৩৬০/৯৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি রেখারায় গেলে খ্যাতনামা হাদীছ সংকলক আবু আব্দুল্লাহ হাকেম নিশাপুরী (৩২১-৪০৫) তাঁর নিকট থেকে হাদীছের পাঠ গ্রহণ করেন। এতেই বুঝা যায় স্বীয় যুগে তিনি কত বড় নামকরা মুহাদ্দিছ ছিলেন। ইমাম হাকেম বলেন যে, তিনি এযাবত যত মুহাদ্দিছের সাক্ষাত লাভ করেছেন, তন্মধ্যে আবুল আব্বাস মানছূরীকে সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ ধীশক্তিসম্পন্ন দেখতে পেয়েছেন। ৩৭৫/৯৮৫ খৃষ্টাব্দে ভূপর্যটক মাকদেসী যখন মানছূরাতে আসেন, তখন তিনি আবুল আব্বাস মানছূরীকে তাঁর নিজস্ব মাদরাসায় বসে হাদীছের দরস দিতে দেখেন। মানছূরী একজন উঁচুদরের লেখকও ছিলেন। ইবনু নাদীম (মৃঃ ৩৭০ হিঃ) তাঁকে 'যাহেরী' মাযহাবের দশজন শ্রেষ্ঠ বিদ্বানের অন্যতম হিসাবে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তথাপি তাঁর বিরুদ্ধে স্বীয় আকীদার সমর্থনে হাদীছ জাল করার অভিযোগ আছে।

২-আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর বিন মুররাহ মানছূরী (মৃঃ ৩৯০ হিঃ)

তিনি হাসান বিন মুকাররম ও তাঁর সহযোগী মুহাদ্দিছগণের শিষ্য ছিলেন। খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ ইমাম হাকেম (৩২১-৪০৫) তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি কৃষ্ণবর্ণের মানুষ ছিলেন। উক্ত দু'জন সেরা হাদীছবিশারদ ছাড়াও মানছূরাতে ছোট বড় বহু মুহাদ্দিছ ছিলেন। যাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে ৩৭৫ হিজরী পর্যন্ত মানছূরাতে অধিকাংশ অধিবাসী 'আহলেহাদীছ' ছিলেন।

৩য় কেন্দ্র : কুছদার (বেলুচিস্তান)

কুছদার বেলুচিস্তানের দক্ষিণাংশে কালাত অঞ্চলে অবস্থিত। আরব শাসনামলে এই এলাকাকে 'তূরান' বলা হ'ত। তখনকার সময়ে তুরানের রাজধানী ও সমৃদ্ধ নগরী ছিল। আমীর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলে (৪১-৬০) সর্বপ্রথম ছাহাবী সিনান বিন সালামাহ মুহবিক্ব আল-হুযালী (৮-৫৩ হিঃ) কুছদার জয় করেন। কিন্তু বাশিন্দাগণ চুক্তি ভঙ্গ করে। পরে মানযার বিন জারূদ আল-আবাদী বুকান ও কীকান জয়ের পর এই এলাকা জয় করেন। পরবর্তীকালে মুহাম্মাদ বিন কাসিম-এর সময়ে (৯৩-৯৬ হিঃ) সিন্ধুর অন্যান্য এলাকার ন্যায় এই এলাকাও নিয়মিতভাবে ইসলামী খেলাফতের অধীনস্থ হয়। উল্লেখ্য যে, কুছদারে এক সময় খারেজীদের শাসন ছিল। কিরমানী, ফারিস ও খুরাসান হ'য়ে স্থলপথে আরবদের সঙ্গে এই শহরের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। আরবরা এখানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছিল। তাদের জন্য মসজিদ ছিল। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে প্রথম দিকে এখানে কোন হাদীছ শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কিছুটা স্থিতিশীলতা আসে এবং দেরীতে হ'লেও চতুর্থ শতাব্দী হিজরীতে এসে আমরা এখানে দু'একজন মুহাদ্দিছের সন্ধান লাভে সমর্থ হয়েছি- যাঁদের মাধ্যমে এইসব এলাকায় হাদীছভিত্তিক জীবন গঠনের আন্দোলন বিরাজিত থাকে। যেমন-

১-জা'ফর ইবনুল খাত্ত্বাব আবু মুহাম্মাদ আল-কুছদারী :

কুছদারে জন্মগ্রহণকারী এই বিদ্বান একজন দুনিয়াত্যাগী মুহাদ্দিছ ও ফক্বীহ ছিলেন। তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আবুল ফযল আবদুছ ছামাদ বিন মুহাম্মাদ বিন নাছীর আল-আছেমীর নিকটে হাদীছ শিক্ষা করেন এবং তাঁর কাছে হাদীছ শিক্ষা করেন হাফেয আবুল ফতূহ আব্দুল গাফের বিন হুসাইন বিন আলী কাশগড়ী। তিনি বল্‌খে বসবাস করেন। মুহাদ্দিছ জাফর বিনুল খাত্তাব সেই সকল প্রাচীন হাদীছবিশারদগণের অন্যতম ছিলেন, যারা পঞ্চম শতাব্দী হিজরীর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন।

২-সিবাওয়ায়েহ্ বিন ইসমাঈল বিন দাঊদ বিন আবুদঊদ আল-কুছদারী

সিবাওয়ায়েহ্ বিন ইসমাঈল বিন দাউদ বিন আবুদাউদ আল-কুছদারী মক্কায় জীবন কাটান ও সেখানেই হাদীছ শিক্ষা দেন। তিনি আবুল কাসিম আলী বিন মুহাম্মাদ আল-হুসাইনী, আবুল ফাত্হ রাজা বিন আবদুল ওয়াহেদ আল-ইছফাহানী এবং হাফেয আবুল হুসাইন ইয়াহ্ইয়া বিন আবুল হাসান রাওয়াসীর নিকট হ'তে হাদীছ শিক্ষা করেন। ৪৬০ হিজরীর কিছু পরে তিনি ইন্তেকাল করেন।

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, ৯৩ হিজরীতে সিন্ধু এলাকা ইসলামী খেলাফতের অধীনস্থ অঞ্চলে পরিণত হ'লেও এবং তাবেঈদের আগমন ঘটলেও এই এলাকায় ইল্‌মে হাদীছের নিয়মিত চর্চা তাৎক্ষণিকভাবে শুরু হয়নি। আব্বাসীয় খলীফা মাহ্দী (১৯৮-২১৮) হ'তে সিন্ধু এলাকা বিভিন্ন আরব সর্দারদের অধীনে মাহানিয়া, হিবারিয়া, সামিয়াহ প্রভৃতি কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। যদিও সকলে আব্বাসীয় খলীফাদের নামে খুৎবা পাঠ করতেন। সিন্ধুতে স্বাধীন আরব রাজ্যসমূহ কায়েম হ'লে এর ফলে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সৃষ্ট হয় এবং তা ইল্‌মে হাদীছ-এর প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। রাজনৈতিক শান্তি ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার ফলে চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর শেষার্ধে সিন্ধু এলাকায় ইল্‌মে হাদীছের চর্চা এত বেড়ে যায় যে, এখানকার ছাত্ররা আরব, সিরিয়া, ইরাক ও মিসরের হাদীছ শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে গমন করত। এমনকি বাগদাদ ও খোরাসান থেকে মুহাদ্দিছগণ দেবল ও মানছূরাতে এবং এইসব এলাকার মুহাদ্দিছগণ মক্কা, দামেশক, বাগদাদ ও মিসরে গিয়ে হাদীছ শিক্ষা দান করতেন। সাম'আনী (মৃঃ ৫৬৬ হিঃ)-এর বর্ণনা মতে খ্যাতনামা আহলেহাদীছ বিদ্বান আবু ওছমান ছাবূনী (৩৭৩-৪৪৯ হিঃ) -এর নিকট হাদীছ শিক্ষার জন্য হিন্দুস্থানী ছাত্রগণ নিশাপুর পর্যন্ত গমন করেছিলেন। হাদীছের এই ব্যাপক চর্চার ফলে এই অঞ্চলে আহলেহাদীছ আন্দোলন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং মাকদেসীর সাক্ষ্য অনুযায়ী ৩৭৫ হিজরীতে মানছূরা ও সিন্ধু অঞ্চলে আহলেহাদীছ জনসংখ্যা সর্বাধিক ছিল। কিন্তু আহলেহাদীছ আন্দোলনের এই অব্যাহত অগ্রগতির মুখে হঠাৎ অশনিপাত ঘটে মুলতান ও মানছূরাতে শী'আ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে। এর পর শুরু হয় উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইতিহাসে প্রায় সাড়ে সাতশত বৎসরের এক দীর্ঘ অবক্ষয় যুগ।

['আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ' শীর্ষক গ্রন্থ থেকে গৃহীত]।

তাওহীদের হায় এ চির সেবক,
ভুলিয়া গিয়াছে সে তাকবীর
দূর্গা নামের কাছাকাছি প্রায়,
দরগায় গিয়া লুটায় শির
ওদের যেমন রাম-নারায়ণ,
এদের তেমন মানিক পীর,
ওদের চাল ও কলার সঙ্গে,
মিশিয়া গিয়াছে এদের ক্ষীর।
-কাজী নজরুল ইসলাম

মসজিদে নববীর ইতিহাস

-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

{কাবাগৃহের পর মুসলিম উম্মাহ ২য় সর্বাধিক আকর্ষণের কেন্দ্র হল রাসূল (ছাঃ)-এর স্মৃতিবিজড়িত মাসজিদুন নববী। হজ্জের কোন অংশ না হলেও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হজ্জে আগত প্রত্যেক মুসলমানই এক ভিন্ন আবেগে মাসজিদুন নববীতে আগমণ করেন। সেই মাসজিদুন নববীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিয়েই এবারের বিশেষ নিবন্ধটি পত্রস্থ করা হল- নির্বাহী সম্পাদক।}

প্রাকইতিহাস :

৬২২ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে সেপ্টেম্বর সোমবার। নবুয়তের চতুর্দশতম বর্ষ। মক্কা থেকে রাসূল (ছাঃ) ৮ দিনের সংগ্রামমূখর পথ বেয়ে মদীনার (তৎকালীন ইয়াছরিব) উপকণ্ঠে কোবা নামক স্থানে এসে অবতরণ করলেন। মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর সাথী আবু বকর (রাঃ)– দু'জনের এই ছোট্ট কাফেলাকে সাদর সম্ভাষণে অভিষিক্ত করল মদীনাবাসী। সেখানে ৪ দিন বিরতির নিয়ে ১২ই রবিউল আওয়াল শুক্রবার তিনি মদীনার কেন্দ্রস্থলে স্বীয় মাতৃবংশ বনু নাজ্জার পল্লীতে আসলেন এবং মসজিদে নববীর বর্তমান অবস্থানে ছাহাবী আবূ আইয়ূব আনসারী

(রাঃ)-এর বাড়িতে এসে আশ্রয় নিলেন। মদীনাবাসীদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। আনাস (রাঃ) বলেন, মদীনায় সেদিনের মত আনন্দোজ্জ্বল সোনালী দিন আমি আর কখনো দেখিনি। কিছুদিন পর রাসূল (ছাঃ) একটি মসজিদ নির্মাণের মনস্থ করলেন এবং তাঁর উটনী 'কাছওয়া'র থেমে যাওয়ার স্থানকে মসজিদের জন্য নির্বাচন করলেন। এই জমি ছিল সাহল ও সুহায়েল নামক দুই ইয়াতীম বালকের মালিকানাধীন। তাদের কাছ থেকে জমি ক্রয়ের পর ইসলামের ১ম মসজিদের নির্মাণকাজ শুরু হল। অতঃপর আনছার ও মুহাজিরদের দীর্ঘ সাত মাসের যৌথ পরিশ্রমে কাঁচা ইটের ভিত এবং খেজুর পাতার ছাউনীতে খেজুর গাছের কাণ্ড দিয়ে নির্মিত খুঁটির উপর ৯৮×১১৫ ফুট আঙ্গিনা (১১০০ বর্গমিটার) ও ৭ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট মসজিদটি নির্মিত হল। এ মসজিদকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠতে লাগল পবিত্র মদীনা নগরী। অবশেষে তা কেবল মসজিদই রইল না বরং পরিণত হল অহিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার এক অভূতপূর্ব প্রাণকেন্দ্রে, পরিণত হল নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান পার্লামেন্ট এবং বিচারালয়েও। পরিণত হল তাওহীদের এমন একটি বিপ্লবী শিক্ষাকেন্দ্রে, যেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ছাহাবীগণ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ইসলামের বিজয় নিশান উড্ডীন করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, হিজরতের পর প্রথম ১৬ মাস বায়তুল মুকাদ্দাস তথা উত্তরদিকে কিবলা ছিল। অতঃপর আল্লাহ্‌র নির্দেশে বায়তুল্লাহ্‌র দিকে তথা দক্ষিণ দিকে কিবলা নির্ধারিত হয়। নিম্নে রাসূল (ছাঃ)-এর যুগ থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে এই মসজিদের সংস্কার ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল।

মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ কার্যক্রম

রাসূল (ছাঃ)-এর যামানা :

হিজরতের পর মদীনায় যেন বিদ্যুৎগতিতেই ইসলামের প্রসার ঘটতে লাগল। মসজিদে নববীতে জায়গা দ্রুতই সংকীর্ণ হয়ে আসতে লাগল। ফলে মসজিদ সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। অতঃপর ৭ম হিজরীতে খাইবার যুদ্ধের পর রাসূল (ছাঃ) মসজিদটিকে প্রস্থে ৪০ হাত এবং দৈর্ঘ্যে ৩০ হাত সম্প্রসারণ করলেন। এতে মসজিদটি ২৫০০ বর্গ মিটারের একটি বর্গাকার গৃহে পরিণত হল।

উমার বিনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর যামানা (১৭হিঃ):

আবু বকর (রাঃ)-এর যুগে মসজিদের পুরানো খুঁটিগুলো বদলিয়ে নতুন খুঁটি লাগানো হয়। অতঃপর উমার বিনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) ১৭ হিজরীতে মসজিদটিকে সুপরিসরভাবে পুনঃনির্মাণ করেন। এতে মসজিদের দৈর্ঘ্য ১৪০ ফুট, প্রস্থ ১২০ ফুট এবং উচ্চতা ১১ ফুটে পরিণত হল। নির্মাণকার্যে আগের মতই কাঁচা ইট ও খেজুর গাছের কাণ্ড ব্যবহার করা হয়।

ওছমান বিন আফ্‌ফান (রাঃ)-এর যামানা (২৯হিঃ) :

২৯ হিজরীতে ওছমান (রাঃ) পুণরায় মসজিদে নববী সংস্কারের উদ্যোগ নেন। তিনি কিবলার দিকে, উত্তর পার্শ্বে এবং পশ্চিমে সম্প্রসারণ করেন। সম্মুখভাগে তাঁর সম্প্রসারণকৃত সীমাটি আজও পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এই নির্মাণকাজে তিনি খোদিত পাথর, প্লাস্টার এবং ছাদে চন্দন কাঠ ব্যবহার করেন। প্রায় ১০ মাস ধরে এর নির্মাণকাজ করা হয়। তিনি মসজিদে ছালাত আদায়ের জন্য

মেহরাবের মত একটি কামরা নির্মাণ করেন, যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি ছালাত আদায় করাতেন। এর কারণ ছিল যেন ছালাতের সময় উমর (রাঃ)-এর হত্যাকাণ্ডের মত কেউ তাঁকে অতর্কিত আক্রমণ করতে না পারে। কামরাটি ছিল জানালাবিশিষ্ট যা দিয়ে মানুষ তাঁকে বাইরে থেকে দেখতে পেত।

উমাইয়া যুগ (৮৮ হিঃ) :

উমাইয়া শাসক আল ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক ৮৮ হিজরীতে (৭০৭ খৃঃ) মদীনার তৎকালীন গভর্নর উমর বিন আব্দুল আযীযকে মসজিদে নববী পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণের জন্য নির্দেশ দেন। প্রায় ৩ বছর ধরে এই নির্মাণ কাজটি করা হয়। এ সময় মসজিদটির পূর্বদিকে ৩০ হাত এবং পশ্চিম দিকে ২০ হাত সম্প্রসারণ করা হয়। উম্মুল মুমিনীনগণের গৃহসমূহ তথা রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর দুই সাহাবী আবু বকর ও উমর (রাঃ)-এর কবরও মসজিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়। মসজিদ নির্মাণে উমার বিন আব্দুল আযীয নকশাদার মর্মর পাথর, লোহা এবং সীসা ব্যবহার করেন। অভ্যন্তরীণ দেয়ালে সৌন্দর্যবর্ধক বিভিন্ন জ্যামিতিক নকশাও অংকন করা হয়। তিনিই সর্বপ্রথম মসজিদে নববীর ৪ কোনায় ৫০ হাত বিশিষ্ট ৪টি মিনার সংযোজন করেন এবং রাসূল (ছাঃ) ও ওছমান (রাঃ)-এর ছালাতের স্থানে মিহরাব নির্মাণ করেন।

আব্বাসীয় যুগ (৯১ হিঃ) :

আব্বাসীয় শাসক আল মাহদী ৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হজ্জের সফরে আসেন এবং মদীনার গভর্নর জা'ফর বিন সুলাইমানকে মসজিদটি আরো সম্প্রসারিত করার নির্দেশ দেন। অতঃপর তিন বছর ধরে এর সংস্কার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এসময় মসজিদটি উত্তর দিকে আরো ১০০ ফুট বৃদ্ধি করা হয়। আব্বাসীয় যুগেই মসজিদের যমীনকে সাদা মার্বেল পাথর দিয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয় এবং মসজিদের দেয়ালসমূহে মোজাইক পাথরের আস্তরণ দেয়া হয়।

মামলুকী শাসনামল (৬৫৪ হিঃ) :

৬৫৪ হিজরীতে এক অগ্নিকাণ্ডে মসজিদে নববী ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতঃপর আব্বাসীয় শাসক মু'তাছিম বিল্লাহ পরবর্তী বছর সংস্কার কাজ শুরু করেন, কিন্তু তাতারীদের হামলার কারণে তা আর শেষ করে যেতে পারেননি। অতঃপর মিসর ও ইয়ামানের শাসকগণ বাকি কাজ সম্পন্ন করার প্রয়াস গ্রহণ করেন। ৬৭৮ হিজরীতে (১২৭৯ খৃঃ) মামলুক সুলতান কালাউন সর্বপ্রথম রাসূল (ছাঃ)-এর কবরের উপর একটি গম্বুজ প্রতিষ্ঠা করেন। ৮৮৬ হিজরীতে (১৪৮১ খৃঃ) মসজিদে নববী ২য় বারের মত অগ্নিকাণ্ডের শিকার হয়। এসময় সুলতান আশরাফ কায়েতবায়ী দ্রুত সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং মসজিদের পূর্বাংশে বর্ধিত করেন। তিনি ২২ হাত উঁচুতে মসজিদের ছাদ নির্মাণ করেন এবং রাসূল (ছাঃ) কবরের উপর একটি কালো পাথরের গম্বুজও নির্মাণ করেন।

ওছমানীয় শাসনামল :

ওছমানীয় সুলতানগণের আমলে প্রয়োজন মোতাবেক এ মসজিদের সংস্কারকাজ পরিচালিত হয়। তবে সে সময় মৌলিক কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা হয়নি। এভাবে প্রায় ৩৭০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ১২৬৫ হিজরীতে (১৮৪৯ খৃঃ) তুর্কী সুলতান আব্দুল মজিদ (১ম)-এর নির্দেশে মসজিদটিকে ভেঙ্গে নতুন নকশায় পুনঃনির্মাণ করা হয়। শুধু রওযা মুবারক, ওছমান (রাঃ) ও সুলায়মানের মেহরাব এবং প্রধান মিনার অক্ষত রাখা হয়। কেননা এসবের নকশা ছিল খুব নিখুঁত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। মদীনার পার্শ্ববর্তী আকীক উপত্যাকার আল-হারাম

পাহাড় খনন করে সেখানে প্রাপ্ত লাল পাথর দিয়ে মসজিদের মূল ভবন তৈরী করা হয়। পুরো মসজিদের মেঝে ও দেয়ালকে মার্বেল পাথরে মুড়িয়ে দেয়া হয়। নানা নকশায় গম্বুজগুলোর অভ্যন্তরভাগ চিত্রিত করা হয়। ফলে স্থাপত্যশৈলী এবং নান্দনিকতায় মসজিদে নববী পরিণত হয় এক বিস্ময়কর সৌন্দর্যের প্রতীকে। ১২৭৭ হিজরীতে (১৮৬০ খৃঃ) সালে এই নির্মাণকাজ শেষ হয়।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তুর্কী সুলতান মাহমুদ (২য়) রাসূল (ছাঃ)-এর কবর উপরস্থিত গম্বুজে নীল আস্তরণ লাগান। অতঃপর ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তাতে সবুজ আস্তরণ দেন। অদ্যাবধি গম্বুজের উপর এ সবুজ রংই স্থায়ী রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ওছমানীয় আমলে চার মাযহাবের লোকদের জন্য মসজিদে নববীতে আলাদা আলাদা ইমাম নিয়োগ করা হয়েছিল এবং প্রত্যেকে স্ব স্ব অনুসারীদের নিয়ে পৃথকভাবে ছালাত আদায় করতেন। বর্তমান সঊদী হুকুমত কায়েমের পূর্ব পর্যন্ত এই নীতি চালু ছিল। বর্তমানে মসজিদের যে মেহরাবটিকে সুলায়মানী মেহরাব বলা হয় তা পূর্বে মেহরাবে হানাফী নামে পরিচিত ছিল।

সঊদী শাসনামল

১৯৩২ সালে সঊদী শাসনামল শুরু হবার পর থেকে মসজিদে নববীর অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। কয়েকটি ধাপে এ সংস্কার সাধিত হয়েছে।

প্রথম সম্প্রসারণ ও পুনঃনির্মাণ :

বাদশা আব্দুল আযীয ১৯৫৩ সালে সর্বপ্রথম ব্যাপকভিত্তিক সংস্কারকার্য আরম্ভ করেন। মূল মসজিদের আয়তন তখন ছিল মাত্র ৬,২৪৬ বর্গমিটার। সংস্কারের পর মসজিদের মোট আয়তন বেড়ে দাঁড়ায় ১৬,৩২৬ বর্গমিটার। ১৯৫৫ সালে প্রায় ৫০ মিলিয়ন রিয়াল ব্যয়ে মসজিদের নতুন ইমারত নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়। এ সম্প্রসারণকার্যের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল পুরো মসজিদ এ সময় কংক্রিট দিয়ে ঢালাই করা হয়। এতে ছিল ২৩২টি পিলার। মসজিদের ৫টি মিনার থেকে ৩টি ভেঙ্গে ফেলা হয়। পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত দুটো নতুন মিনার নির্মিত হয়। প্রত্যেকটি মিনার ছিল ৭২ মিটার উঁচু। ১৯৭৩ সালে বাদশাহ ফয়সাল পুনরায় মসজিদ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ দফায় মসজিদের চত্বরে মুছল্লীদের রোদের হাত থেকে রক্ষার জন্য ছাতা স্থাপন করা হয়।

২য় দফা সম্প্রসারণ :

বাদশাহ ফাহাদ বিন আব্দুল আযীয মসজিদে নববীর যে সম্প্রসারণ কাজ হাতে নেন তা এ যাবৎকালের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ। এই

সম্প্রসারণের পর মসজিদের আয়তন প্রায় ৭ গুণ (৯৮.৫০০ বর্গমিটার) বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৪ সালে এ সম্প্রসারণ কাজ শুরু হয়ে ১৯৯৪ সালে তা সমাপ্ত হয়। ভবনটিতে রয়েছে বেজমেন্ট, নিচতলা ও ছাদ। ভবনের মূল অংশ নিচতলার ৮২,০০০ বর্গমিটার স্পেস জুড়ে ৬ মিটার ব্যবধানে পিলার রয়েছে মোট ২১০৪টি, যার প্রতিটির নিম্নাংশ দিয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বায়ুপ্রবাহের ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে রয়েছে ২৭টি উন্মুক্ত চত্বর বা প্লাজা যার প্রতিটি ভ্রাম্যমান গম্বুজবিশিষ্ট এবং প্রয়োজনে তা উন্মুক্ত করা যায়। মসজিদের ছাদেও ছালাত আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে যেখানে ৯০ হাজার মুছল্লী একত্রে ছালাত আদায় করতে পারে। মসজিদের মূল ভবন তথা রিয়াযুল জান্নাতের সামনের দু'অংশে বিভক্ত দু'টি খোলা চত্বরে মোট ১২টি স্বয়ংক্রিয় শ্বেতশুভ্র সোনালী কারুকার্যময় ছাতা স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া বিশাল বহির্চত্বরে চমৎকারভাবে সুসজ্জিত আরো প্রায় ২৫০টি স্বয়ংক্রিয় ফোল্ডিং ছাতা স্থাপিত হয়েছে।

মসজিদের চতুর্পার্শ্বে রয়েছে বিশাল খোলা চত্বর। যার আয়তন ২,৩৫,০০০ বর্গমিটার। এর কিছু অংশ সাদা শীতল মর্মর পাথর দিয়ে মোড়ানো যাতে সূর্যতাপে তা তেতে না উঠতে পারে। বাকি অংশ গ্রানাইট পাথরে ঢাকা। এখানে ৪,৩০,০০০ মুছল্লী একসাথে ছালাত আদায় করতে পারেন। প্রথম সম্প্রসারণের পর মূল মসজিদের ধারণ ক্ষমতা যেখানে ছিল ২৯,৭৭৮ জন, ২য় সম্প্রসারণের পর তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,৬৮,০০২ জনে। সুতরাং সবমিলিয়ে এখন ৭,৮৮,০০২ জন মুছল্লী এক সঙ্গে ছালাত আদায় করতে পারে। ইমারতের মূল রং সাদা, যার মধ্যে লাল-কালোর মিশ্রণ রয়েছে। মসজিদের উত্তর-পূর্বকোণে ১৬,০০০ বর্গমিটার এবং পশ্চিম-উত্তর কোণে ৮০০০ বর্গমিটার স্থান মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট করা রয়েছে।

মসজিদের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা বিশাল আন্ডারগ্রাউন্ড অফিস থেকে পরিচালিত হয়। মসজিদ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য মসজিদ থেকে ৭ কি.মি. পশ্চিমে বিশ্বের বৃহত্তম এয়ারকণ্ডিশনিং মেশিনারিজ স্থাপন করা হয়েছে। যেখান থেকে সুড়ঙ্গপথে বিশেষ পাইপ ও টিউবের মাধ্যমে মসজিদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। মসজিদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রায় ১৩০০ কর্মী নিয়মিত কর্মরত রয়েছে।

নতুন সম্প্রসারণ পরিকল্পনা :

প্রতিবছর দ্রুতগতিতে যিয়ারতকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ২০০৯ সালের জুন মাসে বর্তমান সঊদী বাদশাহ আব্দুল্লাহ নতুন করে মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ কাজ শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন। পূর্ব ও পশ্চিম দিকে এই সম্প্রসারণ শুরু হতে যাচ্ছে। নতুন পরিকল্পনা মোতাবেক মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে সার্বিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন এক বিশাল কমপ্লেক্স গড়ে তোলা হবে। ২৫ বিলিয়ন ডলার ব্যায়ে নির্মিতব্য এই বিশাল কমপ্লেক্সটি ২০১২ সালের হজ্জ মওসূমের পর পুরোদমে শুরু হবে এবং ৩টি ধাপে ২০৪০ সাল নাগাদ সমাপ্ত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মসজিদে নববীতে প্রায় ১৬ লক্ষ মুছল্লীর জায়গা সংকুলান হবে।

বিশেষ কিছু স্থানের বর্ণনা

রাসূল (ছাঃ)-এর রওযা :

মসজিদে নববীর পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত রাসূল (ছাঃ)-এর হুজরাখানা ও কবর। ৮৭ হিজরীর পূর্ব পর্যন্ত হুজরাখানাটি মসজিদের বাইরে ছিল। মসজিদ প্রশস্ত করার প্রয়োজন দেখা দিলে হুজরাগুলোকে মসজিদের মধ্যে শামিল করে নেয়া হয়। রাসূল (ছাঃ)-এর কবরসহ একই স্থানে পশ্চিম-পূর্ব হয়ে শায়িত আছেন আবু বকর (রাঃ) এবং উমর (রাঃ)। কিবলার দিক থেকে প্রথমে শায়িত রয়েছেন রাসূল (ছাঃ)। তাঁর উত্তর পার্শ্বে যথাক্রমে রাসূল (ছাঃ)-এ সিনা বরাবর আবুবকর (রাঃ) এবং তাঁর সিনা বরাবর উমর (রাঃ)-এর কবর। এরপর একটি কবর দেয়ার স্থান বাকী রয়েছে যেখানে ঈসা (আঃ)-এর কবর হবে মর্মে একটি যঈফ হাদীছ পাওয়া যায় *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৭৭২)*। চতুষ্কোনবিশিষ্ট ঘরে অবস্থিত এই তিনজনের কবরকে ঘিরে একটি পাঁচ কোনা উঁচু দেয়াল নির্মাণ করে দেন উমর বিন আব্দুল আযীয (র.) যাতে হুজরাটি কাবার মত না দেখায় এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ তাকে ঘিরে তাওয়াফ করা না শুরু করে। ৬৬৮ হিজরীতে সুলতান রুকুনুদ্দীন বায়বারাস কবরগাহের চারপাশ দিয়ে লোহা ও পিতলের জালি দিয়ে ঘিরে দেন, যাকে 'মাকছূরা' বলা হয়। ৮৮৮ হিজরীতে সুলতান কাতেবায়ী লোহা ও পিতলের ঘন জালি দিয়ে ছাদ পর্যন্ত ঢেকে দেন। পরবর্তীতে তুর্কী সুলতান সুলায়মান খান (৯২৬-৯৪৮ হিঃ) 'মাকছূরা'র উপর মর্মর পাথর লাগিয়েছেন। অনেক মুছল্লী এই 'মাকছূরা'কেই রাসূল (ছাঃ)-এর হুজরা ভেবে ভুল করে। এই মাকছূরার চারটি দরজা রয়েছে। তবে সবগুলোই বন্ধ থাকে। কেবলমাত্র পূর্বদিকে 'বাবে তাওবা'টি বিশেষ উপলক্ষে খোলা হয়।

স্মর্তব্য যে, রাসূল (ছাঃ)-এর কবর মসজিদের মধ্যে হয়নি, যেমনটি অনেকে ধারণা করে। বরং আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহে তাঁকে কবরস্থ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে মসজিদ প্রশস্ত করতে গিয়ে বাধ্যগত অবস্থায় তাঁর কবর মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

রিয়াযুল জান্নাহ :

রাসূল (ছাঃ)-এর কবর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানকে রিয়াযুল জান্নাত বলা হয়। এই স্থানটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার ঘর থেকে মিম্বর পর্যন্ত স্থানটুকু জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগান এবং আমার মিম্বর কিয়ামতের দিন হাউযে কাউছারের উপর স্থাপন করা হবে *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯৪)*। স্থানটি দৈর্ঘ্যে ২২ মিটার এবং প্রস্থে ১৫ মিটার। কয়েকশ মানুষ এখানে একসাথে ছালাত আদায় করতে পারে। হজ্জের মৌসুমে এর দুটি প্রবেশপথে প্রচণ্ড ভিড়ের সামাল দেয়ার জন্য পুলিশ পাহারারত থাকে। পৃথকভাবে বোঝানোর জন্য স্থানটিতে ভিন্ন রঙের পাথর দিয়ে মোড়া রয়েছে।

Contents

মিম্বর :

রাসূল (ছাঃ) সর্বপ্রথম খুৎবা দিতেন একটি খেঁজুর গাছের খুঁটিতে।

অতঃপর ৮ম হিজরীতে তাঁর জন্য ঝাউগাছের কাণ্ড দিয়ে ১ মিটার উচ্চতার একটি মিম্বর তৈরী করা হল। মিম্বরটি ছিল ৩ সিঁড়ি বিশিষ্ট যার ৩য় ধাপে রাসূল (ছাঃ) বসতেন। আবু বকর (রাঃ) খলীফা হবার পর রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মানার্থে ২য় ধাপে বসতেন। এরপর উমর (রাঃ) ৩য় ধাপে বসতেন এবং মাটিতে পা রাখতেন। ওছমান (রাঃ)ও ছয় বছর পর্যন্ত ৩য় ধাপেই বসতেন। তারপর তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর বসার স্থানেই বসা আরম্ভ করলেন। আমীর মু'আবিয়া (রাঃ) হজ্জ করতে এসে এই মিম্বরের ধাপ বৃদ্ধি করে দেন। ফলে তা ৯ ধাপ বিশিষ্ট হল। পরবর্তী খত্বীবগণ ৭ম ধাপে বসতেন যা ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর মিম্বরের ১ম ধাপ। ১২৫৬ খৃষ্টাব্দে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত মিম্বরটি সেভাবেই ছিল। এরপর আরো কয়েকবার নির্মিত হয়। কিন্তু ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে আবার আগুনে পুড়ে গেলে মিম্বরটি পাকা করা হয়। সর্বশেষ ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে তুর্কী সুলতান তৃতীয় মুরাদ মর্মর পাথর দিয়ে বানানো স্বর্ণের প্রলেপে সুসজ্জিত কারুকার্যময় একটি মিম্বর প্রেরণ করেন। এই মিম্বরে ১২টি সিঁড়ি রয়েছে। ৩টি সিঁড়ি বাইরে এবং ভিতরে ৯টি। আজও পর্যন্ত এই মিম্বরটিই মসজিদে নববীতে শোভা পাচ্ছে।

মিনার :

রাসূল (ছাঃ) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় মসজিদে নববীতে কোন মিনার ছিল না। সর্বপ্রথম ৯১ হিজরীতে উমর বিন আব্দুল আযীয মসজিদের চার কোনে চারটি মিনার নির্মাণ করেন। সর্বশেষ সম্প্রসারণে নির্মিত নতুন ৬টি মিনারসহ মোট মিনারের সংখ্যা বর্তমানে ১০টি। নতুন মিনারগুলোর উচ্চতা ১০৪ মিটার। মিনারের চূড়া স্বর্ণালী চন্দ্রাকৃতি এবং সর্বাঙ্গ অত্যন্ত সুদৃশ্য কারুকার্য দ্বারা খচিত। মিনারগুলো স্নিগ্ধ আলোকসজ্জার কারণে রাতের বেলায় অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠে।

গম্বুজসমূহ :

মসজিদে নববীর ছাদে রাসূল (ছাঃ)-এর কবর বরাবর স্থানে নির্মিত গম্বুজটি সর্বপ্রথম নির্মাণ করেন ৬৭৮ হিজরীতে (১২৭৯ খৃঃ) মামলুক সুলতান কালাউন। অতঃপর ৮৮৬ হিজরীতে (১৪৮১ খৃঃ) অগ্নিকাণ্ডে মসজিদে নববী ক্ষতিগ্রস্ত হবার পর সুলতান আশরাফ কায়েতবায়ী পুণরায় একটি কালো পাথরের গম্বুজ নির্মাণ করেন। পরবর্তী শাসকদের আমলে তাতে সাদা এবং নীল রঙের প্রলেপ দেয়া হয়েছিল। ৯৪৬ হিজরীতে গম্বুজের উপর তুর্কী খেলাফতের প্রতীকবাহী চন্দ্রাকৃতি স্থাপন করেন মক্কার শরীফ ওয়াছেল। অতঃপর ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে (১২৫৮ হিঃ) তুর্কী সুলতান মাহমূদ খান গম্বুজের উপর সবুজ রঙের প্রলেপ দেন। তখন থেকে এটি 'কুব্বাতুছ ছাখরা' নামে পরিচিতি লাভ করে।

উল্লেখ্য যে, ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ওয়াহ্হাবী সংস্কারবাদীরা মদীনা আক্রমণ করার পর বাকী' কবরস্থানের সকল কবরের উপর থেকে গম্বুজ ভেঙ্গে ফেললেও এই গম্বুজটি অপসারণ করেননি। এর কারণ সম্পর্কে আল্লামা রশীদ রেযা তাঁর 'আল-ওয়াহহাবিয়্যিন ওয়াল হিজায' গ্রন্থে লিখেছেন, 'সম্ভবত মুসলিম জনসাধারণের হৃদয়পটে রাসূল (ছাঃ)-এর সুমহান মর্যাদা এবং গম্বুজটির বিশ্বব্যাপী পরিচিতির দিকে লক্ষ্য রেখে ফিৎনার আশংকায় ওয়াহ্হাবীগণ এই গম্বুজটি ভাঙ্গা থেকে বিরত ছিলেন' *(পৃ.৬৯-৭১)*। তাই কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ নিষিদ্ধ হওয়া সত্বেও এবং এর বিরুদ্ধে সঊদী ওলামায়ে কেরামের সোচ্চারকণ্ঠ হওয়া সত্বেও অদ্যবধি 'কুব্বাতুছ ছাখরা' বা সবুজ গম্বুজটি অক্ষত রাখা হয়েছে। 'কুব্বাতুছ ছাখরা' ছাড়াও মসজিদের বিভিন্ন স্থানে আরো ২৭টি স্থানান্তরযোগ্য গম্বুজ স্থাপন করা হয়েছে।

স্তম্ভসমূহ :

রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে মসজিদে নববীতে ৩৫টি খেজুর কাণ্ডের খুঁটি ছিল। পরবর্তীতে মসজিদ প্রশস্ত হওয়ার সাথে সাথে খুঁটির সংখ্যাও বাড়তে থাকে। বর্তমানে খুঁটির সংখ্যা প্রায় ৫ শতাধিক ছাড়িয়ে গেছে। তবে মসজিদের অভ্যন্তরে রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে যেসকল স্থানে স্তম্ভ ছিল তা অদ্যবধি অক্ষত রাখা হয়েছে। ফলে মসজিদের সম্মুখভাগে স্ত ম্ভের সারি বেশী ঘন হয়ে গেছে। তুর্কী আমলে যখন মসজিদ সংস্কার করা হয়, তখন খুঁটির সংখ্যা কমিয়ে মসজিদের ভিতর খালি জায়গা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে মদীনার আলেমগণ এসব ঐতিহাসিক খুঁটি ভাঙ্গার বিরোধিতা করলে সে অবস্থাতেই খুঁটিগুলো রেখে দেয়া হয়।

দরজাসমূহ :

মসজিদে নববীর দরজা রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে ছিল ৩টি। পরে উমর (রাঃ) এ সংখ্যা ছয়টিতে উন্নীত করেন। সর্বশেষ সংস্কারের পর মসজিদে নববীতে বর্তমানে মোট ১১টি সদর দরজাসহ মোট ৮১টি দরজা রয়েছে। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে রয়েছে বাবে জিবরীল যে দরজা দিয়ে রাসূল (ছাঃ) প্রবেশ করতেন। খন্দকের যুদ্ধের পর জিবরীল (আঃ) এই দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন বলে একে বাবে জিবরীল বলা হয়।

শেষকথা :

মসজিদে নববী বর্তমান বিশ্বের ২য় বৃহত্তম মসজিদ এবং ইসলামে বৈধ ৩টি তীর্থযাত্রাস্থলের অন্যতম। রাসূল (ছাঃ)-এর পবিত্র স্মৃতিবিজড়িত হওয়ার কারণে মুসমানদের সাথে রয়েছে এই মসজিদটির এক অপরিমেয় আবেগের বন্ধন। প্রতিবছর হজ্জের সময় ছাড়াও লক্ষ লক্ষ মুসলমান মসজিদে নববী যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমণ করে থাকেন। প্রতিবছরই বাড়ছে এ সংখ্যা। ফলে গত পৌনে একশ বছরেই মসজিদে নববীকে সম্প্রসারণ করতে হয়েছে প্রায় ১০০ গুণ। ২০৪০ সাল নাগাদ যা পৌঁছাবে প্রায় ২০০ গুণ। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও বৃদ্ধি পাচ্ছে সমান গতিতে। মুসলিম জাতির হৃদয়পটে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি যে অফুরন্ত ভালবাসার ফল্গুধারা বইছে প্রতিনিয়ত, এটা তারই বহিঃপ্রকাশ। এই ভালবাসা বহ্নিশিখা হয়ে যদি কোনদিন মুসলিম জাতির হৃদয় জগত ছাপিয়ে তাদের কাজে-কর্মে, আমলে-আদর্শে, নিঃশ্বাসে-বিশ্বাসে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, সেদিন যে পৃথিবীর বুকে পরিবর্তনের রূপরেখা সূচিত হতে খুব বেশী সময় লাগবে না, তা বলাই বাহুল্য। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

আধুনিক যুগের নতুন ফিৎনা

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদভী

[সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদভী (১৯১৩-১৯৯৯ খৃঃ) আধুনিক যুগে ভারত উপমহাদেশের একজন খ্যাতনামা আলেম এবং প্রাজ্ঞ লেখক ও ইতিহাসবিদ। তিনি ছিলেন ভারতের খ্যাতনামা ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'নাদওয়াতুল উলামা'র সাবেক ছাত্র এবং পরবর্তীতে রেক্টর। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই শিক্ষাবিদ স্বীয় জ্ঞানবত্তা এবং সাংগঠনিক দক্ষতার কারণে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছিলেন। একজন অনারবী হয়েও তিনি আরবী ভাষায় ছিলেন অত্যন্ত উঁচুমানের পণ্ডিত এবং তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থই রচিত হয়েছে আরবী ভাষায়। আরবী ও উর্দূ ভাষায় তাঁর লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা পঞ্চাশেরও অধিক, যা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর লেখার মূল বিষয়বস্তু ছিল ধর্মতত্ত্ব, ইসলামের ইতিহাস এবং সমকালীন মুসলিম জাহান। এছাড়া তাঁর সেমিনার পেপার, প্রবন্ধ এবং ধারণকৃত বক্তব্যের সংখ্যা সহস্রাধিক। ১৯৬৩ সালে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। ১৯৮০ সালে তিনি মর্যাদাপূর্ণ 'কিং ফয়সাল' পুরস্কার লাভ করেন। একই সালে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টারে'র চেয়ারম্যান পদে অভিষিক্ত হন। ১৯৮১ সাল তিনি কাশ্মীর ইউনিভার্সিটি কর্তৃক সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৯৯ সালে আরব আমিরাত সরকার তাঁকে "Personality of the year" বা 'বছরের সেরা ব্যক্তিত্ব' হিসাবে ঘোষণা করে। এছাড়া রাবেতা আলম, ওয়ামী প্রভৃতি সহ জাতীয়, আন্তর্জাতিক বহু ইসলামী ফোরামের তিনি সম্মানিত সদস্য ছিলেন। আলোচ্য নিবন্ধটি লেখকের ভাষণ সংকলন 'পা-জা-সুরাগে যিন্দেগী' থেকে গৃহীত যা 'জীবন পথের দিশা' শিরোনামে মাওলানা এ কিউ এম ছিফাতুল্লাহ বঙ্গানুবাদ করেছেন। ১৯৭২ সালের ১২ই আগষ্ট দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসার মিলনায়তনে উপস্থিত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি এই মূল্যবান বক্তব্যটি রেখেছি*লেন–নির্বাহী সম্পাদক*]

স্নেহাস্পদ হৃদয়ের টুকরা ছাত্রভাইয়েরা!

তোমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি ইসলামী চেতনা ও জীবনধারার প্রেরণাকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যুগের চ্যালেঞ্জ সত্যিকারভাবে মুকাবিলার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। তোমরা কিছুতেই যুগের চ্যালেঞ্জকে উপেক্ষা করতে পারো না। অন্ততপক্ষে দারুল উলূম দেওবন্দ ও নাদওয়াতুল উলামা লাখনৌর পক্ষে যুগের দাবী ও চ্যালেঞ্জ উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করার কোন বৈধতা নেই; কেননা যুগের দাবী পূরণ ও যুগের চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় এ প্রতিষ্ঠানদ্বয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাশ্চাত্য জড়বাদী দর্শন ও সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং ধর্ম নৈতিকতা বর্জিত বৃটিশ শিক্ষা পদ্ধতিই ছিল তৎকালীন সময়ে সবচাইতে বড় ফিতনা। কিন্তু এটিও লক্ষণীয় বিষয় যে, ফিতনা কোন যুগের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় আবার সকল যুগের ফিতনা ও তার প্রক্রিয়া একই ধরনের হয় না। বিভিন্ন যুগে নানা ফিতনার উদ্ভব ঘটে এবং মুসলিম উম্মাহ্‌কে নতুন নতুন সঙ্কটের আবর্তে নিক্ষেপ করে। জাহিলিয়াত নতুন নতুন রূপ ধরে অভিনব মুখোশ পরে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও চাকচিক্যময় মনমাতানো রূপ নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়।

দার্শনিক মহাকবি আল্লামা ইকবাল যথার্থই বলেছেন :

اگر چہ پیر ہے مؤمن جواں ہیں لات ومنات

'মুমিন যদিও বৃদ্ধ, লাত-মানাতরা এখনও তরুণ'।

ছোট্ট একটি বাক্যের মাধ্যমে মহাকবি আল্লামা ইকবাল ভয়ংকর ও মারাত্মক সত্যের ইংগিত করেছেন। তিনি এখানে লাত ও মানাতরা বলতে শুধু মূর্তি ও প্রতিমাকে বোঝান নি বরং ইসলাম বিরোধী বাতিল মতবাদসমূহের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। প্রাচীন জাহিলিয়াত পুরো শক্তি নিয়ে প্রাণবন্ত থাকবে, আর মুমিন যারা সাইয়িদেনা ইবরাহীম (আঃ)-এর অনুসারী ও উত্তরাধিকারী, তারা সেকেলে গোঁড়ামি, হীনমন্যতা, বৈরাগ্য, পশ্চাদপসারণ, প্রতিক্রিয়াশীলতা ও ঘৃণ্য মানসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে। আধুনিক জাহিলিয়াত নতুন উদ্দীপনা, নতুন প্রস্তুতি ও অভিনব আকর্ষণীয় স্লোগান নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হবে। আর মুমিনরা মৃত্যুর নিদ্রার কোলে ঢলে পড়বে। তাদের জীবনের গতিশীলতা ও স্পন্দন যেন স্তিমিত হয়ে যাবে। চিন্তার ভারসাম্য হারিয়ে তারা মুক্তির সন্ধানে পলায়নপর মানসিকতায় ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে জীবন সংগ্রামের সংঘাতময় পথকে পরিহার করে সংসারত্যাগী বৈরাগ্যের আস্তানায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করবে। সংগ্রামের জীবন থেকে তাদের দূরে অবস্থানের কারণে বাতিলরূপী লাত ও মানাত ময়দানে নর্তন-কুর্দন ও লম্ফ-ঝম্ফ মেরে মুকাবিলার আহ্বান জানাতে থাকবে।

আধুনিক কালের সর্ববৃহৎ ফিতনা

শ্রোতামণ্ডলী!

বর্তমান কালের সবচেয়ে বড় ফিতনা ও চ্যালেঞ্জ কি? এ যুগের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ইসলামকে তার জীবনাদর্শের স্বাতন্ত্র্য, ইসলামী সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার বৈশিষ্ট্য, এর নিজস্ব তামাদ্দুন ও সমাজব্যবস্থা, ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থা, এর শিক্ষা দর্শন ও শিক্ষা পদ্ধতি, ভাষা ও সাহিত্য, বর্ণমালা ও শব্দকলা, তথা সমস্ত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা। শত্রুদের উদ্দেশ্য হলো, কোন কোন ধর্মমত যেমন কতিপয় স্তবস্তুতি, পূজা অর্চনা, বিবাহ-শাদী, মৃতের সৎকার অনুষ্ঠান ইত্যাদি কার্যক্রমকে মূলধন করেই পরিচালিত হয়ে থাকে, ইসলামকে এ ধরনের নিছক অনুষ্ঠান সর্বস্ব একটি অপূর্ণাঙ্গ ধর্মে পরিণত করা।

আগামীকাল কী হবে জানিনা, তবে এখনো আশংকা পোষণ করি না যে, হিন্দুস্তানে আওয়াজ উত্থিত হবে যে, তোমরা ছালাত কায়েম করতে পারবে না, যাকাত দিতে পারবে না। বিশেষ ধরনের আক্বীদা পোষণ করতে পারবে না। তবে এখন হিন্দুস্তানের মুসলমানদের সামনে সে দুর্যোগপূর্ণ এমন সময় অবশ্যই উপস্থিত হয়েছে, যেখানে আকারে-ইঙ্গিতে অস্পষ্ট ভাষায় এমনকি সুস্পষ্টভাবেও দাবী উত্থাপিত হচ্ছে ও হবে যে, হিন্দুস্তানে বসবাস করতে হলে ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনধারার সাথে তোমাদের একাকার হয়ে যেতে হবে; মুসলমানদেরকে স্বেচ্ছায় সেসব আচার-আচরণ ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ড হতে নিজেদের সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করতে হবে,

যা এ ভূখণ্ডে আলাদা সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের অধিকারী একটি স্বতন্ত্র জাতি বলে চেতনা সৃষ্টি করে। তারা নিজেরাই যেন তাদের পারিবারিক আইন (পার্সোনাল) ও উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদির ক্ষেত্রে পুরাতন আইন পদ্ধতির বিলোপ সাধন ও পরিবর্তন দাবী করে সারা হিন্দুস্তানে একই ধরনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পারিবারিক ও উত্তরাধিকারী আইন প্রবর্তন কার্যকরণের দাবী উত্থাপন করে। *(সম্প্রতি ভারতে সুস্পষ্ট পারিবারিক আইন পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে–অনুবাদক)*।

মুসলমানরা নিজেদের শিক্ষা দর্শন, জীবনধারার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের জন্য নিজেদের খুন ঝরা সম্পদ ব্যয় করে খুন রাঙা পথের সিঁড়ি বেয়ে যুগ যুগ ধরে যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে তা যেন স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেয়, যাতে রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের চাহিদা মুতাবিক মুসলিম সন্তানদেরকে গড়ে তুলতে পারে।

এমনিতো ধর্মনিরপেক্ষতার গালভরা বুলি আওড়িয়ে বলা হবে, সরকার ইসলামের বিরোধী নয়, ইসলামকে খতম করার কোন ইচ্ছাও সরকারের নেই। সরকার তো এজন্য গর্বিত যে, বিশ্বের সবচাইতে বড় মুসলিম সম্প্রদায়টির বাস ভারতে। তাদের আবাদ থাকা ও উন্নতি-অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়াটা বাঞ্ছনীয়। এদের দ্বারা বড় কাজ নেয়া যেতে পারে এবং আন্তর্জাতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা দলীলরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে। আজ সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হচ্ছে যে, যদি মুসলমানরা ভারত ভূমিতে বসবাস করতে চায় তবে তারা যেন এদেশের জাতীয় জীবনধারার সাথে নিজেদেরকে একাকার করে তোলে, তারা যেন নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়। আজকের দাবী হচ্ছে মুসলমান পরিচয় নিয়ে বসবাস করার ব্যাপারে আমদের কোন আপত্তি নেই, কিন্তু নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র করে রাখার মানসিকতাকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা তো সাময়িক হিস্টিরিয়া রোগীর মতো মাঝে মাঝে কিছু লোকের মন মগজে চেপে বসে, এ দাঙ্গা-হাঙ্গামার মানসিকতা অল্প সময়ের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে, পূর্বের তুলনায় এখন তা অনেক কমে গেছে *(যদিও আহমেদাবাদ, মিরাট ও গুজরাটে এই সেদিনও ভারতের হিন্দু মহাসভার পাণ্ডারা সশস্ত্র পুলিশের সহযোগিতায় হাযার হাযার নারীপুরুষ, শিশু-কিশোরকে নির্বিবাদে, নির্বিচারে, নিষ্ঠুর ও পাশবিকভাবে হত্যা করেছে।- অনুবাদক)*।

আমি এ অনুষ্ঠানে আপনাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি– আসল সমস্যা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা নয়, হিন্দুস্তানের মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা, সংকট ও চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, হিন্দুস্তানের মুসলমানদের সুপরিকল্পিত চিন্তা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানসিক দিক থেকে মুরতাদ বানাবার ষড়যন্ত্র, চিন্তা ও মননশীলতায় মুরতাদ বানানোর চক্রান্ত, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার ক্ষেত্রে মুরতাদে পরিণত করার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা। এ সত্যকে উপলব্ধি করতে খুব চিন্তা-গবেষণা, বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন নেই। দেওয়ালের লেখা থেকেই যেকোন সাধারণ লোক এ সত্য উপলব্ধি করতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা যাদের ঈমানের অন্তর্দৃষ্টি দান করেছেন তারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন যে, আজকে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পালা শুরু হয়েছে, আগামীকাল দারুল উলুম দেওবন্দ ও দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার পালা আসছে। সময়ের দাবী হচ্ছে আজ আমরা আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের সংরক্ষণের জন্য কতটা দায়িত্ব সচেতনতা ও বলিষ্ঠতার পরিচয় দিতে পারি। তার উপর দারুল উলুম দেওবন্দ ও দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামা লাখনৌর ভবিষ্যত নির্ভর করছে *(বর্তমানে বাবরী মসজিদের ব্যাপারে ও মুসলিম পার্সোনাল ল' ও পারিবারিক আইনের ক্ষেত্র ভারতীয় মুসলমানদের জাগ্রত চেতনা, দায়িত্ব সচেতনতা ও বলিষ্ঠ মানসিকতার উপর হিন্দুস্তানের মুসলমানদের ভবিষ্যত নির্ভর করছে- অনুবাদক)*।

বিদ'আত ও শরী'আত বিরোধীদের সাথে আপনাদের অতীতের বুযুর্গদের আচরণ ও দায়িত্ব সচেতনতা

স্নেহাস্পদ ছাত্রবৃন্দ!

আপনারা যে চিন্তাধারার আলিমকুলের সাথে জড়িত, আপনাদের এ কথা জানা আছে ভালভাবেই যে, আপনাদের অতীতের বুযুর্গরা বিদ'আতের সাথে বিন্দুমাত্র সমঝোতা বা আপস করতে রাযী হননি। আপনাদের বুযুর্গরা মিলাদ-কিয়ামকে কোথাও সমর্থন করেননি। এমন অনেক কুসংস্কার ও প্রথা মুসলিম সমাজে প্রচলিত রয়েছে, যাকে ধর্মীয় কর্তব্য ও দ্বীনি ঐতিহ্য বলে আমল করা হচ্ছে, কিন্তু আপনারা যে চিন্তাধারা (school of thought) ও মাসলাকের অনুসারী সে আলিমগণ সর্বদাই এসব বিদ'আত, কুসংস্কার ও শরী'আত বিরোধী প্রথা ও ক্রিয়াকাণ্ডের তীব্র বিরোধিতা করে এসেছেন, এগুলোকে ভিত্তিহীন ও বিদ'আত বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

এ বিদ'আত ও শরী'আত বিরোধী প্রথা ও কুসংস্কার-এর বিরোধিতার বিষয়ে মূল্য তাদেরকে দিতে হয়েছে। তাদের জীবন সংকটাপন্ন হয়েছে, তাদেরকে বিদ'আতপন্থীরা সামাজিকভাবে বয়কট করেছে। তাদেরকে মসজিদ থেকে বলপূর্বক বের করে দেয়া হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কুফর ও গোমরাহীর অপবাদ দেয়া হয়েছে। তাঁদেরকে সামাজিক জীবনের বহু সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এতসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তাঁরা বিদ'আতের প্রতি বিন্দুমাত্র নমনীয়তা প্রদর্শন করতে রাযী হননি ও কোন প্রকার আপসকামিতা বা দুর্বলতা প্রদর্শন করেন নি।

আপনারা এও জানেন আমি নিজেও ঐ শিবিরের সাথেই সংশ্লিষ্ট, যারা শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে কঠোর ভূমিকা পালন করেন, হাতের মুঠোয় জীবন নিয়ে বিদ'আতের বিরোধিতা করেন। বরং রক্তের দিকে আমি সে খান্দানেরই অন্তর্ভুক্ত যারা এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন এবং শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন জাগ্রত চেতনার অধিকারী ছিলেন। আমার বংশ ও মানসিকতার সম্পর্ক হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রঃ)-এর সাথে রয়েছে, যারা সমগ্র উপমহাদেশে তাওহীদী আদর্শ ও সুন্নাতে রাসূলকে পুনর্জীবিত করার পতাকা উত্তোলন করেছিলেন এবং জীবনের বিনিময়ে ইসলামের পুনর্জাগরণের ও সুন্নাতের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করে গেছেন। যদি কিছু মনে না করেন, তবে আমি আরও অগ্রসর হয়ে বলতে চাই, যে আপনাদের শিবিরেও সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রঃ), ইসমাঈল শহীদ (রঃ)-এর আন্দোলনের প্রভাবই প্রতিফলিত হয়েছে। এজন্য আমি ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে গর্ববোধ করে থাকি এবং তা চোখে, মুখে ও বক্ষে ধারণ করে রাখাকে মর্যাদা ও গৌরবের বলে মনে করি। আমি নিজেকে এ ঐতিহ্যের অধিকারীর দাবীদার বলে প্রকাশ করতে কোন প্রকার লজ্জা ও হীনমন্যতাবোধ করি না, আর এ থেকে হাত গুটিয়েও নিতে চাই না। আমার সমস্ত চিন্তা, গবেষণা, গ্রন্থ ও প্রকাশনা, আমার ক্ষুদ্রতম শ্রম ও চেষ্টা এ ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের সংরক্ষণ ও প্রতিরক্ষার জন্য নিবেদিত রয়েছে। এরই প্রচার, প্রসার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আমি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছি।

میں کہ مری نوا میں ہے آتش رفتہ کا سراغ
میری تمام سر گزشت کھوئے ہوؤں کی جستجو

'আমার বিলাপ ধ্বনিতে খুঁজে পাবে তুমি
অতীতের অগ্নিঝরা পথের দিশা,
আমার গোটা কাহিনীই হচ্ছে বিস্মিতদের অনুসন্ধান।"

আমার এ অপরিপক্ক হাতে ইতিপূর্বে 'দাওয়াত ও আযীমত' গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছি *(গ্রন্থটি অধ্যাপক আবূ সাঈদ ওমর আলী কর্তৃক অনূদিত হয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে–অনুবাদক)*।

কয়েক হাযার পৃষ্ঠা সম্বলিত উল্লিখিত গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে আপনাদের মুহাসিবা বা পর্যালোচনা করার অধিকারও আমার রয়েছে। আপনারা অতীতের এই বুযুর্গদের পদাংক অনুসারী হওয়ার দাবীদার, যারা দ্বীনের মধ্যে সামান্যতম বিকৃতি ও পরিবর্তনকে বরদাশ্‌ত করেন নি।

আজ বিদ'আত ও পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থাই কেবল সমস্যা নয়, আজকের সমস্যা অগণিত, অন্তহীন। আজকে সমস্যা প্রকাশ্য শিরক, মূর্তিপূজা, কবর পূজা, বৈদান্তিক দর্শন, ব্রাহ্মণ্যবাদী সভ্যতা, হিন্দুদের মিশ্রিত সমাজদর্শন ও সংস্কৃতির অনুসরণ ও গ্রহণের সমস্যা। অপরদিকে ভারতের মুসলমানদের কাছে কম্যুনিজম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ তথা ধর্মহীনতাকে গ্রহণ ও বর্জনের মৌলিক সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আজকে প্রশ্ন হচ্ছে, এমন এক জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ ও বর্জন করার, যে জাতীয়তাবাদ শুধু সে ভূ-খণ্ডের সাথে সংমিশ্রণের মাঝেই সীমিত, যে ভূ-খণ্ডে আমাদের জৈবিক জন্ম। আজকে ভূখণ্ডভিত্তিক এ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে আমরা বেঁচে থাকবো না মৃত্যুবরণ করবো, এ জটিল সমস্যার আবির্ভাব ঘটেছে। আজকের সংকট ও সমস্যা অতীতের সকল সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের চেয়েও ভয়ংকর। আর এ সমস্যা ও সংকট উত্তরণের জন্য ভারতে অবস্থানকারী মুসলিম উম্মাহকে সর্বাধিক মজবুত ঈমান, দৃঢ়তা, সাহসিকতা, স্থিরতা, ত্যাগ ও কুরবানী প্রদর্শনের তীব্র প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

বর্তমান বিপ্লবের বিদ্যুৎগতি

অতীতের সমাজ বিপ্লব ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে আগমন করতো, যুগ যেমন ছিল বিপ্লবও তেমনি ছিল। আগেকার বিপ্লব ছিল হস্তিগতি, উষ্ট্রগতি, গরুর গাড়ির গতিসম্পন্ন; খুব বেশী হলে দ্রুতগামী অশ্বের গতিতে বিপ্লব সাধিত হতো। রেলগাড়ি আবিষ্কারের পর বিপ্লব রেলের গতিতে সম্পন্ন হতে লাগল। বিমান যান আবিষ্কারের পর বিপ্লব বিমানের গতি লাভ করল। বর্তমান প্রযুক্তি বিজ্ঞানে উৎকর্ষতার সাথে রেডিও, টেলিভিশন, আণবিক শক্তি, রকেট, কম্পিউটার আবিষ্কারের সাথে বিপ্লবের গতি ইথার, আণবিক শক্তি ও রকেটের গতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আজকে যেকোন ঘটনা-দুর্ঘটনা ও বিপ্লবের সংবাদ ও প্রভাব এক মুহূর্তের মধ্যে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে প্রভাব, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

গণতন্ত্র এবং রাষ্ট্রের পরিধি ও কর্মসীমা

আজ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার যুগ, সংসদীয় গণতন্ত্রের যুগ। জাতীয় পরিষদের প্রয়োজনীয় আইন গ্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্রের কর্মসীমা শুধু প্রতিরক্ষা, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও কর আদায় করার মধ্যেই সীমিত নয়, রাষ্ট্র এখন শিক্ষা ও সংস্কৃতিসহ জীবনের সকল দিককেই নিয়ন্ত্রণ করে। রাতে সংসদের অধিবেশনে আইন পাস হয়ে পরে ঘরে-বাইরের কোন কিছুই আজ রাষ্ট্রের এখতিয়ারের বাইরে নেই। দিনেই গোটা দেশে তা কার্যকর করা হয়। বিচিত্র নয় আজকে আমরা এ শিক্ষাঙ্গনে বসে আলোচনায় রত রয়েছি, আর অপরদিকে পার্লামেন্টের অধিবেশন চলছে, সেখানে হয়তো কোন আইন পাস হয়ে যাচ্ছে আর আগামীকাল তা গোটা দেশে কার্যকর হয়ে আমাদের জীবনে অকল্পনীয় ও অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন আনবে। আপনারা অবগত আছেন যে, আগেকার দিনে মানুষের ব্যক্তিজীবনের গণ্ডিতে হস্তক্ষেপ করতো না, ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি সম্পদের ব্যাপারে মাথা ঘামাতো না, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন ছিল; পার্সোনাল 'ল', বিবাহ-শাদী, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, উত্তরাধিকার আইন সকলে নিজস্ব ধর্মমত ও বিশ্বাস অনুসারে প্রতিপালন করতো। রাষ্ট্র এ সকল ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতো না, শিক্ষাক্ষেত্রে সবাই নিজ বিশ্বাস ও সভ্যতা সংস্কৃতির বুনিয়াদে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতো। রাষ্ট্র কোন বিশেষ আকীদা-বিশ্বাস বা চিন্তাধারা গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করতো না, আজ পৃথিবী বদলে গেছে। আপনাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে যে, আপনাদেরকে কোন স্থানে এনে দাঁড় করিয়েছে? আপনারা তো এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চার দেওয়ালের অভ্যন্তরে সীমিত পরিবেশে অত্যন্ত খুশী ও আনন্দের সাথে অবস্থান করছেন। চতুর্দিকে জ্যোতির্ময় চেহারা নজরে পড়ছে। আল-কুরআন ও হাদীছের বাণীর গুঞ্জরণ ছাড়া আপনাদের কর্ণকুহরে অপর কোন ধ্বনি প্রবেশ করছে না। দারুত তাফসীর ও দারুল হাদীছে ও মসজিদের পবিত্রতম রূহানী পরিবেশ আপনাদের আত্মাকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করে তুলেছে। দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্রের এক মন-মাতানো, মোহনীয় সুন্দরতম পরিবেশে আপনারা দিনযাপন করছেন। কিন্তু কাল আপনারা যখন এ পরিবেশ হতে বাইরে যাবেন, শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর আপনারা যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করবেন, বিভিন্ন ছুটির সময় আপনারা যখন নিজ নিজ এলাকায় নিজ নিজ শহরে ও গ্রামে যাবেন, তখন সম্পূর্ণ ভিন্নতর পরিবেশ পরিস্থিতি আপনাদের নযরে পড়বে। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি না আগামী ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার আগে দেশের অভ্যন্তরে কি ধরনের পরিবর্তন সূচিত হবে?

আপনারা যদি আপনাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিবেশ হতে দূরে অবস্থান করেন, পরিবেশ ও পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন না করেন, তবে নিজের ঘরেই পরবাসী হয়ে থাকতে হবে। আপনাদের অবস্থা হবে 'আপনি ঘরমে বেগানা?'

অভ্যন্তরীণ সংকট

অমুসলিম শাসকগণ যদি মুসলমানদের ব্যাপারে অস্পষ্ট ও ইংগিতে কোন কথা বলতে চান, তখন মুসলিম নামধারী ঘরের শত্রু বিভীষণরা উচ্চৈস্বরে প্রকাশ্যভাবে বলতে শুরু করেন, মুসলমানদের ভারতে বসবাস করতে হলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির (হিন্দু আচরণ ও সংস্কৃতির) মধ্যে তাদেরকে বিলীন হয়ে যেতে হবে। এমনকি তারা আরো অগ্রসর হয়ে নগ্নভাবে দালালি করে বলা শুরু করেছে যে, মুসলমানদেরকে আলাদা স্বাতন্ত্র্য ও সংহতির কথা ভুলে গিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে মিশে যেতে হবে। এর মধ্যেই তাদের কল্যাণ নিহিত। মুসলমানদের স্বতন্ত্র তাহযীব ও তামাদ্দুনের কথা বেমালুম ভুলে যেতে হবে। এমনকি চীন ও স্পেনের মুসলমানদের মতো ভারতীয় মুসলমানদের তাদের আরবী ও ইসলামী নাম রাখার প্রচলনকেও

Contents

বিলীন করে দিয়ে ভারতীয় ভাষায় নিজেদের নাম রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। তারা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা দেয় মুসলমানদেরকে ভারতে বসবাস করতে করতে হলে এমন সব আচরণ ও ব্যবহার পরিহার করতে হবে যাতে করে 'আমি-তুমি, আমরা-তোমরা'-এর ব্যবধান বিদ্যমান থাকে। এখানে মসজিদ, মন্দির ও গীর্জার মধ্যে পার্থক্যকারী কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না। বর্তমান ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ভাষা ও আচরণে এ দৃষ্টিভঙ্গিই পরিস্ফুট যে তারা ভারতীয় মুসলমানদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, মূল্যবোধ ও পার্থক্য চিরতরে মুছে ফেলার পক্ষপাতী।

আমাদের জীবনধারা সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট ও ইসলামের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্টমণ্ডিত

আমাদের জীবন দর্শনে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা আগে থেকেই সুনির্ধারিত রয়েছে, একটি পরিপূর্ণ জীবন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের কারণে 'সর্বজাতিগ্রাসী' এ ভূখণ্ডে আমাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য, আদর্শ ও ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করার মধ্যেই আমাদের কল্যাণ ও মর্যাদা নিহিত। আমাদের সুনির্ধারিত, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুস্পষ্ট জীবনধারার আলাদা বৈশিষ্ট্যসহ টিকে থাকার রহস্যও এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে। আমরা ভারতের আর্য, অনার্য, দ্রাবিড় ও আদি ভারতীয়দের মিশ্রিত জাতিসত্তার মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে পারিনা।

ইসলাম তো তার সূচনালগ্ন থেকেই ঈমান ও কুফর, তাওহীদ, শিরক, হালাল-হারাম, হেদায়েত ও গোমরাহীর মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্ধারিত করে রেখেছে। আল্লাহ বলেন, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا 'যে তাগুতী শক্তির অবাধ্যতা প্রকাশ করে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছে; সে নিশ্চয়ই এমন মজবুত রজ্জু ধারণ করেছে যা কখনও টুটে যাবার মতো নয়' *(বাকারা ২৫৬)* ।

সর্বধর্মীয় ঐক্য নয়, সত্যের ঐক্য

ইসলাম সর্ব ধর্মের মিশ্রণের ঐক্যে নয়, সত্যের সুমহান একত্বের আদর্শে বিশ্বাসী, অব্যক্ত সর্বধর্ম এক নয়। সত্য এক ও অভিন্ন। ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দেয়, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ 'সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর গোমরাহী ছাড়া আর কি অবশিষ্ট থাকে? তারপরও (তোমরা সত্যকে পরিহার করে) তোমরা কোন পথে ধাবিত হচ্ছো?' *(ইউনুস ৩২)*। ইসলামের নিজস্ব স্বতন্ত্র আক্বীদা বিশ্বাস রয়েছে, এর নিজস্ব তামাদ্দুন ও সভ্যতা রয়েছে, এর স্বতন্ত্র আইন, সমাজ দর্শন ও সমাজ ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। ইসলামের মূলগ্রন্থ (মূল উৎস) পবিত্র কুরআনে পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা দেয়া হয়েছে,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

'আজ (আরাফাতের ময়দানে) আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে (ইসলামকে) পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং একমাত্র ইসলামকে আমার মনোনীত দ্বীন হিসাবে নির্ধারিত করে দিলাম' *(মায়িদা ৩)*।

সংস্কার ও সংশোধনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মর্যাদা ও কর্ম

আমার প্রিয়ভাজনেরা!

ব্যক্তির মহৎ আকাঙ্খা ও মহৎ চেতনা ইসলামের পুনর্জাগরণ ও সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে ভরপুর। এটা জাতীয় ও সামাজিক ইতিহাস। কিন্তু এর প্রকৃত মূল্যায়ন করতে গেলে দেখা যাবে, প্রকৃতপক্ষে শুধু ব্যক্তির মহৎ চেতনা ও আকাঙ্খা, দুর্বার সাহসিকতা, অতুলনীয় প্রজ্ঞা, অসাধারণ যোগ্যতা ও দূরদর্শিতাই এ কাজের সবচেয়ে ক্রিয়াশীল শক্তি। ইসলামের জীবন-মরণের প্রশ্ন যখনই দেখা দিয়েছে, যখন কোন বাতিল শক্তি ইসলামের সম্মুখে চ্যালেঞ্জ আকারে দেখা দিয়েছে, তখনই আল্লাহ্র ফযল ও করমে উল্লিখিত গুণাবলী সম্পন্ন কোন মর্দে কামিলের আবির্ভাব ঘটেছে। কোন দৃঢ়চেতা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব অসাধারণ ধী-শক্তি ও প্রজ্ঞা সম্পন্ন গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী আদর্শ চরিত্র সম্পন্ন দৃঢ় উদ্যম ও প্রত্যয়শীল মহান ব্যক্তিত্ব জন্মলাভ করেছেন এবং ইসলামের পুনর্জাগরণ ও সংস্কারের পতাকা উত্তোলিত করে নবোদ্ভূত বাতিল পরিস্থিতি পাল্টে দিয়েছেন। এজন্যে কোন কাউন্সিল বা পরামর্শ সভা বসেনি। উমর বিন আব্দুল আযীয (রঃ), হাসান বসরী (রঃ) থেকে শুরু করে শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুদাদ্দিছ দেহলভী (রঃ) ও তাঁর খানদানের অপরাপর মহান ব্যক্তিগণ, এমন কি বর্তমান সময় পর্যন্ত দ্বীনের দাঈদের ব্যাপারে একথা একইভাবে সত্য–

کار زلف تست مشك افشاني اما عاشقان
مصلحت را تہمتے بر أهوئے چین بسته اند
তোমারই কৃষ্ণকেশদাম বিতরণ করে সুরভি,
প্রেমিকরা অযথাই এজন্যে চীনের মৃগকে
কৃতিত্ব দিয়ে থাকে।

মুজাদ্দিদে আলফেছানী, সাইয়েদ আহমাদ সিরহিন্দী (রঃ), শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রঃ)-এর অবদান

মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রঃ) প্রসংগে প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল (রঃ) যথার্থই বলেছেন–

وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان
اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار
'তিনিই তো ছিলেন উপমহাদেশে মিল্লাতে ইসলামিয়ার সম্পদের
সত্যিকার রক্ষক।
আল্লাহ্ পাক যাকে সময়মতো করে দিয়েছিলেন সতর্ক।'

তাঁরই মহান খেদমতের বদৌলতে উপমহাদেশে মুসলিম মিল্লাতের সম্পর্ক মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আরবের প্রতিষ্ঠিত হিজাযী দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েনি, উপমহাদেশের ইসলামী জীবনধারা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বৈদান্তিক দর্শনের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণের পরিবর্তে শরী'আতে মুহাম্মাদী বক্ষে আমানত থাকার সুযোগ লাভ করে। তাঁরই গোপন হাতের ইংগিতে দ্বীনের বক্ষে কুঠারাঘাত বর্ষণকারী আকবরের সিংহাসনে মহীউদ্দীন আলমগীর আওরঙ্গজেবের মত ফিক্হ শাস্ত্রবিদ ইসলামী আদর্শের দৃঢ় প্রত্যয়শীল ইসলামী চেতনা সম্পন্ন মর্দে মুমিন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফতওয়া আলমগীরীর অমর গ্রন্থ রচনা ইসলামী আইনবিদগণকে চিরন্তনতা দান করেন। তারপর এ উপমহাদেশে দ্বীনের সংস্কার ও পুনর্জাগরণের সবচেয়ে মূল্যবান ও উল্লখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রঃ)। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ) এবং তাঁর খান্দানের খেদমতের ফলশ্রুতিই দেওবন্দ, সাহরানপুর, দিল্লী ও লাখনৌতে ইসলামের খুশবু ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁদের প্রস্তুতকৃত দস্তরখানের নেয়ামত গ্রহণ করেই সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে দ্বীনের বিকাশ ও পরিপুষ্টি সাধিত হয়েছে। আমরা সবাই তাঁদের প্রস্তুতকৃত ও পরিবেশিত দস্তরখানের নেয়ামত থেকেই ফায়দা হাসিল করেছি। দারুল উলূম দেওবন্দ ও দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা, মাযাহারুল উলুমসহ অন্যান্য মাদরাসাগুলো তাঁদের প্রতিষ্ঠিত ঝর্ণাধারারই ফলশ্রুতি *(আহলেহাদীছদের প্রতিষ্ঠিত বানারস,*

দারভাংগা, মৌকা প্রভৃতি স্থানের মাদরাসাসমূহও তাঁদের প্রজ্বলিত প্রদীপ থেকে আলো সংগ্রহ করেছে-অনুবাদক)।

ইতিহাসের কঠিন মুহূর্ত

আমি ইতিহাসের ছাত্র। ইতিহাস আমার খুব প্রিয় ও পসন্দনীয় বিষয়। উপমহাদেশের ইতিহাস আমি যতটুকু গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি, তার আলোকে বলতে পারি যে, হিন্দুস্থানের হাযার বছরের ইতিহাসে বর্তমানের চেয়ে কঠিন মুহূর্ত কখনো আসেনি, এজন্য বর্তমান যুগে অবস্থার পরিবর্তন সাধন, মন ও মগজকে আকৃষ্ট করার বিভিন্ন ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ ও মুকাবিলা, ভাবপ্রবণতা ও আবেগ দর্শন, মূল্যবোধের পরিবর্তন সাধন, চিন্তাধারার বিবর্তনের জন্য এতসব উপাদান, উপায়-উপকরণ রয়েছে যা অতীতে কখনো পরিদৃষ্ট হয়নি। আগের কালের লোকদের কাছে কি উপায় উপকরণই বা ছিল? রাজনীতির এ শিন্নী ও চাটনী ছিল কি?

গণতন্ত্র ও সাম্যবাদের শ্লোগান ছিল? প্রেস, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনের ছড়াছড়ি ছিল? আজকের একাডেমী, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহ ছিল? সভা-সমিতি, মিছিল-শোভাযাত্রা সম্বলিত এমন প্রচারণা পদ্ধতি ছিল?

এ যুগের আবুল ফযল ও ফৈযী

অতীতকালের সবচেয়ে বড় ফিতনা বাদশাহ আকবরের দ্বীনে ইলাহীকে বলা হয়ে থাকে; কিন্তু সেকালে কি আজকের যুগের মত শাসকগোষ্ঠীর হাতে এত বিপুল পরিমাণ শিক্ষায়তন ছিল, লাখ লাখ সংখ্যায় প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকাদি ছিল? আধুনিক যুগে আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক উপায়-উপকরণ, প্রচারযন্ত্র, রেডিও-টেলিভিশন সম্প্রচার কেন্দ্র ছিল, যা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পূর্বের কথা পশ্চিমে পৌঁছিয়ে দেয়?

এটা সত্যি যে, আকবরের কাছে আবুল ফযল ও ফৈযীর মত মেধা ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোক বর্তমান ছিল। আমি আবুল ফযল ও ফৈযীর যোগ্যতাকে শুধু স্বীকারই করি না, বরং তাদের বিস্ময়কর মেধা ও যোগ্যতা দর্শনে অভিভূত হয়ে পড়ি, কিন্তু আজ আবুল ফযল ও ফৈযীরা সংখ্যায় কত? সে যুগে তারা একাকী ছিল। বর্তমান যুগে আবুল ফযল ও ফৈযীদের প্রতিষ্ঠান কায়েম রয়েছে, সে যুগের আবুল ফযল ও ফৈযীদের মধ্যে মাঝে মাঝে ধর্মীয় চেতনা মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠতো, যা ফৈযীর কলম হতে 'সাওয়াতিউল ইলহাম' নামক প্রসিদ্ধ নুকতাযুক্ত হরকতমুক্ত তাফসীর গ্রন্থের মত অতুলনীয় গ্রন্থাকারে রচিত হয়েছে। কিন্তু আজকের আবুল ফযল ও ফৈযীদের সে ইসলামী চেতনা ও অনুভূতিটুকুও অবশিষ্ট নেই। তাদের মধ্যে সে ইসলামী আবেগ ও সম্পর্ক নেই, যা তদানীন্তন যুগের প্রগতিবাদী ও আধুনিকতাবাদীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

নাস্তিকতাবাদ ও সংশয়বাদের নতুন নতুন দ্বার

বন্ধুগণ! বর্তমান যুগের দর্শন শাস্ত্র ও ইলমে কালাম শক্তিহীন। আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যেও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মানুষকে নাস্তিক্যবাদের দিকে অনুপ্রাণিত ও আকৃষ্ট করে তোলার মত সে প্রভাব ও শক্তি অবশিষ্ট নেই। এ ব্যাপারে বিজ্ঞানের আজ কোন আগ্রহও নেই। বর্তমান দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের চিন্তার বিবর্তনের ফলে ধর্মীয় চেতনা, পরকালের প্রত্যয়, অদৃশ্য সার্বভৌম শক্তির প্রতি বিশ্বাসের প্রেরণা ও চেতনা যুক্তি প্রমাণসহ আজ বিজ্ঞান দর্শন দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে। আজকের বিজ্ঞান ও দর্শন নাস্তিক্যবাদ ও সন্দেহবাদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত না হয়ে একত্ববাদ ও প্রত্যয়বাদের স্বপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ ও প্রেরণা সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞান ও দর্শন ঊনবিংশ শতাব্দীর মতো আর ধর্ম বিশ্বাসী পণ্ডিতদের অস্থিরতা উদ্বেগের কারণ নয়। কিন্তু তার পরিবর্তে রাজনৈতিক দর্শন, অর্থনৈতিক চিন্তাধারা, ইতিহাস, সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, ইউরোপীয় জড়বাদী সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে আজ নাস্তিকতা ও সন্দেহবাদ সৃষ্টির কাজ নেয়া হচ্ছে। সমাজতত্ত্ব ও ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে বর্তমানে নাস্তিকতাবাদ ও সংশয়বাদ ছড়ানো হচ্ছে।

আপনাদের কাছে এটা হয়তো চরম বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে যে, বর্তমানে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও উর্দূ সাহিত্য বিভাগও নাস্তিক্যবাদ ও সংশয়বাদের প্রচারণার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। সম্ভবত কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিয়াতের ফ্যাকাল্টিই ধর্মীয় চেতনা ও অনুভূতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে দুর্বল ফ্যাকাল্টি।

বাস্তবধর্মী পর্যালোচনা ও ব্যাপক প্রস্তুতি

আমাদেরকে পরিস্থিতি সম্পর্কে উদার দৃষ্টিভংগী, উদার মন, বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা সহকারে অনুধাবন করতে হবে। আমাদেরকে ভালভাবে দেখতে হবে, জীবনের বিশাল কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্বে ইসলামী দাওয়া ও ইসলামী শরী'আর হেফাযতে মহান দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য কতটা প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। আমাদের নিজেদেরকে কতটা আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করতে হবে। আধুনিক রণকৌশল কতটা রপ্ত করতে হবে ও কতটা দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

মহান কুদরতের ইচ্ছায়ই আপনারা এ যুগে জন্মলাভ করেছেন, তাকদীরে ইলাহী এ যুগের জন্য আপনাদেরকে নির্বাচিত করেছেন। আপনাদেরকে সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করতে হবে আপনারা কোন যুগের জন্য সৃষ্ট? এটি এক কথায় চিন্তা, গৌরব, সহমর্মিতা, সংবেদনশীলতা ও মুবারকবাদের বিষয়। মুবারকবাদ এই জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের এ চরম উৎকর্ষতার যুগে আপনাদেরকে যোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন এবং এতবড় মহান দায়িত্ব আপনাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে। আপনারা এ দায়িত্ব গ্রহণ করুন। যুগের এ সংকট ও সময়ের মারাত্মক অবস্থাকে অনুধাবন করে আল্লাহর দরবারে যোগ্যতা ও তাওফীক কামনা করে দু'আ করুন, যেমনভাবে আপনাদের অতীতের বুযুর্গরা বিদ'আতের, দ্বীনের বিকৃতিকরণ ও যুগের ফিতনার মুকাবিলা করেছেন, বিপর্যয় ও গোমরাহী থেকে জাতিকে রক্ষা করেছেন, আপনারা যেন তেমনিভাবে যুগের বিদ'আত, বিকৃতি, ফিতনা ও গোমরাহীকে স্বার্থকভাবে প্রতিহত করতে পারেন।

ধর্মের পাশ্চাত্য ধারণা ও তার ফিতনা

আপনারা পাশ্চাত্যের এ চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করুন, ধর্মের ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণা যা ধর্মকে শক্তিহীন ও প্রভাবহীন রেখে বাস্তব জীবনে ধর্মের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করে রেখেছে, ধর্মদ্রোহী জড়বাদী ইউরোপীয় স্বীকৃত ধর্মদর্শন হচ্ছে এই যে, ধর্ম হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার যা সর্বপ্রকার স্বাধীন শিক্ষাব্যবস্থা, প্রগতিশীল ধ্যানধারণা ও সার্বজনীন সভ্যতা ও দর্শনের পরিপন্থী। ভেবে দেখুন, এরপর হিন্দুস্থানের মুসলমানদের অবস্থা কি দাঁড়াবে?

আলামা ইকবাল অর্ধ শতাব্দী পূর্বেই তার চিত্রায়ণ করেছেন এভাবে ঃ

ملا کو جب ملکئ هند هیں سجده كي اجازت
نادان یه سمجهتا هے که إسلام هے آزاد

মোল্লা যখন ভারতে কেবল ছালাত আদায়ের অনুমতি পেল,
বেকুফ তাকেই মনে করল এই তো পেয়ে গেছি
পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা।

চিন্তা ও চরিত্র গঠন

এ সংঘাতমুখর পরিস্থিতির মুকাবিলার জন্য আপনাদেরকে অবশ্যই পূর্ণ মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে, তা হবে জন্মগত, চরিত্রগত ও আধ্যাত্মিকভাবে।

একদিকে আধুনিক ফিতনা ও দর্শনসমূহের বিবর্তন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। কেননা প্রতিপক্ষ সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি ও তার সঠিক পরিচয় জানা, তার রণকৌশল ও পদক্ষেপ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা শত্রু মুকাবিলার উপযুক্ত পূর্ব শর্তস্বরূপ। অপরদিকে নিজস্ব আদর্শের প্রতি দৃঢ়-প্রত্যয়, নিজের শক্তি-সামর্থ্য ও বিজয় সম্পর্কে সুদৃঢ় বিশ্বাস, আত্ম-মর্যাদাবোধ, আত্ম-পরিচিতি, আদর্শের চেতনাবোধ এতটা তীব্র ও প্রখর হতে হবে যে, বাতিলপন্থীদের মনে আপনাদের আক্বীদা-বিশ্বাস বিবেক ক্রয়ের কল্পনাও যেন কোনদিন মনে স্থান না পায়। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা একমুঠো যবের বিনিময়ে বিক্রি ও নিজেদের জ্ঞান, যোগ্যতা ও কলা-কৌশল নিলামে চড়াবার চরিত্র সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আমাদের ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা নিছক জড়বাদী বিকৃত দর্শনে বিশ্বাসী নয়।

আমাদের শিক্ষা দর্শনের বৈশিষ্ট্য কবির ভাষায় প্রতিফলিত হয়েছে এভাবে–

هر دو عالم قيمت خود گفته
نرخ بالا كن كه ارزاني هنوز
'হে যুগ! তুমি যত চড়া দামই দিতে চাও না কেন
দু'জাহানের বিনিময়েও তুমি পাবে না আমাদেরকে খরিদ করতে।'

আধুনিককালে বিবেক বিক্রেতাদের ভীড়

এ যুগটা হচ্ছে বিবেক বিক্রি ও ঈমান বিক্রির যুগ। অনেক বড় বড় গণ্ডিত, চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক যাদের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের তুলনায় আমরা হিসাবেরও যোগ্য নই; কিন্তু অত্যন্ত আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে, বিবেক বলতে কোন কিছুর অস্তিত্বের সন্ধানও তাদের কাছে পাওয়া যায় না; তাঁদের মস্তিষ্কের স্থানে মস্তিষ্ক আছে আবার অন্তরের স্থানেও মস্তিষ্ক সংযোজিত হয়ে আছে বরং তাদের বক্ষদেশে স্পন্দিত হৃদয়ের পরিবর্তে একটা বলিষ্ঠ কলম রক্ষিত আছে, যা দিয়ে তারা স্বার্থের বিনিময়ে যা ইচ্ছে তাই লিখে দিতে পারেন। এ লেখার সময় তাঁদের অন্তরে আখেরাতের জবাবদিহিতার, বিবেকের দংশন বা অনুশোচনার কোন প্রশ্নই উঠে না। যুগের তালে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত যুগের দাবী মোতাবেক নিজেদেরকে চিনে নিতে তাদের কোন আপত্তি থাকে না। যুগের তালে তাল মিলিয়ে চলার এবং তার ভাষ্যকার সাজার সীমাহীন যোগ্যতা তাদের রয়েছে।

নতুন নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা

আপনারা এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষকতার যোগ্যতা নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন, আল্লাহ তা'আলা এতে বরকত দান করুন, আপনারা নামী দামী ওয়ায়েয, খতীবরূপে বরকত লাভে ধন্য হোন। আপনারা খ্যাতিমান লেখক, গ্রন্থকার হয়ে খ্যাতি অর্জন করুন। এ সকল গুণ আমার মধ্যেও রয়েছে। অথচ বর্তমান যুগের প্রত্যাশা ও দাবী হচ্ছে অন্য কিছুর। আজকের যুগের প্রয়োজন এমনি সব মর্দে-মুমিন ও কর্মবীরের, যাঁরা এ যুগকে চেনার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়ে এক নতুন প্রত্যয়, এক নতুন আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তি দান করতে পারে। অন্যথায় ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় তথা গোটা দেশ চরম সংকটের সম্মুখীন হবে। আমাদের পদতলে মাটি ক্রমশ সরে যাচ্ছে। পরিস্থিতি কুরআনুল কারীমের বর্ণিত আয়াতের ভাষায়, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا 'তারা কি দেখতে পাচ্ছে না আমি যমীনকে তার প্রান্তসীমা হতে কিভাবে গুটিয়ে আনছি' *(রা'দ ৪১)*। অন্য আয়াতে এসেছে, ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ 'আর যখন যমীন এত বিশাল হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসলো এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিসহ হয়ে উঠল' *(সূরা তওবা ১১৮)*।

আমরা আজ যে ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্গ গড়ে তুলেছি এবং তুলছি, এটি কোন প্রস্তর নির্মিত স্থান বা সমভূমি নয়, এ হচ্ছে বালুকা রাশির স্তূপ, যে বালুকা ঝড় ও বাতাসের ঝাপটা ক্রমেই উড়িয়ে নিচ্ছে, যা ক্রমশ আমাদের পায়ের নীচ থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। যাকে আল কুরআনের ভাষায় كَثِيبًا مَهِيلًا (ধ্বসে যাওয়ার মতো বালু কণা) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তত্ত্বজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান

প্রিয় বন্ধুগণ!

ইতিহাস আপনাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার আগে, ইতিহাসের নির্মম ও নিষ্ঠুর সত্য আপনাদের চোখ খুলে দেওয়ার আগে নিজেদের চোখ উন্মোচিত করে দেখুন, চারপাশের অবস্থা অবলোকন করুন! দেখুন যুগের বিবর্তন আচমকা আমাদেরকে কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে ? মাওলানা কাসিম নানুতুবী (রঃ), মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুংগেরী (রঃ), মাওলানা শিবলী নু'মানী (রঃ)-এর যুগ আর বর্তমান যুগের অবস্থার পার্থক্য অনুধাবন করুন। আপনারা দৃঢ় আস্থার সাথে নিজেদের মন-মানসিকতা গড়ে তুলুন। শিক্ষকমণ্ডলী এ ব্যাপারে সহযোগিতা দান করুন। আপনারা যখন এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্রতম গণ্ডী থেকে বেরিয়ে জীবনের বৃহত্তম কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবেন তখন যেন কঠিন বাস্তবের সাথে তালমিলিয়ে চলতে পারেন, জীবন যুদ্ধে বাস্তবতার সাথে পাঞ্জা লড়ে চলতে পারেন। আপনাদের এ জামা'আত ছিন্নবস্ত্র পরিহিত দুর্বল দেহের অভ্যন্তরে সুপ্ত সিংহরা লুকিয়ে আছে, আপনাদের মধ্যে এমন সব বিশুদ্ধ আত্মার অধিকারী দ্বীনের দাঈ, নিঃস্বার্থ সংস্কারকরা লুকিয়ে আছে যাঁদের খবর আপনারা ও আপনাদের উস্তাদরাও রাখেন না, আপনাদের বন্ধু বান্ধবরাও জানেন না।

আমি সে সকল সুপ্ত প্রতিভার অধিকারীদেরকে এ দুর্বল শক্তিহীন কণ্ঠে আহ্বান জানাচ্ছি, তাদের হৃদয় দুয়ারের কড়া নাড়ছি– হায় তাদের কর্ণকুহরে ও হৃদয় কন্দরে আমার এ ক্ষীণ কণ্ঠ যদি সাড়া জাগাতো ! সুপ্ত আত্মাগুলো যদি জেগে উঠতো!! আপনারা যদি আপনাদের ঘুমন্ত যোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন হতেন, আল্লামা ইকবাল ঈদের চাঁদকে সম্বোধন করে যা বলেছিলেন, আমি আপনাদেরকে সম্বোধন করে তাই বলছি :

بر خود نظر كشاز تهي دامني مرنج
در سينه تو ماه تمامے نهاده اند
নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ, রিক্ত মনে করোনা শিকার,
বক্ষে তোমার লুকিয়ে আছে পূর্ণিমারই পূর্ণ চাঁদ।

সাক্ষাৎকার

*['বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবে**'র এই স্মৃতিচারণমূলক সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন 'তাওহীদের ডাক'-এর পক্ষ থেকে **মুযাফ্ফর বিন মুহসিন ও নূরুল ইসলাম**]*

উল্লেখ্য যে, গত মার্চ-এপ্রিল সংখ্যায় তাঁর স্টাডি ট্যুরের 'পাকিস্তান' অংশের সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সংখ্যায় তাঁর ভারত সফরের 'দিল্লী' অংশটি প্রকাশিত হ'ল।

আমীরে জামা'আত : ০৩.০১.১৯৮৯ইং সকালের ফ্লাইটে আমি লাহোর থেকে দিল্লী আসি। সম্ভবতঃ আধা ঘণ্টা সময়ও লাগেনি। এক দেশ থেকে আরেক দেশের রাজধানীতে এত স্বল্প সময়ে এসে পড়ব ভাবতে পারিনি। একাকী সফরে এয়ারপোর্টে লাগেজ টানা যে কত বিড়ম্বনা, ভুক্তভোগী মাত্রই তা জানেন। তার ওপর আমার হ'ল বইয়ের বোঝা। বিশাল দিল্লী শহর। অজানা ঠিকানা ৪১১৬ উর্দূ বাজার জামে মসজিদ দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। ট্যাক্সি নিয়ে অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ একাকী মুসাফির। ড্রাইভারকে বুঝতে দেওয়া যাবে না যে, আমি একজন বাঙ্গালী এবং নবাগত। কেননা তাতে সে সুযোগ নিতে পারে। পুঁজি কয়েকটা ডলার ও ক্যামেরা নিয়ে নিলেই আমি শেষ। খাতির জমিয়ে ফেললাম। রাস্তায় দু'পাশে আমার নযর। বেরসিক ভারত সরকারের হুকুমে সাইন বোর্ডগুলো লেখা হয়েছে সব হিন্দী ভাষায়। হিন্দী আমি পড়তে পারি না। আমার নযর উর্দূ ও ইংরেজীর দিকে। মাঝে-মাঝে ভয় হচ্ছে। এত সময় লাগছে কেন? ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলে ভাববে আমি চিনি না। তাই মুখে যতই চোটপাট, ভিতরে ততই ভয়। হঠাৎ নযর পড়ল 'ছদর বাজার রোড'। পরিষ্কার উর্দূ ভাষায় লেখা। হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। অফিসের সামনে গলিপথের দু'পাশে কেবলই বইয়ের দোকান। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা, তা দেখলেই বুঝা যায়। ড্রাইভারকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় করলাম। ঘড়িটা ভারতের টাইমের সাথে মিলিয়ে নিলাম। হিসাব করে দেখলাম লাহোর থেকে দিল্লী আসতে যা সময় লেগেছে, দিল্লী এয়ারপোর্ট থেকে দিল্লী আসতে তার চেয়ে প্রায় চারগুণ বেশী সময় লেগেছে। মোগলদের সময় লাহোর-দিল্লী একই দেশভুক্ত ছিল। কাছাকাছি দু'টি শহর হলেও রাষ্ট্র বিভক্তির কারণে এখন বহু দূর মনে হয়। বইয়ের বোঝা এক দোকানদারের যিম্মায় রেখে আমি ভিতরে চলে গেলাম ও অফিস খুঁজে বের করলাম। অফিস সম্পাদক মাওলানা শিবলী মীরাঠীকে নিজের পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য বললে তিনি খুব খুশী হলেন। সঙ্গে সঙ্গে সহ-সম্পাদক আমানুল্লাহকে আমার সাথে পাঠিয়ে দিলেন। সাথে আরও দু'জন। অতঃপর বইয়ের লাগেজ নিয়ে অফিসে এলাম। আমার থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেল। গোসল-নাশতা সেরে জমঈয়ত অফিসে গেলাম। এটা হ'ল 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'-এর কেন্দ্রীয় অফিস। নাম 'আহলেহাদীছ মনযিল'। পাক্ষিক মুখপত্রের নাম 'তর্জুমান'। সারা দেশ থেকে দৈনিক বহু আহলেহাদীছ আলেম-ওলামা ও সুধীজনেরা এখানে আসেন। এতে আমার থিসিসের তথ্য সংগ্রহের বড় সুযোগ হয়ে গেল। একদিন পেয়ে গেলাম জমঈয়তের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী আব্দুল ওয়াহহাব খালজীকে। তার কাছ থেকে সারা ভারতের আহলেহাদীছদের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী চাইলাম। তিনি পরে ৫.৭.১৯৮৯ইং তারিখে স্বাক্ষরিত পত্রে বিস্তারিত আমার ঠিকানায় রাজশাহী পাঠিয়ে দিলেন। একদিন পেলাম আব্দুল হক সুল্লামীকে। ইনি কেরালার 'সালাফী সমাজকল্যাণ সংস্থা'র সেক্রেটারী। তার কাছে কেরালায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের তথ্যাবলী চাইলাম। তিনি ১৪.৫.১৯৮৯ইং তারিখে স্বাক্ষরিত পত্রে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠিয়ে দিলেন। আহলেহাদীছ মনযিল-এর দোতলায় পূর্বপার্শ্বের একটি কক্ষে হরিয়ানার খ্যাতনামা আলেম হাকীম আজমল খাঁকে পেলাম। উনি ওখানে বসে উর্দূ ভাষায় মাসিক 'মাজাল্লা আহলেহাদীছ' পত্রিকা চালান। আমি আগে থেকেই তার পাঠক। জানতাম না যে, উনি এখানে থাকেন। প্রতিভাবান বর্ষীয়ান আলেম। নীরবে কাজ করে চলেছেন। তাঁর লেখনী গবেষণাধর্মী এবং উচ্চ মানের। জমঈয়ত মুখপত্র 'তর্জুমানে'র চাইতে অনেক উন্নত। দু'জনের সাক্ষাৎকার খুবই ফলপ্রসু হ'ল। অনেক বিষয়ে আমার জানা হ'ল। লাহোরে ইসহাক ভাট্টি এবং এখানে ইনি আমাকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের রাজনৈতিক দিক সম্পর্কে ধারণা অনেকটা স্পষ্ট করে দেন। জামায়াতে ইসলামী ও তাবলীগ জামা'আতের ফিৎনা সম্পর্কে হাকীম খানের জ্ঞান অনেক বেশী।

'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'-এর কেন্দ্রীয় অফিস

জমঈয়ত অফিস থেকে তর্জুমানের সহ-সম্পাদক আমানুল্লাহকে নিয়ে এবার দিল্লী শহরের আহলেহাদীছ মাদরাসা ও মারকাযগুলি পরিদর্শনে বের হলাম। সঙ্গে ডায়েরী, ক্যামেরা ও টেপ রেকর্ডার। উদ্দেশ্য, নেতাদের কাছ থেকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আমার থিসিসের তথ্য-উপাত্ত লেখা ও স্বাক্ষর নেওয়া। আর ব্যস্ত নেতাদের বক্তব্য টেপ করা এবং প্রয়োজনীয় ছবিসমূহ ক্যামেরাবন্দী করা। প্রথমেই গেলাম

ঐতিহাসিক দিল্লী জামে মসজিদে ছালাত আদায় করতে। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে বারবার মনে পড়ছিল সেই ৯ জন আহলেহাদীছের কথা, যারা নিঃসঙ্গ শাহ অলিউল্লাহ দেহলভীকে বাঁচানোর জন্য সিঁড়িতে সারিবদ্ধভাবে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গুণ্ডাদের সামনে বুক পেতে সর্বশক্তি দিয়ে 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি দিয়েছিল। আর তাতেই সন্ত্রাসীদের হাতের তরবারি পড়ে গিয়েছিল। নিঃশব্দ বিস্ময়ে হতবাক গুণ্ডাদের সামনে দিয়ে সেদিন শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী মাত্র এই ক'জন আহলেহাদীছ সাথীকে নিয়ে নিরাপদে বেরিয়ে যান সিঁড়ি বেয়ে। বাকী সব মুছল্লী তাকে ছেড়ে আগেই পালিয়ে গিয়েছিল। তার অপরাধ ছিল একটাই যে, তিনি কুরআনের ফার্সী তরজমা করেছিলেন। বিরোধী আলেমরা ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যে, তিনি কুরআন পরিবর্তন করেছেন। মনে পড়ে গেল সেই দু'শো নিরস্ত্র আহলেহাদীছের কথা। যেদিন ইংরেজ ও শিখেরা মিলে মসজিদটিকে উড়িয়ে দেবার জন্য কামান তাক করেছিল। আর সব মুছল্লী পালিয়ে গেলেও এই দু'শ জন আহলেহাদীছ শুয়ে পড়েছিল মসজিদের সিঁড়িতে, আর কেঁদে কেঁদে বলেছিল, হে আল্লাহ! আমরা দুর্বল আমরা মযলূম। তুমি তোমার মসজিদকে রক্ষা কর। এই মসজিদের সাথেই আমাদের জীবন। মসজিদ শহীদ হয়ে গেলে আমরাও শহীদ হব, কিন্তু তোমার আশ্রয় ছেড়ে আর কোথাও যাব না'। আল্লাহ তাদের দো'আ কবুল করেছিলেন। শত চেষ্টায়ও কামানের গোলা সেদিন ফুটেনি। মনে পড়ে গেল ১৩ বছরের সেই তরুণ বালকটির কথা, এই জামে মসজিদে জামা'আত চলাকালে সরবে 'আমীন' বলার অপরাধে (?) তাকে আলেমরা ধরে নিয়ে যায় বিচারের জন্য ভারতগুরু শাহ ওয়লিউল্লাহ্‌র জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আব্দুল আযীযের কাছে। তিনি আলেমদের ধমক দিয়ে বলেন, তোমরা কি হাদীছ পড়োনি? পরে সবাই জানল, ঐ ছেলেটি আর কেউ নয়, স্বয়ং ভারতগুরুর পৌত্র শাহ ইসমাঈল বিন আব্দুল গণী। মনে পড়ে গেল সেই ঘটনা, যখন এই মসজিদে ছালাত আদায় করতে গিয়ে সরবে 'আমীন' ও রাফ'উল ইয়াদায়েন করে ধরা পড়ে যান আল্লামা ফাখের যায়ের এলাহাবাদী। পরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় শাহ অলিউল্লাহ দেহলভীর কাছে। শাহ ছাহেব ঐসব আলেমদের বুঝিয়ে বিদায় করেন। অতঃপর আল্লামা ফাখের তাঁকে বলেন, অলিউল্লাহ! কতদিন আপনি এভাবে লুকিয়ে থাকবেন? অলিউল্লাহ বললেন, ফাখের! যদি নিজেকে লুকিয়ে না রাখতাম, তাহলে এইসব গুণ্ডা আলেমদের হাত থেকে আজ আপনাকে বাঁচাতো কে?

দিল্লী জামে মসজিদ

হাঁ, ইতিমধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম উপরে মসজিদের মূল আঙ্গিনায়। প্রবেশ করলাম ভিতরে। প্রাণভরে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলাম ও আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করলাম। দো'আ করলাম, হে আল্লাহ! এই মসজিদকে তুমি চিরদিন বাঁচিয়ে রাখো। বের হবার আগে চারপাশ ঘুরে দেখলাম। অতঃপর পূর্ব গেইট দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

এবার গেলাম 'মাদরাসা রহমানিয়া' দেখতে। আমাদের আরবী বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ আফতাব আহমাদ রহমানী, উস্তাদ মাওলানা হাবীবুল্লাহ খান রহমানী, আহমাদুল্লাহ রহমানী, শ্রদ্ধেয় মাওলানা মুন্তাছির আহমাদ রহমানী প্রমুখ আলেমগণ যে মাদরাসা থেকে ফারেগ হয়েছেন, এমনকি এখানে শিক্ষকতাও করেছেন, সেখানে যাওয়ার আগ্রহ আমার সবচেয়ে বেশী। যেয়ে দেখলাম বিল্ডিং আছে। কিন্তু নাম পরিবর্তন হয়েছে 'রিয়াযুল উলূম'। শায়খ আতাউর রহমানরা দুই ভাই মিলে 'মাদরাসা রহমানিয়া' চালাতেন। তাঁদের মৃত্যুর পরে কমিটি পরিবর্তন হয়েছে। ফলে কেবল নামই পরিবর্তন হয়নি, নাম পরিবর্তনের সাথে সাথে সুনামও হারিয়ে গেছে। সে যুগের পরিচ্ছন্ন দিল্লী এ যুগে এক ঘিঞ্জি শহরে পরিণত হয়েছে। তাই গলির মধ্যে মাদরাসার চেহারা দেখে মনটা বিগড়ে গেল। তবুও পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে ঢুকে পড়লাম। শিক্ষক কাউকে পেলাম না। তবে ছাত্রদের সঙ্গে বসলাম ও অনেক কথা জানলাম। এখানে সাতক্ষীরার সোনাবাড়িয়ার আবুল হাসানকে পেলাম। রাজশাহী রাণীবাজার মাদরাসার ছাত্র জামালপুরের হাড়গিলার আবু সাঈদের সাথেও এখানে দেখা হ'ল। তবে সে এখানকার ছাত্র নয়। থাকে অনেক দূরে। সে চমৎকার একটা তথ্য দিল যে, স্যার! দিল্লীতে সব পাগলের বাস। আমার মত একটা পাগলকে এরা বড় হুযূর বলে। চারদিক থেকে লোক আসে আমার কাছ থেকে পানি পড়া ও তাবীয নেবার জন্য। আবার গাড়ীতে করে আমাকে নিয়ে যায়। আর পকেট ভরে টাকা দেয়। বললাম, তোমরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে বুঝিয়ে বললেই তো পার। বলল, স্যার! তাহ'লে দিল্লীর মত শহরে চলব কি করে? মুচকি হেসে বললাম, আল্লাহ সকলের রূযির মালিক। পরে ৮.১.৮৯ইং দিল্লী থেকে বেনারস যাবার দিন ট্রেনে ওঠার সময় কিতাবের ভারি বোঝা ঘাড়ে করে নিয়ে সে আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়েছিল। আল্লাহ তাকে উত্তম জাযা দান করুন! সম্ভবতঃ সে এখন সাভারে একটি মাদরাসায় শিক্ষকতা করে। আর আবুল হাসান বর্তমানে আমাদের দারুলহাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ (বাঁকাল, সাতক্ষীরা)-এর শিক্ষক।

পরদিন ৪.১.১৯৮৯ ইং তারিখে গেলাম মাওলানা আব্দুল হামীদ রহমানী প্রতিষ্ঠিত 'মারকায আবুল কালাম আযাদ' (৪, জোগাবাঈ, নয়াদিল্লী-২৫) দেখতে। এর পাশেই সরকারী জামে'আ মিল্লিয়া অবস্থিত। প্রায়ই বিদেশ সফরে থাকা মানুষটিকে ভাগ্যক্রমে ঐদিন পেয়ে গেলাম। এর আগে ১৯৮৫-তে ঢাকার জমঈয়ত কনফারেন্সে হোটেল শেরাটনে বসে তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপের সুযোগ হয়েছিল। সেই সুবাদে তিনি আমাকে খুব সমাদর করলেন। আমার থিসিসের বিষয়বস্তু শুনে খুবই প্রীত হলেন। অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে একটা কক্ষে আমাকে নিয়ে বসলেন। তাঁর ব্যস্ততা বুঝে বললাম আমি আপনাকে প্রশ্ন করি। আপনি জবাব দিন। সেগুলি আমি টেপ করে নিই। তাতে উনি খুব খুশী হলেন। অতঃপর তাঁর বক্তব্য রেকর্ড করে নিলাম। পরে ওনার প্রতিষ্ঠান সব ঘুরে ঘুরে দেখালেন। মাসিক 'আত-তাওঈয়াহ' পত্রিকা দিলেন এবং আমার নামে ফ্রি জারি করে দিলেন। পরে গ্রাহক সংগ্রহের জন্য ওনার একজন প্রতিনিধি ইয়ার মুহাম্মাদ বাংলাদেশে আসেন এবং আমার সাথে সাতক্ষীরা সফর করেন। ১৯৯৩ সালের ২৭-৩১ শে আগস্টে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত ১ম এশীয় ইসলামিক কনফারেন্স থেকে আমরা একই ফ্লাইটে দিল্লী ফিরি এবং তাঁর বাড়ীতে মেহমান হিসাবে থাকি। অতঃপর একই দিনে তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'মাদরাসা ওছমান বিন আফফান' দেখতে যাই। যা ৯নং যমুনা সেতুর নিকটবর্তী ১০০ বিঘা জমির উপর অবস্থিত (২০ শতকে বিঘা)। এখানে ভবিষ্যতে জামে'আ (বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করা হবে শুনলাম। এখানে এসে মনে পড়ল সেদিনের কথা, যেখানে শাহ ইসমাঈল (রহঃ) প্রচণ্ড শীতের দিনে ফজর বাদ যমুনায় নেমে সাঁতার কাটতেন। আর ছাত্ররা কিতাব নিয়ে নদীর পারে বসে থাকত। তারা পড়ত। আর তিনি সাঁতরে এসে কিছুক্ষণ পাঠদান শেষে আবার সাঁতার কাটতেন। তারপর ফিরে এলাম শহরে।

পরদিন আমানুল্লাহকে নিয়ে হামদর্দ-এর হেড অফিস ও প্রধান কারখানা, যা নাকি ৬০ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানে গেলাম। সেখানে বড় লাইব্রেরী আছে। কিন্তু তেমন কিছু পেলাম না। পরদিন ৬.১.৮৯ইং শাহ অলিউল্লাহ দেহলভীর মাদরাসায় গেলাম। যা এখন

জামে'আ রহীমিয়াহ

জামে'আ রহীমিয়াহ নামে পরিচিত। লাইব্রেরী আছে। তবে পাওয়ার মত কিছু নেই। পাশেই মসজিদ ও তাঁর পারিবারিক গোরস্থান। তাঁর ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের কবরের সামনে পাথরে খোদাই করা নেমপ্লেট। যেয়ারত করলাম। সবার কবর আছে। নেই কেবল মুজাহিদে মিল্লাত আল্লামা শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর কবর। ইতিহাস সৃষ্টিকারী এই মনীষী বেঁচে আছেন উপমহাদেশের কোটি কোটি মুমিনের হৃদয়ের মণিকোঠায় অতীব সম্মানে, অতুলনীয় শ্রদ্ধায়।

সেখান থেকে গেলাম পরবর্তীতে অলিউল্লাহ্‌র মসনদে আসীন মিয়াঁ নযীর হুসায়েন দেহলভী (রহঃ)-এর মাদরাসায়। যা 'জামে'আ নাযীর

জামে'আ নাযীর হোসায়েন

হোসায়েন' নামে ছদর বাযারের ফাটক হাবাশ খাঁ-তে অবস্থিত। এখানে গিয়ে স্মৃতিভারাক্রান্ত হয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক। কেননা এখানে বসেই ইলম ও আমলের শতায়ু মহীরুহ দীর্ঘ ৭৫ বছর ধরে দ্বীনের তা'লীম দিয়েছেন। প্রায় সোয়া লক্ষ ছাত্রের সেই বিশ্বখ্যাত শিক্ষক আজ নেই। বিশ্বব্যাপী আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিস্তৃতিতে যাঁর কোন তুলনা নেই, সেই মহান শিক্ষকের শিক্ষালয়ে দাঁড়িয়ে আছি। অথচ শিক্ষক নেই। আছে কেবল তাঁর স্মৃতি। বিদ'আতী আলেমরা তাকে দাওয়াত দিয়ে বিষ মাখানো রান্না গোশত খাইয়ে হত্যা করতে চেয়েছিল। ব্যর্থ হয়ে মক্কার শাসককে ভুল বুঝিয়ে হজ্জের মৌসুমে তাঁকে গ্রেফতার করিয়েছিল। সেখানেও ব্যর্থ হয়ে অবশেষে ইংরেজ সরকারকে দিয়ে রাওয়ালপিণ্ডির কারাগারে একবছর বন্দী রাখতে সমর্থ হয়েছিল। তাতেও তাদের মনের ঝাল মেটেনি। তাই তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসাভরা কবিতা লিখে সারা দিল্লীতে লিফলেট ছড়িয়ে ছিল। সেদিন তিনি হাসতে হাসতে ভক্তদের বলেছিলেন, 'ওরা আমাকে কিছু দিয়েছে, নেয়নিতো কিছু'। হাঁ এখানে বসেই তিনি ফৎওয়া দিতেন। যা এখন খণ্ডাকারে ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ নামে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে বসেই শিক্ষাগ্রহণ করেছেন উপমহাদেশের ইলমী জগতের দিকপাল আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, শামসুল হক আযীমাবাদী, আব্দুল আযীয রহীমাবাদী, আব্দুল্লাহ গাযীপুরী, মুহাম্মাদ হুসায়েন বাটালভী, আব্দুল্লাহ গযনভী, ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটি, মুহাম্মাদ শাহজাহানপুরী, ওয়াহীদুযযামান লাক্ষ্ণৌবী প্রমুখ বিদ্বানগণ। আজ তাঁর মাদরাসা ও মসজিদ জাঁকজমকপূর্ণ হয়েছে। কিন্তু ঐ মাপের শিক্ষক ও ছাত্র কোথায়?

এরপর গেলাম একই রোডে অবস্থিত মিয়াঁ ছাহেবের বিখ্যাত ছাত্র 'জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছে'র প্রতিষ্ঠাতা আমীর মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব দেহলভীর মাদরাসা, মসজিদ ও পাক্ষিক 'ছহীফায়ে আহলেহাদীছ'-এর অফিস দেখতে। বেশ বড়সড় ভৌতকাঠামো। কিন্তু অন্যগুলির মত এখানেও জরাগ্রস্ত অবস্থা। মূল নেতার অবর্তমানে সবই যেন বেহাল দশা। এই মাদরাসা ১৩০০ হিঃ/১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

পরদিন জমঈয়ত অফিস থেকে পসন্দমত বই কিনলাম। সম্ভবতঃ মূল্য পড়ল ৯২৩/= রূপী। এছাড়াও কিছু পেলাম হাদিয়া। হয়ে গেল আরেকটি বড় বোঝা। যোহরের ছালাত পড়তে গেলাম সম্রাট আকবরের স্মৃতিধন্য ফতেহপুর সিক্রি জামে মসজিদে। উদ্দেশ্য এর বিস্তৃত খোলা চত্বর দেখা। যার উপরে ভর দুপুরের প্রচণ্ড দাবদাহে স্ফুলিঙ্গ সদৃশ পাথরের উপরে আল্লামা ইসমাঈল খালি পায়ে হাঁটতেন ধীরগতিতে। এই অবস্থায় একা পেয়ে একদিন বিদ'আতী আলেমদের পাঠানো মুছল্লীবেশী এক গুণ্ডা ছোরা হাতে তাকে খুন করতে গিয়েছিল। কিন্তু নিজেই ক্ষমা চেয়ে বিদায় হয়। ছাত্ররা তাকে এত কষ্ট করার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, দেখ সমাজ সংস্কারের যে কঠিন আন্দোলনে আমরা নেমেছি, তাতে জীবনে কখন কোন অবস্থায় পড়তে হবে, তার ঠিক নেই। তাই শরীরকে সকল অবস্থায় খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রস্তুত করে নিচ্ছি। হাঁ, পরবর্তীতে তিনি জিহাদ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন এবং ১৮৩১ সালের ৬ই মে শুক্রবার পূর্বাহ্নে বালাকোট জিহাদে ইংরেজ ও শিখবাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। এখানেও ভূমিকা ছিল মুসলমান নামধারী কিছু মুনাফিকের। যারা তাঁর লাশটা পর্যন্ত কবর না দিয়ে টুকরা টুকরা করে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিল।

এরপর গেলাম দিল্লীর লালকেল্লা দেখতে। ভিতরে গিয়ে দেখলাম সেযুগের বিচারালয়। এই কেল্লার সামনেই বিশ্বাসঘাতক ইংরেজরা ভারতের বৃদ্ধ মুগল সম্রাট ২য় বাহাদুর শাহ্‌র সামনে তাঁর বন্দী পুত্র ও পৌত্রদের হত্যা করেছিল ও তাঁকে রেঙ্গুনে নির্বাসন দিয়েছিল। অতঃপর তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। ঐ স্মৃতির অনুসরণেই লাল

লাল কেল্লার প্রধান গেইট

নওদাপাড়া মারকাযী জামে মসজিদ

কেল্লা গেইটের অনুকরণে নওদাপাড়া দারুল ইমারত আহলেহাদীছ মারকাযী জামে মসজিদের গেইট নির্মান করা হয়েছে ২০০০ সালে।

(ক্রমশ)

আরাকানে রোহিঙ্গা উৎপীড়ন
এক রক্তমাখা ইতিহাস ও মানবতার লজ্জা

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহীম

অবতরণিকা :

মায়ানমারের আরাকান প্রদেশের বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠীর নাম রোহিঙ্গা। বর্তমানে বসনিয়া, চেচনিয়া, ফিলিস্তীন, মরো (মিন্দানাও), কাশ্মীর প্রভৃতি সমস্যার মতই রোহিঙ্গা সমস্যাও মুসলিম বিশ্ব বা আন্তর্জাতিক বিশ্বের অন্যতম প্রধান ট্রাজেডী। রোহিঙ্গাদের ইতিহাস হাযার বছরের পুরনো। অষ্টম শতাব্দী থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে সেখানে তাদের বসতি গড়ে উঠেছে। কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসন, সেনাবাহিনী প্রভৃতি অঙ্গন ছাড়াও আরাকান রাজসভায় তাদের ভূমিকা ছিল অনন্য। এমনকি মুসলিম অমাত্যবর্গের পৃষ্টপোষকতায় আরাকানে বাংলা সাহিত্যের প্রভূত বিকাশ সাধিত হয়েছিল। নরমিখলার (১৪৩০-১৪৩৪) সময় থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আরাকানের রাজ দরবার মুসলিম প্রভাবিত ছিল। প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, মন্ত্রী, কাযী এবং রাজ্যের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা থেকে নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারী পর্যন্ত ছিল মুসলিম। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন প্রধানমন্ত্রী মাগন ঠাকুর, (থদোমিন্তার শাসনকাল ১৬৪৫-১৬৫২), প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোঃ সোলাইমান (সান্দা থু ধম্মার শাসনকাল ১৬৫২-৮৪), প্রতিরক্ষামন্ত্রী আশরাফ খান (রাজা থিরি থু ধম্মার শাসনকাল ১৬২২-৩৮)। তাছাড়া তখন আরাকান রাজসভার (অমাত্যসভা) পৃষ্ঠপোষকতায় ও উৎসাহ-অনুপ্রেরণায় মুসলিম কবিগণ সাহিত্য সাধনা করতেন এবং তাদের হাতেই বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। সুতরাং তারা ঐতিহাসিকভাবে সেখানকার স্থায়ী ও বৈধ নাগরিক।

আরাকানে রোহিঙ্গাদের বসতি স্থাপনের ইতিহাস প্রায় হাযার বছরের পুরনো। অষ্টম শতাব্দী থেকে শুরু করে সময়ের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পর্যায়ে আরাকানে মুসলিম বসতি গড়ে উঠে এবং এটি পূর্ণাঙ্গ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় পরিণত হয়। কিন্তু বৃটিশ প্রশাসন ১৯৪৮ সালে বার্মাকে স্বাধীনতা দানের পূর্বে অত্যন্ত সুকৌশলে রোহিঙ্গা-মগদের মধ্যে বিভেদের সূত্রপাত ঘটায়, যাতে করে সেখানে কাশ্মীরের মত স্থায়ীভাবে রক্তপাত ঘটানো যায়। ফলশ্রুতিতে স্বাধীনতা উত্তর বার্মা সরকার ঐতিহাসিক সত্যকে পদদলিত করে রোহিঙ্গাদেরকে কুল্লা বা বহিরাগত হিসেবে অপপ্রচার চালিয়ে তাদের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন আরম্ভ করে। তাদেরকে ক্রমশঃ প্রশাসনিক ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদপূর্বক গোটা প্রশাসনকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মগদের হাতে তুলে দেয় এবং নিয়ন্ত্রিত করে ফেলে তাদের নাগরিক অধিকার। ১৯৪২, ৫৮, ৭৪, ৭৮ ও ৯১ সালে বিভিন্ন অপারেশনের মাধ্যমে বর্মীসেনা ও স্থানীয় মগরা যৌথভাবে তাদেরকে হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, জবরদস্তি শ্রম এক কথায় সমস্ত নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। নিষ্ঠুর ও লোমহর্ষক নির্যাতনের মাধ্যমে হাযার হাযার রোহিঙ্গাদের হত্যা করে এবং লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা প্রাণের ভয়ে স্বদেশ ছেড়ে পাকিস্তান, থাইল্যান্ড এবং বাংলাদেশে পলায়ন করে। ১৯৯১ এর পূর্বে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দ্বি-পক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে এবং আন্তর্জাতিক চাপের মুখে মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের ফেরৎ নিলেও ১৯৯১-৯২ সালে আগত শরণার্থীদের অনেকেই নানা কারণে স্বদেশে ফেরত যেতে পারেনি। রোহিঙ্গা উৎখাতের অংশ হিসাবে ১৯৩৭ থেকে ২০১২ পর্যন্ত ছোট ও বড় আকারে প্রায় ১০০টি সহিংসতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও মিলিটারি স্টাইলে অপারেশন পরিচালিত হয়। সাম্প্রতিক কালের মিয়ানমারের জাতিগত দাঙ্গা আরও একটি রোহিঙ্গা নিগ্রহের মর্মন্তুদ দৃষ্টান্ত।

আরাকানের পরিচিতি :

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র বার্মা বা মিয়ানমারের অর্ন্তগত বর্তমানে 'রাখাইন স্টেট' নামে পরিচিত বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্ব সীমান্তে বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী পাহাড় দ্বারা আবৃত একটি অনিন্দ্য সুন্দর রাজ্য আরাকান। আরাকানের জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ ইসলামের অনুসারী মুসলমান। তাদের মধ্যে থাম্ভইক্য, জেরবাদী, কামানচি, রোহিঙ্গা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত মুসলিম সম্প্রদায়ের বসবাস থাকলেও রোহিঙ্গীয় মুসলিম তাদের মধ্যে বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠী। আরাকান উত্তর অক্ষাংশের ১৭.১৫° ও ২১.৭০° এর মধ্যে এবং পূর্ব দ্রাঘিমাংশের ৯২.১৫° ও ৯৪.৫৫° এর মধ্যে অবস্থিত। উত্তরে চীন ও ভারত, দক্ষিণ-পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর, পূর্ব-পশ্চিমে বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্ব সীমান্তবর্তী নাফ নদীর মধ্যসীমা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম। পূর্বে মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী ইয়োমা পর্বতমালা। এ সুদীর্ঘ, দুর্গম, সুউচ্চ ও বৃহৎ ইয়োমা পর্বতমালা দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত মিয়ানমার থেকে আরাকানকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। নাফ নদী আরাকান ও বাংলাদেশের মধ্যে সীমান্ত রেখা হিসেবে কাজ করে। বৃটিশ শাসিত আরাকানের আয়তন ছিল ২০,০০০ বর্গ মাইল। বর্তমানে আরাকানের আয়তন ১৪,২০০ বর্গমাইল। উত্তর আরাকানে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। আরাকানের মোট জনসংখ্যা ৪০ লক্ষ, তন্মধ্যে ২০ লক্ষ মগ-বৌদ্ধ, ১৪ লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলমান, ৪ লক্ষ সর্বপ্রাণবাদী (animists) এবং ২ লক্ষ হিন্দু ও খৃষ্টান।

রোহিঙ্গাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ :

কাশ্মীর, ফিলিস্তীন, মরো, পূর্ব তিমুর প্রভৃতির মতই রোহিঙ্গা সমস্যা একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশের স্থায়ী অধিবাসী। রোহিঙ্গাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনায় বহুমুখী বির্তক ও মতপার্থক্য রয়েছে। আরাকান খৃষ্টপূর্ব ২৬৬৬ অব্দ থেকে ১৭৮৪ অব্দ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার হাযার বছর যাবত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে স্বাধীন আরাকানের ম্রাউক উ বংশের রাজা নরমিখলা প্রতিষ্ঠিত রাজধানী ম্রোহাং-এর বাংলা উচ্চারণ রোসাং। রোসাং-এর অধিবাসীদেরকে রোসাইংগা বা রোহিঙ্গা বলা হয়। আরবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পরবর্তী সময়ে আরাকানে ইসলাম আগমন করে। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে চন্দ্র বংশীয় রাজা মহৎ ইঙ্গ চন্দ্রের (৭৮৮-৮১০খৃঃ) রাজত্বকালে আরবীয় মুসলিম বনিকগণ নৌবহর নিয়ে আরাকানে আকিয়াব বন্দরসহ দক্ষিণ-পূর্ব চীনের ক্যান্টন বন্দর এলাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন। কথিত আছে যে, এ সময় কয়েকটি আরবীয় বাণিজ্য বহর রাহাম্বী দ্বীপের পাশে বিধ্বস্ত হয় এবং জাহাজের আরোহীরা রহম (দয়া) রহম বলে চিৎকার করলে স্থানীয় জনগণ তাদের উদ্ধার করে। আরাকানের অধিবাসীরা তাদের বুদ্ধিমত্তা ও উন্নত আচরণ অবলোকন করে সেখানেই বসতি স্থাপনের অনুমতি দেন। আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ স্থানীয় লোকজন তাদেরকে রহম জাতির লোক

বলে মনে করত এবং পরবর্তীতে রহম শব্দটি বিকৃত হয়েই রোহিঙ্গা হয়েছে বলে অনেক মনে করেন। রোহিঙ্গা নামের উৎপত্তি রাখাইন শব্দ থেকে যথা- রাখাইন>রোয়াং>রোহিঙ্গা। রোয়াং তিব্বতী শব্দ, যার অর্থ আরাকান। অদ্যাবধি চট্টগ্রাম যেলায় রোয়াং এবং রোয়াইঙ্গা বা রোহিঙ্গা দ্বারা যথাক্রমে আরাকান ও আরাকানের অধিবাসীদেরকে বুঝায়। আরাকানে বিতাড়িত রাজা নরমিখলা ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে বাংলার সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ শাহের সহায়তায় হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে মুহাম্মাদ সোলায়মান ‘শাহ’ উপাধী লাভ করে সিংহাসনে উপবিষ্ট হন এবং লংগিয়েত থেকে রাজধানী লেম্ব্রু (Lembru) নদীর তীরবর্তী ম্রোহাং (Mrohaung) নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং সেখানে রাজত্ব পরিচালনা করেন। এ মোহাং শব্দটি মুসলমানদের লেখায় রোসাংগ লিখিত হয়। চট্রগ্রামে জনগণের নিকট রোসাংগ শব্দটি রোয়াং বা রোহাং নামে পরিচিত। এ রোয়াং বা রোহাং শব্দটিই বিকৃত হয়ে রোহিঙ্গা নামে পরিচিত লাভ করে *(মো. মাহফুজুর রহমান, রোহিঙ্গা সমস্যা : বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গী (১৯৭৮-১৯৯৪); সেপ্টেম্বর ২০০০, ২৩-২৪ পৃঃ)*।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, রোহিঙ্গারা আফগানিস্তানের অন্তর্গত ঘোর প্রদেশের রোহা যেলার অধিবাসীদের বংশধর। মূলত তারা তুর্কী কিংবা আফগানী। কারণ ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজীসহ বাংলার মুসলমান বিজেতা ও শাসকরা ইসলাম প্রচার ও প্রসারে আফগানিস্তানের রোহা অঞ্চলের কিছু ব্যক্তিকে আরাকানে পাঠিয়েছিলেন। রোহা অঞ্চলের মুসলমানরা আরাকানের নামকরণ করেছিলেন রোহাং। এ রোহা ও রোহাং শব্দ থেকে রোহিঙ্গা নামকরণ করা হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, রোয়াং তিব্বতী বর্মী শব্দ, যার অর্থ আরাকান। এ মতে, রোয়াং শব্দের অপভ্রংশ রোহিঙ্গা। মোট কথা, আরাকানের সর্বশেষ রাজধানী হচ্ছে ম্রোহাং, আর তার মুসলিম উচ্চারণ হ’ল রোহাং। এ রোহাংয়ের মুসলিম অধিবাসীদেরকে রোহিঙ্গা বলা হয়।

সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী থেকে আরবীয় বাণিজ্য বহরের মাধ্যমে আরাকানে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছলেও মূলত ১৪৩০ সালের পর নরমিখলা ওরফে সোলাইমান শাহের শাসন আমল থেকেই রোহিঙ্গাদের বিকাশ শুরু। বাংলার সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ শাহ নরমিখলাকে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য প্রথমত ২০,০০০ দ্বিতীয়ত ৩০,০০০ সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। রাজ্য পুনরুদ্ধারোত্তর সৈন্যরা আর স্বদেশ ফেরত না গিয়ে বিয়ে করে স্থায়ীভাবে আরাকানে বসতি স্থাপন করে। ফলে আরাকানে মুসলমানের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে নরমিখলার পরবর্তী শাসকগণ ব্যাপক ভূমিকা রেখে রাজ্যের সমস্ত শাখায় মুসলমানদের নিয়োগ প্রদান করেন। তাদের সহযোগিতায় ও মুসলিম অমাত্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতার ফলশ্রুতিতে মুসলিম কবি ও সাহিত্যিকদের মাধ্যমে বাংলা ভাষার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। সেই সময়ের উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন দৌলত কাযী, আলাওল, হায়াত মাহমূদ, মাগন ঠাকুর, মর্দন, নসরুল্লাহ খান প্রমুখ রোসাঙ্গ রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। ৬৮০ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মাদ ইবনুল হানিফ ইসলাম প্রচারের জন্য প্রথম আরাকান উপকূলে আগমন করেন। ইবনুল হানিফ ও তার স্ত্রীর স্মৃতিস্তম্ভ মংডু উপত্যকায় এখনো বিদ্যমান রয়েছে।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, নবম শতাব্দী থেকে প্রচুর মুসলমান প্রথম বার্মিজ সম্রাট অসারাথার সময়কালে আরাকানে বসতি স্থাপন শুরু করেন। তিনি ১০৫৫ খৃষ্টাব্দে বার্মিজ সম্রাট আনারাথার রাজদরবারে মুসলমানদের অনেক উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন *(বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৭ জুন ২০১২, বর্ষ ৩, সংখ্যা ১০৩)*। রোহিঙ্গারা আরাকান রাজ্যের আদি বাসিন্দা। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরবে যখন থেকে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে, তখন থেকে আরব বণিক ও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে দ্বীনের মাধ্যমে চট্টগ্রামের ন্যায় এখানেও ইসলামের বিস্তৃতি ঘটে *(ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিন এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ, রাজশাহী ১৯৯৬, পৃঃ ৪০৩)*। তাছাড়া আরাকানকে প্রাচীন সময়ে রাহমী রাজ্যভুক্ত এলাকা বলে ধারণা করা হয়। যাকে এখন রামু বলা হয়। তৎকালীন রাহমী রাজা রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য এক কলস আদা উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়েছিল। যা তিনি সাহাবীগণকে বণ্টন করে দেন *(প্রাগুক্ত পৃঃ ৪০৩)*। ধারণা করা হয়, তখন থেকেই এখানে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল এবং স্থানীয় রাজাসহ সাধারণ অধিবাসীরা ইসলামকে সাদরে বরণ করেছিল। তাছাড়া বৃটিশ শাসনামলে ভারত, বাংলা ও বার্মার রাজ্যসীমা একই হবার কারণে অনেক মুসলমান ভাগ্যান্বেষণে আরাকানে পাড়ি জমিয়েছিল। যাদের মধ্যে কেউ স্বদেশ ফিরে এলেও কেউ কেউ সেখানে স্থায়ী আবাসন গড়ে তোলে। তাছাড়া বাংলার গভর্নর সুলতান নাছিরুদ্দীন শাহের সহযোগিতায় বাদশাহ সুলায়মান শাহ কর্তৃক ১৪৩০ সালে আরাকানে প্রথম মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

আরাকানে রোহিঙ্গাদের উৎপীড়নের লোমহর্ষক কাহিনী :

১৯৪২ সালের পূর্বে দু’একটি বড় ধরনের দুর্ঘটনা ছাড়া রোহিঙ্গারা ধর্মীয় স্বাধীনতা থেকে শুরু করে সকল প্রকার স্বাধীনতা, সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছিল। স্থানীয় মগ সম্প্রদায়ের সাথে তাদের সুসম্পর্ক বজায় ছিল। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর উপমহাদেশে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। যার ফলে বার্মার বর্তমান নাম মায়ানমারে থাকিন পার্টির (Thakin party) নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হ’লে পার্টির নেতৃবৃন্দ আরাকানের মগ নেতৃবৃন্দের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। তারা স্বাধীনতাোত্তর আরাকানকে বর্মীভুক্ত রাখতে মুসলমান ও মগদের মাঝে স্থায়ী বিভেদ সৃষ্টির পরিকল্পনা করে। যেভাবে বৃটিশরা ভারত উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষের বীজ বপন করেছিল। তারা নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য রোহিঙ্গা মুসলমানদের

বিরুদ্ধে মগদের মাঝে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াতে থাকে। ১৯৩৭ সালে বৃটিশ বার্মা আলাদা করার পর বৃটিশ প্রশাসন HOME RULE (local self Government of 1937) জারি করে বার্মায় অভ্যন্তরীণ স্থানীয় সরকার গঠনের মাধ্যমে বর্মী নেতৃবৃন্দের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে দেয়। ফলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উস্কানী দিয়ে ১৯৩৮ সালে রেঙ্গুইনসহ নিচু অংশে মুসলিম নিধনযজ্ঞ চালিয়ে ৩০,০০০ মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাছাড়া ১৯৪০ সালে মুসলমানদের উপর বৌদ্ধ ধর্ম ও তার প্রচারক গৌতম বুদ্ধের অবমাননার অভিযোগ এনে থাকিন পার্টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা করে, যার পরিণতি হিসেবেই ১৯৪২ সালে আরাকানে মুসলিম নিধনযজ্ঞ সংগঠিত হয়।

অং সানের নেতৃত্বে ত্রিশ সদস্যের একটি দল জাপানে গোপনে পালিয়ে গেলে জাপান সরকার তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়। জাপানের অর্থ, প্রশিক্ষণ ও নিজস্ব তত্ত্বাবধানে BURAMA INDEPENDENT ARMY (BIA) গঠিত হয়। এই BIA-এর কিছু সদস্য জাপানী সেনাবাহিনীর সাথে অগ্রবর্তী হয়ে আরাকানে এলে স্থানীয় মগরা BIA-এর সহযোগীতায় আরাকানের নিরাপত্তা ও সেনাবাহিনীর অস্ত্র-শস্ত্র হস্ত গত করে আকিয়াব, রাহিডং, মাব্রা, মিনাবিয়া, পুনাজুয়ে, বাহার পাড়া, মহানুযী, পাকটুলিসহ গোটা আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। যা '৪২ ম্যাসাকার' হিসাবে কুখ্যাত। আরাকানের পথে পথে ছিল হাযার হাযার মানুষের লাশ, নাফ নদী ছিল অসংখ্য নারী, আবাল বৃদ্ধ-বণিতাসহ অসংখ্য রোহিঙ্গা মুসলমানদের লাশে পরিপূর্ণ। এ সময় লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাকে হত্যা করা হয় এবং প্রায় ৫ লাখ রোহিঙ্গা মুসলিমের ঘরবাড়ী উচ্ছেদ করা হয় *(ইসলামী বিশ্বকোষ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : সেপ্টেম্বর ১৯৯৬) ২২শ খন্ড পৃঃ ৭২৩)*।

বার্মা কর্তৃপক্ষ ১৯৪৭ সালে নতুন শাসনতান্ত্রিক পরিষদ নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রণীত ভোটের তালিকায় সন্দেহভাজন নাগরিক অজুহাতে আরাকানে মুসলিম অধ্যুষিত জনপদগুলোকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয়। ১৯৪৮ সালে আরাকান থেকে মুসলমানদের বিতাড়ন ও তাদের মধ্যে ভয়-ভীতি সৃষ্টির জন্য আকিয়াবের মগ ডেপুটি কমিশনার ক্যাইউ (Kyawu)-এর নেতৃত্বে ৯৯ শতাংশ মগদের নিয়ে ইমিগ্রেশন অ্যাক্টের অধীনে তদন্তের নামে Burma Territorial Force (BTF) গঠিত হয়। BTF উত্তর আরাকানের বুদ্ধিজীবী, গ্রামপ্রধান, ওলামা ও হাযার হাযার মানুষ হত্যা করে এবং মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামের বাড়িঘর জালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার দেয়।

আরাকানে প্রথম মুহাম্মাদ জাফর হুসাইন কাওয়াল নামে আকিয়াবের জনৈক যুবক রোহিঙ্গা আন্দোলনের সূচনা করেন। রোহিঙ্গাদের বাঁচার একমাত্র পথ হিসেবে সশস্ত্র বিপ্লবে যোগদানের জন্য রোহিঙ্গা যুবকদের উদ্বুদ্ধ করতেন। পরবর্তীতে তার স্থলাভিষিক্ত হন আব্বাস নামে এক যুবক। তাদের আন্দোলন মূলত মুজাহিদ আন্দোলন নামে পরিচিত ছিল। মুজাহিদ আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে তাদের আন্দোলনকে বন্ধ করার জন্য প্রথমে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ১৯৪৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর রাত ৮টায় প্রধানমন্ত্রী ঔনু রেডিওর মাধ্যমে তাদেরকে স্বদেশী (Indigenous Ethnic Community) ঘোষণা করে। তাদেরকে সরকারী পদে ও চাকরীর প্রলোভন দেখায়। পার্লামেন্ট ও অন্যান্য সংস্থায় রোহিঙ্গাদের প্রতিনিধিত্ব স্বীকৃত হয় এবং ৫৭-এর নির্বাচনে প্রথম ভোটাধিকার লাভ করে সাতটি আসনে বিজয়ী হয়। শাসক শ্রেণী একদিকে প্রতিশ্রুতি দেয় অপর দিকে তাদের উপর কঠোরভাবে সামরিক চাপ সৃষ্টি করে এবং Combined Emmigration And Army Operation, Union Military Police Operation প্রভৃতি নামে রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন চালায়। জেনারেল নে উইন রোহিঙ্গা ব্যবসায়ীরা যাতে করে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এই জন্য ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দেশের ব্যাংক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহ রাষ্ট্রীয়করণ করে। জেনারেল নে উইন ক্ষমতায় এসে রোহিঙ্গা নির্মূলের জন্য আরাকানী মগদের উস্কিয়ে দেয়। ১৯৬৪ সালে রোহিঙ্গাদের United Rohingya Organisation, The Rohingya Youth Organisation, Rangoon University, Rohingya Students Association, Rohingya Jamiatul Ulama সহ প্রভৃতি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন সমূহ নিষিদ্ধ করেন *(মো.মাহফুজুর রহমান, রোহিঙ্গা সমস্যা ঃ বাংলাদেশের দৃষ্টিভংগী, পৃঃ ৮৫)*। যা রোহিঙ্গারা তাদের বাঁচার তাগিদে ও অধিকার আদায়ের জন্য বিভিন্ন সময় এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এমনকি ১৯৬৫ সালে Burma Broadcasting Service (BBS) (নিয়মিত ভাবে রোহিঙ্গা ভাষায় প্রচারিত অনুষ্ঠান) এবং ১৯৬৬ সালে সমস্ত বেসরকারী সংবাদ পত্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৬৪ সালে টাকার মুদ্রা মূল্য রহিত করা হয়, ফলে রোহিঙ্গারা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মগরা উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হওয়ার সুবাদে জমাকৃত অর্থের মূল্যমান নতুন টাকা ফেরৎ পেলেও রোহিঙ্গারা তাদের ডিপজিটকৃত টাকা ফেরৎ পায়নি।

তাছাড়া সকল ব্যবসা-বাণিজ্য ও রেশন বিতরণের সার্বিক দায়িত্ব মগদের হাতে থাকায় মুসলমানদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ে। ১৯৬৭ সালে বার্মার রাজধানী রেংগুনে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিলে সরকারীভাবে রোহিঙ্গাদের মজুদকৃত খাদ্য-শস্য জোর পূর্বক আদায় ও লুটপাটের মাধ্যমে তাদের গোলা শূন্য করে। এ দিকে ১৯৬৬ সালে সামরিক অফিসারগণ শিউ কাই (Shwe kyi) ও কাই গান (Kyi Gan) অপারেশনের নামে রাতের শেষ প্রহরে মুসলিম এলাকায় হানা দিয়ে ভয়ংকর মারণাস্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম নিধনযজ্ঞে মেতে উঠে এবং মহিলাদের ইজ্জত হরণ করে। ১৯৭৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী মিন গন নামক জনৈক দুর্ধর্ষ সেনাপতির নেতৃত্বে সশস্ত্র অবস্থায় অধিবাসীদের জাতীয়তা যাচাইয়ের নামে National Registration Card (NRC) তল্লাশীর অজুহাতে বিভিন্নমুখী নির্যাতন চালায়। এই অভিযানের নামে ১৭ ফেব্রুয়ারী প্রায় ৪০০ জন রোহিঙ্গা মহিলাদের ধরে অমানবিক নির্যাতন এবং তাদের শ্লীলতাহানী করে। তাছাড়া ১ মার্চ ড্রাগন অপারেশনের নামে শতশত রোহিঙ্গা গ্রেফতার এবং অমানবিক নির্যাতন চালায়। এমনকি ১৬ মার্চ তাদের উন্মত্ত লালসা মেটানোর জন্য আরো ১০০ জন মহিলা ধরে নিয়ে যায়। এ অপারেশনে ১০ হাযারেরও বেশী রোহিঙ্গা হত্যা করা হয়, প্রায় আড়াই লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে আসে এবং পথিমধ্যে ৪০ হাজার নারী, শিশু ও বৃদ্ধা অকাতরে মৃত্যুবরণ করে *(ঐ, পৃঃ ৯০)*। মিয়ানমার সামরিক জান্তা ১৯৯২ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে আরাকানের মংডু শহরে ৫টি রোহিঙ্গা পল্লী জালিয়ে দেয়। ১৯৯১ সালের ১৭ জুলাই আরাকানের বিভিন্ন শহর হতে শত শত রোহিঙ্গা মুসলমানদের গ্রেফতার করে নির্যাতন করে। ক্ষমতাসীন সামরিক জান্তারা ১৯৯১ সালের ২০ ডিসেম্বর হতে ১৯৯২ সালের ১১ জানুয়ারী পর্যন্ত ২২ দিনে আরাকান থেকে প্রায় ২১ হাযার রোহিঙ্গা যুবক এবং ৫ হাযার যুবতীকে অপহরন করে এবং তাদের উপর অমানবিক নির্যাতনের স্টিমরোলার চালায়। কারো শরীরে পেট্রোল ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।

অসুস্থ রোহিঙ্গা যুবকরা যখন পালাতে যায় তখন নির্যাতনকারীরা তাদের পেছন দিক হতে পেটাতে থাকে এবং ক্রুর হাসি হেসে বলে, ‘কোথায় তোদের আল্লাহ? তাকে এসে তোদের রক্ষা করতে বল’ *(ঐ, পৃঃ ১৫২)*। ১৯৯২ সালের জানুয়ারী মাসে ৫ দিনের ব্যবধানে ক্ষুধা, অনাহারে-অর্ধাহারে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এক হাযার রোহিঙ্গার মৃত্যু ঘটে। ২০০০ সালের জানুয়ারী মাসে রোহিঙ্গাদের ৪৫০টি বাড়ী ধ্বংস এবং বসতবাড়ী ও কৃষি খামারের ২০০ একর জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

২০১২ সালের ভয়াবহ দাঙ্গার পর মায়ানমারের সংখ্যালঘু মুসলমান রোহিঙ্গা জাতির উপর উৎপীড়নের ভুলে যাওয়া ইতিহাস আবারও জ্বলন্ত হয়ে উঠেছে। রোহিঙ্গা এমন একটি ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠী, যারা নিজ দেশেও পরবাসী। বিশ্বের সবচেয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, উদ্বাস্তু ও বন্ধুহীন। বিশ্বের একমাত্র রাষ্ট্রহীন নাগরিক ভাগ্যবিড়ম্বিত রোহিঙ্গাদের সাম্প্রতিক নিষ্পেষণ ও নিপীড়নে বিশ্ব মানবতা আজ শোকার্ত। পত্রিকার ভাষ্য অনুযায়ী জনৈক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নারীকে নির্যাতন এবং হত্যার অভিযোগকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিককালে আরাকানে বৌদ্ধ-রোহিঙ্গা দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে। আকিয়াবের রামব্রির একজন রাখাইন শিক্ষিকা দুই ছাত্রকে পিটানোর

কারণে ছাত্রদের ভাইয়েরা ঐ শিক্ষিকাকে মারধর করে। ফলে শিক্ষিকা মারা যায়। তার লাশ মুসলিম পল্লীর পাশে একটি ছড়ায় ফেলে রাখা হয়। তদন্তে এ ঘটনায় মুসলিমরা জড়িত নন বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু রাখাইনরা তা বিশ্বাস না করে প্রতিশোধ নিতে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে *(বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১০ জুন ২০১২)*। ৩ জুন সানডুতে ১০ মুসলিম বাসযাত্রীকে নির্মমভাবে হত্যা করে বৌদ্ধ উগ্রবাদীরা। অতঃপর তারা মুসলমানদের লাশের উপর থুতু ও মদ ঢেলে নারকীয় উল্লাসে মেতে উঠে। এ সময় পাশেই থাকা নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরাও এই পৈশাচিক উল্লাসে শরীক হয়। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করার জন্য মুসলমানগণ ৮ জুন জুম‘আর ছালাতের পর একত্রিত হলে রাখাইন মগরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে ৯ জুন হতে বৌদ্ধ, রাখাইন, সন্ত্রাসী ও সেনাবাহিনী সম্মিলিতভাবে মুসলিম উচ্ছেদ শুরু করে। দেশটির নাসাকা বাহিনী রাখাইনরা একযোগে মুসলমানদের হামলা চালায়। তারা মুসলিম যুবতীদের ধরে নিয়ে যায় পাহাড়ের গভীর অরণ্যে। নাসাকা বাহিনী নির্বিচারে গণগ্রেফতার করে মুসলিম যুবকদের। তারা মুসলিম চিকিৎসক, শিক্ষকসহ যাকে যেখানে যে অবস্থায় পেয়েছে তাকে সেখানেই জবাই করে, পিটিয়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তাণ্ডব নৃত্য চালায়। মুসলমানদের বাড়িঘর লুটপাট-ভাংচুর করে। অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দেয় সহায়-সম্পদ ও মসজিদগুলো। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে রোহিঙ্গা বসতি। তাদের সেই করুণ আর্ত-চিৎকারে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদারদের হামলা, অগ্নিসংযোগ, হত্যার মুখে বাঙ্গালী জাতি যেভাবে পালিয়েছিল গ্রাম ছেড়ে, ছুটেছিল আশ্রয়ের সন্ধানে। রক্তাক্ত, অগ্নিদগ্ধ, ধর্ষিত হয়েছিল আমাদের স্বদেশ। রোহিঙ্গারা এখন ঠিক তেমনি কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন। রোহিঙ্গারা আরাকানে শত শত বছর ধরে নির্যাতিত, নিস্পেষিত, শোষিত, হত্যা ও নির্যাতনের শিকার। যে রোহিঙ্গারা একদিন আগেও সম্পদশালী ছিল মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে সহায়-সম্পদ হারিয়ে উদ্বাস্তু ও শরণার্থীতে পরিণত হয়েছে। হাযার হাযার বাড়িঘর পুড়িয়ে তাদের উদ্বাস্তু করা হয়েছে। হাযার হাযার তরুণীকে তারা ঘর থেকে ধরে নিয়ে বলাৎকার করেছে। মুসলমানদের হত্যা করে তাদের লাশ ভাসিয়ে দিয়েছে সাগরে। এমনকি মুসলমানদের নির্মমভাবে হত্যা করার পর তাদের মাথা ন্যাড়া করে রাখাইন ভিক্ষু সাজাতে লাল কাপড় মুড়িয়ে ছবি তোলে। এরপর উল্টো মুসলমানরা রাখাইন ভিক্ষুদের হত্যা করেছে মর্মে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রচার করে। মুসলমানদের রক্তস্রোতে ভেসেছে পুরো আরাকান রাজ্য। অসহায় শিশু-কিশোর, ধর্ষিতা, মযলুম মানুষের আর্তনাদে সেখানকার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। এমতাবস্থায় তারা অত্যাচারী জনপদ হতে মুক্তিলাভের জন্য বুভুক্ষু হৃদয়ে অপেক্ষায় রয়েছে। আল্লাহ্র ভাষায়- وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ‘তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্র পথে লড়াই করছ না। অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা প্রার্থনা করে বলছে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই অত্যাচারী জনপদ হ’তে মুক্ত কর এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে অভিভাবক প্রেরণ কর এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হ’তে সাহায্য কারী প্রেরণ কর *(নিসা ৪/৭৫)*।

মিয়ানমারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

রোহিঙ্গা নিধনের জন্য রাখাইনরা শত বৎসরব্যাপী বিভিন্ন অপারেশন ও দাঙ্গার মাধ্যমে তাদের সমূলে উৎপাটন করতে সক্ষম হয়নি। ফলে তাদের জন্য নতুন পরিচয় পত্র তৈরি করা হয়েছে। সে পরিচয়পত্র নিয়ে তারা রাখাইন প্রদেশের মধ্যে বন্দি থাকবে, এর বাইরে যেতে পারবে না এবং তারা কেউ বিয়ে-শাদী করতে পারবেনা। বিবাহিত হলে দু’টির বেশি সন্তান নিতে পারবে না। তারা ঘর থেকে বের হলে তাদের পেছনে থাকবে রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা ও মগদের নজরদারী। অং সান সুচির নেতৃত্বে যে গণতান্ত্রিক মিয়ানমার উদ্ভাসিত হতে যাচ্ছে তার জন্য প্রয়োজনীয় আদমশুমারী করা হবে ২০১৪ সালে। আর এতে সহায়তা করবে জাতিসংঘ। আর এই আদমশুমারীতে যদি রোহিঙ্গা বলে কোন জাতির অস্তিত্ব না থাকে তাহ’লে তাদের মিয়ানমারে না থাকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় হয়ে যাবে বলে মনে করে মিয়ানমার সরকার। এই জন্য তারা সুনিপুণ কিছু কৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তা হ’ল-

১. আরাকানে যে সকল রোহিঙ্গা রয়েছে তাদের যত জনকে সম্ভব হত্যা করা হবে।

২. ব্যাপকতর হত্যা-ধর্ষণের মুখে ভীতসন্ত্রস্ত রোহিঙ্গারা প্রাণ বাঁচাতে মিয়ানমার ছেড়ে বাংলাদেশে পালিয়ে শরণার্থী হিসেবে চলে গেলে তাদের ফেরত নেওয়া হবে না।

৩. যারা পালিয়ে যাবে না তাদের ধরে মিয়ানমারের বন্দিশালায় বা সরকারী সুরক্ষিত এলাকায় নিয়ে যাওয়া হবে যাদের স্ট্যাটাস হবে তারা অনুপ্রবেশকারী বাঙালী টেররিষ্ট *(দৈনিক আমার দেশ, ২১জুন ২০১২,বর্ষ-৯,সংখ্যা-১৬৮)*।

বার্মিজ বৌদ্ধ সন্ত্রাসীরা আরাকানী বৌদ্ধ রাখাইনদের সাথে মিলে আরাকানকে মুসলিমশূন্য করার নীলনকশা করছে। আদি ফিলিস্তিনীদের হটিয়ে যেমন সেখানে বাইরের ইহুদীদের এনে বসানো হচ্ছে, ঠিক তেমনিভাবে আদি রোহিঙ্গাদের বিতাড়িত করে সেখানে রাখাইনদের এনে বসানো হচ্ছে। কারণ মিয়ানমার চায় তাদের নেতৃত্বে সেখানে এক ধরনের বৌদ্ধরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক। তাদের আশংকা মালয়েশিয়ার মত মিয়ানমারও একদিন বৌদ্ধপ্রধান রাষ্ট্র থেকে মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে যাবে।

অং সাং সুচির দৃষ্টিভঙ্গি :

'রোম যখন পুড়ছিল নিরো তখন বাঁশি বাজাচ্ছিল'–সাম্প্রতিক রোহিঙ্গা সমস্যার প্রেক্ষাপটে এই প্রবচনটি বেশ প্রযোজ্য। কারণ মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে যখন হাযার হাযার বাড়িঘর পুড়ে ভস্মীভূত হচ্ছে তখন শান্তিতে নোবেল প্রাপ্ত বার্মিজ নেত্রী অং সাং সুচি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ চষে বেড়াচ্ছেন নির্বিঘ্নে এবং নোবেল পুরস্কারটি গ্রহণ করতে নরওয়ে গেছেন। একদিকে অশান্তির দাবানল দাউদাউ করে জ্বলছে রোহিঙ্গা বসতিতে, অন্যদিকে শান্তির জন্য নোবেল নিতে ছুটেছে গণতন্ত্রের মানসকন্যা ইউরোপের নরওয়েতে। রাখাইন প্রদেশের হাযার হাযার বিপন্ন মানুষ ও জনপদ যখন আর্তনাদ করছে, তখন শান্তিতে নোবেলের জন্য তার ইউরোপ সফর সত্যিই এক অদ্ভুত বৈপরীত্য। শান্তির প্রতিভু কথিত অং সাং সুচি তার এই গুরুত্বপূর্ণ ইউরোপ সফরে রোহিঙ্গা নির্যাতনের বিষয়টি উপস্থাপন করেননি এবং সম্প্রাদায়িক দাঙ্গা নিয়ে কোন বক্তব্য তিনি প্রদান করেননি। অথচ দাঙ্গা শুরু হওয়ার পর পরই ইয়াঙ্গুনে মুসলিম নেতারা তার সঙ্গে দেখা

করেছিলেন। সুচি নেতাদের আশ্বাসও দিয়েছিলেন। যখন রাখাইন রাজ্য রক্তের স্রোতে ভাসছে, যত্র-তত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ধর্ষিত মা-বোনের লাশ যখন কুকুরের খাদ্য হচ্ছে, যখন তাদেরকে নিজস্ব বাড়ি-ঘর থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, কিংবা তারা শরণার্থী হয়ে উত্তাল সমুদ্রে ভাসছে, তখন শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অং সাং সুচি একটি বারের জন্যও এর নিন্দা করলেন না। অথচ তিনিও আর দশজন নারীর মতই একজন নারী। একজন নারীর চোখের সামনে অন্য একজন নারী ইজ্জত লুট করা হচ্ছে, পালাক্রমে তাদেরকে রাখাইনরা ধর্ষণ করছে। কিন্তু আফসোস! এর প্রতিবাদ করার মত সামান্য সৎসাহস তার নেই। যখন তিনি ১৯৮৮ থেকে ২০১০ পর্যন্ত গৃহবন্দি ছিলেন তখন তার বাসভবন ঘেসে ছিল সামরিক জান্তার নিরাপত্তা চৌকি। নিরাপত্তা কর্মীদের তিনি বৌদ্ধ ধর্মের শান্তির কথা বলতেন, গণতন্ত্রের কথা বলতেন, মুক্তির কথা বলতেন। আজ তিনি মুক্ত আকাশের নিচে দেশ-মহাদেশ চষে বেড়াচ্ছেন নির্বিঘ্নে, তাকে বলা হচ্ছে গণতন্ত্রের মানসকন্য, অথচ তিনি আজ নিশ্চুপ। মায়ানমারে গণতন্ত্রের উষালগ্নে এ কোন দৃশ্যের অবতারণা! হাস্যকর মনে হয় যখন গণতন্ত্রের মানসকন্যা নোবেল পদকটি গ্রহণকালে কি অদ্ভুত বৈপরিত্যের দৃষ্টান্ত রেখে বক্তব্য রাখছিলেন এভাবে– 'তার মূল লক্ষ্য এমন একটি পৃথিবী যেখানে অবহেলিত গৃহহীন আর আশাহত মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবেনা। পৃথিবীর প্রতি ইঞ্চি জায়গা হবে মানুষের স্বাধীন বাসভূমি, থাকবে শান্তি আর মানবাধিকারের পূর্ণ নিশ্চয়তা' *(দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৭ জুন ২০১২ বর্ষ ৩ সংখ্যা ১০৩)*। অথচ ১৪ জুন জেনেভায় যখন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন রোহিঙ্গা বিষয় নিয়ে, তখন কিন্তু তিনি রাখাইন বা মায়ানমার সরকারের উৎপীড়নের নিন্দাও করেনি। বরং আমাদের শোনালেন সেই চর্বিত চর্বণ, 'বির্তকিত নাগরিত্ব আইন'। বিদেশী মিডিয়ায় তার বক্তব্য ছাপা হয়েছে এভাবে– We have to be very clear about what the laws of citizenship are and who are entitled to them *(দৈনিক সমকাল, ২৪ জুন ২০১২)*। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে বলার চেষ্টা করলেন, রোহিঙ্গারা মায়ানমারের নাগরিক নন। সরাসরি তিনি একথাটা বলেনি কিন্তু তার বক্তব্যে পরোক্ষভাবে এ কথাটিই ফুটে উঠেছে। এমনকি অং সাং সুচি ও তার দল এনএলডি ও রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। অং সাং সুচি ও তার দল রোহিঙ্গাদের অভিহিত করেছে 'বাংঙ্গালী টেরোরিষ্ট' হিসেবে। অং সাং সুচিকে সাংবাদিকরা যখন প্রশ্ন করলেন রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে করণীয় কি বলে আপনি মনে করেন? হাস্যোজ্বল সুচি তখন উত্তরে বলেন, 'রোহিঙ্গা! তারা আবার কারা?' তিনি এখন তাদেরকে kala অর্থাৎ 'বিদেশী' বলেছেন। সুচির স্মরণ রাখা উচিত ছিল তার পিতা ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের জাতীয় নেতা আর রোহিঙ্গারা সেই সময় স্বাধীনতা আন্দোলনের জাতীয় নেতাকে পূর্ণভাবে সমর্থন দিয়েছিলেন। তার পিতা অং সানের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক সহযোগী ছিলেন মুসলমানদের নেতা উ' রাযাক।

পশ্চিমাদের দৃষ্টিভঙ্গি :

গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ধ্বজাধারী দুই বৃহৎ প্রতিবেশী ভারত, চীন এবং পশ্চিমারা যথারীতি মুখে কুলুপ এটে মজা দেখছে। আজ আরাকান ইস্যুতে কেউ মিয়ানমারের শাসকগোষ্ঠীকে কিছু বলছে না। মিয়ানমার সরকারকে মোটেই চাপ দিচ্ছে না। পশ্চিমারা তাদের প্রয়োজনে পশ্চিমা বধু অং সান সুচিকে গণতন্ত্রের মানসকন্যা উপাধিতে ভূষিত করেছেন। আরাকানে মানুষ নিধনের মহাদুর্যোগে মানবতার দেবী কিন্তু রোহিঙ্গাদের পাশে নেই। পশ্চিমা মানবতাবাদীরা তাকে টু প্রশ্নটি করছেনা। বরং তাকে উপর্যুপরি উপঢৌকন, ফুলেল সম্মাননায় ভরিয়ে তুলছেন। তারা তাকে বলছেন না যে, এভাবে নির্লজ্জের মত ফুলের মালা না নিয়ে প্রকৃত মানব দরদীর মতো নিজের দেশের নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়াও। ওদের রক্ষা কর। প্রয়োজনে তোমাকে আবারও নোবেল দেওয়া হবে। এটা মতলবাজ পশ্চিমাদের ভণ্ডামী ছাড়া আর কিছুই নয়। ওদের প্রতিটি পদক্ষেপের পেছনে থাকে কোন রাষ্ট্রের অঢেল সম্পদরাজি লুটের দুর্দমনীয় বাসনা। আজ মিয়ানমারে গণতন্ত্রের সুবাতাস বইছে হালকা হালকা। পশ্চিমাদের নজর মূলত মিয়ানমারের মাটির নিচের অফুরন্ত সমুদ্র সম্পদের দিকে।

আর এই সম্পদরাজির লোভে পশ্চিমারা মায়ানমারের শাসকগোষ্ঠী ও সুচিকে চটাতে চায় না। আরাকান ও রাখাইন অঞ্চল প্রায় চৌদ্দ হাযার বর্গকিলোমিটারের ভূখণ্ড, যেখানে রয়েছে প্রায় দুই হাযার কিলোমিটার উত্তর-দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর সমুদ্রতট এবং গ্রেট কোকোসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ। শুধু অর্থনৈতিক দিক থেকে নয় বর্তমানে বিশ্ব ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। মূলতঃ এই অঞ্চল ঘিরেই চীন-ভারত-মার্কিনের মধ্যে টানাপড়া চলছে বহু দিন থেকে। চীনের কাছে রাখাইন অঞ্চল অধিক গুরুত্বপূর্ণ। চীনের তেল গ্যাস ও সমান্ত রাল রেললাইনের কাজ চলছে, তার পূর্ব টার্মিনাল রাখাইন তটে। পশ্চিমা বিশ্ব এখন মিয়ানমারকে মাথায় তুলে ধরার চেষ্টা করছে। মিয়ানমারের উপর থেকে যুক্তরাষ্ট্র সহ ইউরোপীয় ইউনিয়নও প্রায় তিন দশকের পুরানো নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে মিয়ানমার সরকারকে অর্থনৈতিক লগ্নির আশ্বাস দিচ্ছে। সেই শক্তিগুলো মিয়ানমার সরকারকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে 'রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠী' হিসেবে আখ্যায়িত না করে নাগরিক হিসেবে গ্রহণ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু তেমন উদ্যোগ এখনও দেখা যায়নি। প্রায় বিশ লক্ষ থেকে ৯ লক্ষ ৬০ হাজার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, যারা আজ রাষ্ট্রহীন বা স্টেটলেস। এমন একটি অসহায় এবং ভয়াবহ পরিস্থিতিতে নিমজ্জমান এই হতভাগ্য রোহিঙ্গা মুসলমানরা। অথচ এদের জন্য পশ্চিমারা কিছু করেনি। কিন্তু মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে ঠিকই মধ্যপ্রাচ্যে চলছে রেজিম চেঞ্জের মহড়া। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রাষ্ট্রহীন ইহুদীদের জন্য পশ্চিমারা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন মধ্যপ্রাচ্যে ফিলিস্তীনিদের বুকের উপর অন্যায়ভাবে ইসরাইল নামক একটি রাষ্ট্র বানিয়ে দিয়েছে। তাদের সংখ্যা তখন ৫ লাখেরও কম ছিল। অথচ প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ আজ নিজ স্থায়ী আবাসভূমিতে 'রাষ্ট্রহীন' হিসেবে ভাসমান। তাদের একমাত্র অপরাধ এটাই যে, তারা মুসলমান।

বাংলাদেশের অবস্থান :

বাস্তবতা যে কত নিষ্ঠুর তার এক মর্মন্তুদ প্রমাণ উপস্থাপন করল বাংলাদেশ। অসহায় আশ্রয়প্রার্থী মানুষকে আশ্রয় দেয়া মানবধর্ম। অন্যদিকে মুসলিম হিসাবে আক্রান্ত মুসলিমদের সাহায্য করাও ছিল ৯০% মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের ঈমানী দায়িত্ব। কিন্তু বাংলাদেশ তথাকথিত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে রোহিঙ্গাদের উপর যে পাশবিক আচরণ প্রদর্শন করল, তা সারাবিশ্বের বিবেকবান মানুষের অন্তরকে পুড়িয়ে দিয়েছে। উৎপীড়ন, নিগ্রহ থেকে বাঁচার তাগিদে যখন নিরন্ন, অসহায় শত শত রোহিঙ্গা উত্তাল সমুদ্র নাফ নদী পাড়ি দিয়ে তাদের প্রতিবেশী মুসলমান ভাইদের নিকট আশ্রয়ের জন্য আসছে, ঠিক সেই মুহূর্তে 'পররাষ্ট্রনীতি'র দোহাই দিয়ে বিজিবি তাদের ঐ অবস্থায় ফেরত যেতে বাধ্য করছে। সে দৃশ্য যে কত মর্মান্তিক ছিল তা পত্রিকায় পাতায় উঠে এসে আমাদের বিবেককে স্তব্ধ করে দিয়েছে। উত্তাল সমুদ্রে নৌকায় দাঁড়িয়ে করজোড়ে বিজিবির কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করছে এক রোহিঙ্গা পরিবারকর্তা, পিছনে পরিবারের নারী ও শিশুরা নির্বিকার-অবসন্নভাবে তাকিয়ে রয়েছে। হাতটি এমনভাবে উঠানো তাতে মনে হচ্ছে রোহিঙ্গারা একই সাথে আল্লাহ এবং তার বান্দাদের কাছে সাহায্য চাচ্ছেন। সাহায্য চাচ্ছেন মযলুম হিসেবে। উত্তাল সমুদ্রে রোহিঙ্গাদের এই অসহায় সাহায্য প্রার্থনার দৃশ্য পুরো মানবজাতিকে করেছে শোকার্ত। রোহিঙ্গা নামের জাতিগোষ্ঠী যখন আরাকানে ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি করে বাঁচার সন্ধানে ছুটছে, মৃত্যুকে মাত্র কয়েক সেকেন্ড দূর থেকে দেখে তারা পালিয়ে আসতে চেয়েছিল এদেশের মাটিতে দীর্ঘ সাগরের উত্তাল ঢেউ পাড়ি দিয়ে। আর সে সময় তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছিল, না হয় নৌকা সমুদ্রের গহীনে ডুবিয়ে দিচ্ছিল। কি নিষ্ঠুর, নির্মম ও ভয়ঙ্কর মৃত্যু! তারপরও আমরা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর তথাকথিত পররাষ্ট্রনীতির শ্বেতপত্র দেখিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিচ্ছি। ঠেলে দিচ্ছি নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। নিয়মের দোহাই দিয়ে তাদের হাইকোর্ট দেখিয়ে বলছি, 'আমরা তোমাদের আশ্রয় দিতে বাধ্য নই। কেননা ১৯৫১ সালের জাতিসংঘের শরণার্থী কনভেনশনে আমরা স্বাক্ষর করিনি। আমরা এমনিতে জনসংখ্যার ভারে আক্রান্ত।

আবার অতিরিক্ত রোহিঙ্গা শরণার্থী নিয়ে কেন আমাদের ঝামেলা সৃষ্টি করব।' বাংলাদেশ সরকারের মনোভাব এমন যেন আমরাই অন্ন-বস্ত্র সংস্থানের মালিক। আল্লাহ্র পরিবর্তে আমরাই মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান যোগাই। ফলে আজকে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের চোখে উটকো ঝামেলা, মিয়ানমারের কাছে বহিরাগত বাঙালী। মিয়ানমারে তারা ঘৃণিত, বাংলাদেশে তারা পরিত্যক্ত। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার কুম্ভীরাশ্রু ফেলে বাংলাদেশ সরকার যে মানবাধিকার লঙ্গনের নতুন অধ্যায় সূচনা করল, তার পরিণাম আমাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। বিশ্বসভায়ও আমরা একটি নীচুমনা জাতি হিসাবে প্রতীয়মান হলাম। জানিনা এ দেশের পররাষ্ট্রনীতিতে মানবতার চেয়ে যদি জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বড় হয়, তবে ভারতকে ট্রানজিট দেয়ার সময় সে স্বার্থ কোথায় ছিল? সীমান্তে যে নির্বিচারে মানবহত্যা চলছে প্রতিনিয়ত, এর বিরুদ্ধে কেন আমাদের তথাকথিত পররাষ্ট্রনীতি এত নীরব?

ইতিহাসের দায়

মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করলেন যে, যদি তোমরা (আমার নে'আমতের) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তাহ'লে তোমাদেরকে অবশ্যই বৃদ্ধি করে দিব, আর যদি অকৃতজ্ঞ হও তাহলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠোর *(ইবরাহীম ১৪/৭)*।

ইতিহাসের দায় বলে একটি কথা মানবসমাজে খুব চালু আছে। সময়ের প্রয়োজনে প্রত্যেক ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ইতিহাসের দায় মেটাতে হয়। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় রোহিঙ্গারা আজ আমাদের আশ্রয়প্রার্থী। অথচ ইতিহাসের সুদীর্ঘ পথপরিক্রমায় এই আরাকানী মুসলমানরা বাঙ্গালীদেরকে সাহায্য করে আসছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান কবি আলাওল আরাকান রাজসভার রাজকবি ছিলেন। এখানে বসেই তিনি মালিক মুহাম্মাদ জায়সীর পদুমাবৎ অবলম্বনে পদ্মাবতী কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বাংলা ভাষার গবেষকরা সবাই একমত যে, আরাকানেই বাংলা ভাষার নবউৎকর্ষের সূচনা হয়েছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়কালে শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে যখন

ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ শুরু হল, বড় পুত্র দারা সপরিবারে এই বাংলায় আশ্রয় নিতে এসেছিলেন কিন্তু বাংলায় তার আশ্রয় না হওয়ায় আরাকানে চলে যান। তৎকালীন মগরাজা দারার কন্যাকে স্ত্রী হিসাবে পাওয়ার জন্যে প্রস্তাব দিলে দারার সাথে মগ রাজার বিরোধ দেখা দেয়। সে ক্ষেত্রে এই রোহিঙ্গা মুসলমানরাই এই মুসলমান রাজকন্যার সম্ভ্রম বাঁচানোর জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন। যদিও তারা সফল হননি। কিন্তু তাদের সাহস, সহমর্মিতা ও মুসলমান হিসেবে আত্মমর্যাদা ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা আছে। শুধু তাই নয় সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে আমাদের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা আরাকানী মগদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। এই অঞ্চলের জনজীবনে আরাকানী ডাকাতদের অত্যাচারের মূর্তিমান আতঙ্ক এখনো শরীরে কাপন ধরায়। বাংলার নবাব শায়েস্তা খানের পুত্র বুজুর্গ উমেদ খান সেই সময়ে আরাকানী রোহিঙ্গা মুসলমানদের কূটনৈতিক এবং সামরিক সহযোগিতায় আরাকানী জলদস্যুদের সম্পূর্ণভাবে দমন করেছিলেন।

মানবিক প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অন্তত ইতিহাসের দায় মেটাতেও রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে দেয়া আমাদের কতটুকু যথার্থ হয়েছে তা ভাবা দরকার ছিল। উদ্বাস্তু হওয়ার অভিজ্ঞতা কি আমাদের নেই? ১৯৭১ সালে যখন গণহত্যা শুরু হয় তখন প্রায় ১ কোটি মানুষ ভারতে উদ্বাস্তু হয়েছিল। ফিলিস্তীনীরা লেবাননে, আফগানরা ইরানে আশ্রয় নিয়েছিল। বাংলাদেশীরা যখন পশ্চিমবঙ্গ কিংবা ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছিল, তখন ঐ রাজ্যগুলো এমনিতেই নিজের সমস্যা নিয়ে পেরেশান ছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তখন নকশালদের উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত ছিল। অর্থনৈতিকভাবেও পেছনে ছিল। তখন যদি পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তের কপাট বন্ধ করে রাখত তাহলে আমাদের মরণ ছাড়া কি অন্য কোন পথ ছিল? বিধর্মী রাষ্ট্র হয়েও পশ্চিমবঙ্গ সেদিন আমাদের কেবল আশ্রয়ই দেয়নি, বরং বাঁচার জন্য ডাল-ভাতও খেতে দিয়েছিল।

শেষকথা

পরিশেষে বলতে চাই যে, প্রত্যেক জাতির মধ্যেই একটি আত্মার টান থাকে। কিন্তু আজকের মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক মমত্ববোধের চরম অভাব। রাষ্ট্রগুলোর অন্তর্দ্বন্দ্ব আমাদের সব দুর্দশার মূল কারণ। অথচ মুসলমানগণ এককালে এমন ছিলনা। বিশ্বের যে কোন প্রান্তে একজন মুসলমান নাগরিক বিপদগ্রস্ত হ'লে মুসলমান রাজা বাদশাহ তাকে উদ্ধার করার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতেন, ঝাঁপিয়ে পড়তেন। স্পেনের মুসলমানরা যখন বিপদগ্রস্ত হয়ে পার্শ্ববর্তী মরক্কোর বাদশাহ ইউসুফ বিন তাশফীনের সাহায্য চাইলেন, তখন তিনি মুসলমানদের সাহায্য করার জন্য সে দেশে উপস্থিত হয়েছিলেন। একইভাবে ষষ্ঠ শতাব্দীতে শ্রীলংকায় বসবাসরত একটি মুসলমান পরিবার সমুদ্রপথে যাত্রাকালে সিন্দুর দেবল বন্দরে সিন্দুরাজ দাহিরের সৈন্যদের দ্বারা লাঞ্চিত হন এবং কারারুদ্ধ হন। সেই কারাগারের অভ্যন্তর থেকে এক কিশোরী মেয়ে ইরাকের উমাইয়া শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে সাহায্য চেয়ে পত্র লেখেন। হাজ্জাজ সিন্ধু রাজার কাছে জবাব চান এবং জবাব সম্মানজনক না হওয়ায় তিনি কালবিলম্ব না করে সেনাপতি মুহাম্মাদ বিন কাসিমকে সিন্ধু অভিযানে পাঠান। পরবর্তী ইতিহাস তো সবার জানা।

ইতিহাসের আলোকে দেশের কর্তাব্যক্তিদের কাছে আমার প্রশ্ন, আমরা কি সেই মুসলমান জাতি? আমাদের কাছে যারা সাহায্য চাচ্ছে তারা কি মুসলমান নয়? নির্যাতিত আরাকানী মুসলমানদের এই বিপদ মুহূর্তে পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের দায়িত্বই সর্বাধিক। এমতাবস্থায় আমরা যদি তাদের সাহায্য করি তাহলে আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন। বিশ্বসভায়ও আমাদের মর্যাদা বাড়বে বৈ কমবে না। দ্বিতীয়ত, রোহিঙ্গারা পূর্বতিমুরের মত স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহায়তা পাওয়ার অধিকারী। আন্তর্জাতিক শরণার্থী কনভেনশন অনুযায়ী মুসলিম রাষ্ট্রগুলো যদি আন্তরিকতার সাথে বিষয়টি সাধারণ পরিষদে ও নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ নেয় তাহলে নিশ্চয়ই জাতিসংঘের পক্ষে বিষয়টি উপেক্ষা করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া ১৯৬০ সালে পূর্ব-পাকিস্তানী গভর্ণর যাকির হোসায়েন, ১৯৭৪ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শেখ মজিবুর রহমান এবং ১৯৭৮ সালে প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের দৃঢ় ভূমিকায় ভীত হয়ে অত্যাচারী বর্মী রাজারা রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদেরকে ফিরিয়ে নিতে এবং তাদের বাড়ীঘরে সম্মানজনক পুনর্বাসনে বাধ্য হয়েছিল। আজ আমাদের সরকারও তেমনি শক্ত ভূমিকা নিলে মিয়ানমার সরকার প্রমাদ গুণতে বাধ্য হবে।

তাই আমরা বাংলাদেশ সরকারকে প্রতিবেশী মুসলিম দেশ হিসাবে অবিলম্বে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে শক্ত হাতে এগিয়ে যাওয়ার আহবান জানাচ্ছি। এর মাধ্যমে যে ক্ষমাহীন অপরাধ আমরা করেছি, তার কিছুটা হলেও হয়ত লাঘব হতে পারে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আর এই নিবন্ধটি যে সকল যুবক ভাই ও বোনেরা পাঠ করলেন তাদের প্রতিও আমাদের আহবান, আসুন! এই মর্মান্তিক ও দুঃসহ ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি। নিশ্চয়ই আমাদের আগামীর যুবসমাজ বর্তমানের এই কাপুরুষ নেতৃবৃন্দের মত নতজানু হয়ে থাকবে না। মানবতা দিয়ে, ন্যায়-সুশাসন দিয়ে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের অধীনে এক ঐক্যবদ্ধ মানবজাতি আমরা গড়ে তুলব– এই হোক আগামী প্রজন্মের বজ্রকঠিন শপথ। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

লেখক : সহ-পরিচালক, সোনামণি, রাজশাহী মহানগরী; ২য় বর্ষ ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

"সত্যের দাওয়াত হল সুস্পষ্ট ও দ্বিধাহীন। যার পিছনে কোন দুনিয়াবী অভিসন্ধি থাকবে না। কারোর ভয়-ভীতি থাকবে না। দাওয়াত গৃহীত হবে না প্রত্যাখ্যাত হবে– তা নিয়ে কোন শংকা থাকবে না। ইসলাম হ'ল একটি পূর্ণ প্যাকেজ। এর বিশেষ অংশ গোপন রাখা বা বিশেষ অংশ প্রকাশ করার কোন সুযোগ নেই। প্রকাশ করতে হবে সম্পূর্ণভাবেই। কিছু মানুষ হিকমতের দোহাই দিয়ে ইসলামের কিছু অংশ গোপন করতে চায়। এটা মূলতঃ এমন কৌশল যা ইসলামকে মানুষের মাঝে আধাআধিভাবে উপস্থাপন করে। বরং প্রকৃত হিকমত হল দাওয়াতকে মানুষের সামনে এমন পূর্ণাঙ্গ ও সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা, যাতে মানুষের মনে কোনরূপ সন্দেহ-সংশয়ের স্থান না থাকে। এটাই ছিল ছাহাবায়ে কেরামের হেকমত।"

গ্রীক তরুণী ও আমেরিকান প্রফেসরের আলোকিত জীবনে ফেরা

রেযওয়ানুল ইসলাম

[ইউরোপ ও আমেরিকায় এখন ইসলাম গ্রহণের হার অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক বেশী। এমনই একজন নবমুসলিম গ্রীক তরুণী জান্না এবং আমেরিকান প্রফেসর জেমস ফ্রাঙ্কেল। ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ডের এই দুই বাসিন্দা সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁদের নিজ জবানীতে ইসলামের পথে আসার হৃদয়গ্রাহী বিবরণ দিয়েছেন। ইংরেজী থেকে নিবন্ধ দু'টি অনুবাদ করেছেন রিযওয়ান হোসেন–নির্বাহী সম্পাদক]

গ্রীক তরুণী জান্না

আমি জান্না। জাতিতে গ্রীক হলেও আমি জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করি এবং সেখানেই একটি অত্যন্ত গোঁড়া ঐতিহ্যবাহী খ্রিষ্টান পরিবারে বেড়ে উঠি। আমার পরিবার নিশ্চিত হতে চেয়েছিল যে, আমরা যেন খ্রিষ্টান ধর্মের কঠোর রীতিনীতি অনুযায়ী বড় হই।

সবসময়ই পরিবারের সবাই আমরা একসাথে ছুটি কাটাতে যেতাম এবং কখনই এ সময়টাতে বিচ্ছিন্ন হতাম না। ফলশ্রুতিতে আমাদের পারিবারিক অবকাশ যাপন সর্বদাই অত্যন্ত আনন্দায়ক হত। প্রথমবার অবকাশযাপনে আমরা সংযুক্ত আরব আমিরাত গিয়েছিলাম এবং সেটা প্রায় ১৩ বছর পূর্বের ঘটনা। তখন আমি ছিলাম ১২-১৩ বছরের এক চঞ্চলা বালিকা। আমরা এক সপ্তাহ সংযুক্ত আরব আমিরাতে অবস্থান করলাম এবং প্রায় সমগ্র দেশটিই ভ্রমণ করে বেড়ালাম। এক শুক্রবারের ঘটনা, আমরা তখন মার্কেটে যাচ্ছিলাম হঠাৎ আযানের ধ্বনি (প্রার্থনার জন্য আহ্বান) ভেসে আসল এবং সকল কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেল। লোকজন তাদের চলাচল বন্ধ করে দিল এবং জায়নামাজ নিয়ে প্রার্থনার জন্য রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। সুবহানাল্লাহ! আমি জানতাম না আযানে কি বলা হচ্ছিল। কিন্তু এটা আমার অন্তরে কিছু একটা পরিবর্তন ঘটাল, যে পরিবর্তনটা মুছে গেল না বরং স্থায়ী হল। আমি জানার জন্য মুখিয়ে থাকলাম এই শব্দগুলোর অর্থ কী এবং এগুলো আসলে কী বলতে চাচ্ছে।

আমি এমন একজন মানুষ ছিলাম যে কখনই মৃত্যু নিয়ে কোন আলোচনা শুনতে একদমই আগ্রহী ছিল না। যখনই মৃত্যুর প্রসঙ্গ নিয়ে কোন কথা উঠত তখনই আমি সেখান থেকে ভেগে যেতাম আর ভুলেও কখনও কারও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতাম না। কিন্তু যেদিন চোখের সামনে চাচাকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে দেখলাম সেদিন থেকেই আমার চিন্তাধারার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটল। অনুভব করলাম যে, জীবনটাকে আমি যেরকম ভাবি তা সেরকম নয়। আমরা অনেক বেশি সময় ও শক্তি অপচয় করছি এমন কিছু অর্জনের জন্য, যা মুহূর্তের মধ্যেই চিরদিনের জন্য হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। চাচার মৃত্যুর পর আমাকে এমন একটা সময়ের মুখোমুখি হতে হয়েছিল যখন রাতে তিন বার করে জেগে উঠতাম এটা পরীক্ষা করার জন্য যে, তখনও আমার মা-বাবা বেঁচে আছেন কি না।

ইসলাম নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা :

মৃত্যু সম্বন্ধে আমার একটা নিশ্চিত ভয় তৈরি হল। কারণ আপনারা জানেন এটাই হল সবকিছুর শেষ। এই ভয়টাই আমাকে ইসলাম নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করার পথ দেখাল। পূর্বে আমি অন্যান্য ধর্ম নিয়েও পড়াশোনা করেছি কিন্তু সেগুলোর মধ্যে এমন সত্য খুঁজে পাইনি যা আমাকে আশ্বস্ত করতে পারত। ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা শুরু করার পর আমার সকল প্রশ্নেরই উত্তর পেলাম যা নিজের ধর্মে পাই নি। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, আমার মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল যখন আমি নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এর জীবনী পড়লাম। আমি শুধু এটা পড়তেই থাকলাম আর পড়তেই থাকলাম। আমার কাছে মনে হল, বিস্ময়কর চারিত্রিক গুণাবলী এবং অন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই মানুষটি এতই মহৎ যে তাঁর তুলনীয় আর কেউ হতেই পারে না। জীবনীটি পড়ার পর ইসলাম সম্পর্কে আগে যা জানতাম তা মন থেকে মুছে ফেলতে বাধ্য হলাম। কারণ পূর্বে যা জেনেছি তা প্রকৃতপক্ষেই ভুল ছিল।

ইসলামই যে একমাত্র সত্য এবং পৃথিবীর আর কোন ধর্মই যে সঠিক নয়, এই বিশ্বাস জন্মাতে একদমই সময় লাগল না। আমার অবচেতন মনের গহীন কোণ থেকে অকপটে বের হয়ে আসল, 'হ্যাঁ, এটাই তো সঠিক ধর্ম।' তবে ইসলাম নিয়ে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালেও প্রকাশ্যে তা গ্রহণ করতে আমি ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলাম। আমার অবস্থা এমন ছিল যে, আমি জানি এটাই সত্য, আমার মনপ্রাণ এই যুক্তি ও জীবনদর্শনকে পুরোপুরি গ্রহণ করে নিয়েছে; অথচ আমি ইসলাম গ্রহণ করতে পারছি না। কারণ আমি জানতাম, আমার বাবা মা, পরিবার কখনোই এটা মেনে নেবে না। এমনকি তারা যদি এই বিষয়ে অল্প কিছুও জানতে পারতেন, তবুও আমার জীবনযাত্রার একটা নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে যেত।

ইসলাম গ্রহণ:

জার্মানিতে একদিন নোহা নামের এক মেয়ের সাথে পরিচয় হল। সে মিসর থেকে এসেছিল। ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে সে আমাকে অনেক সাহায্য করল এবং সাহস জোগাল। আমরা পরস্পরকে ভালভাবে জানলাম। ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা করলাম। তার কাছে আমি আমার সব জিজ্ঞাসার সুন্দর ব্যাখ্যা পেয়ে নিশ্চিত হলাম যে, আমি প্রকৃত সত্যটাই জেনেছি এবং আমার নিজের ধর্ম সঠিক নয়। নোহার সাথে সাক্ষাতের এক-দেড় মাস পর শিক্ষার্থীদের ডরমিটরিতে (হলের গণরুম) প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করব বলে মনস্থ করলাম। এটা শুধু আমি আর নোহাই জানতাম। কিন্তু কিভাবে কিভাবে যেন কিছু মুসলিম শিক্ষার্থী জেনে ফেলল যে, কেউ একজন শান্তির ধর্ম ইসলামে পদার্পণ করছে। কাজেই তারাও সেখানে দল বেঁধে হাজির হল। আলহামদুলিল্লাহ। এভাবে আমি আমার ইসলাম গ্রহণের ২০ জন প্রত্যক্ষদর্শী পেয়ে গেলাম।

আলহামদুলিল্লাহ, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি হাযারো মানুষের মধ্য থেকে আমাকে তাঁর মনোনীত একমাত্র দ্বীনে প্রবেশ করালেন। কখনই আমি সেই দিনটির কথা ভুলতে পারব না। ভুলতে পারব না সেই আনন্দঘন ক্ষণটির কথা, যখন আমি নিজেকে আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণরূপে সমর্পন করলাম।

আমেরিকার তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপকের ইসলাম গ্রহণ

আমি জেমস ফ্র্যাঙ্কেল। আজ আপনাদের শোনাব আমার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী। তখন সময়টা ২০১০-এর সেপ্টেম্বর মাস। বর্তমানে আমি হাওয়াই এর হনুলুলুতে অবস্থান করছি। গত ২ বছর ধরে এখানে আছি। আমি হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের একজন অধ্যাপক। কিছু ভাই বহুদিন থেকে অনুরোধ করে আসছেন আমি যেন আমার ইসলাম গ্রহণের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিই। ইনশাআল্লাহ আজ আপনাদের সে গল্পই বলব যা হয়তো অনেকেরই উপকারে আসতে পারে। আল্লাহ সবাইকে হেদায়াত দান করুন।

প্রারম্ভিক বছরগুলো

হাওয়াইতে আসার আগে আমি নিউইয়র্ক সিটিতে বাস করতাম যেখানে ১৯৬৯ সালে আমার জন্ম হয়। আমি বড় হই ম্যানহাটনে। আমাদের পারিবারিক জীবনটা ভীষণ সুখের ছিল। বাবা-মা আমাকে কোন নির্দিষ্ট ধর্মের শিক্ষা দিয়ে বড় করেননি বটে, কিন্তু তারা আমাকে মৌলিক মূল্যবোধগুলো ঠিকই শিক্ষা দিয়েছিলেন। যদিও আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন ইহুদী তবুও আমি বড় হই ধর্মহীন এক পরিবেশে, যেখানে ধর্মের চর্চা হত না বললেই চলে। ধর্মের সাথে আমার একমাত্র পরিচয় ঘটে দাদির মাধ্যমে যিনি ছিলেন ধর্মপালনকারী একনিষ্ঠ ইহুদী। তার কাছে থেকে আমি বিভিন্ন বিষয় জানতে পারি। যেমন: বাইবেলের বিভিন্ন গল্প, নবীদের কাহিনী ইত্যাদি। একবার বাবা-মা আমাকে একটা হিব্রু স্কুলে ভর্তি করানোর উদ্যোগে নিয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি তার যোগ্য ছিলাম না। কারণ আমার বেশি বেশি প্রশ্ন করার অভ্যাস ছিল। সম্ভবত এই অভ্যাসই আমাকে আজ এ অবস্থানে পৌঁছিয়েছে। একজন মুসলিম হিসেবে, একজন অধ্যাপক হিসেবে আজও আমি আমার এ স্বভাব বজায় রেখেছি।

উল্লেখ করার মত আমার আরও একটি অভিজ্ঞতা আছে। মাত্র ১৩ বছর বয়সে আমি কার্ল মার্ক্সের কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো পড়ি এবং কমিউনিস্ট হওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। আমার মনে হল এই মূল্যবোধ, এই আদর্শ অভ্রান্ত উপকারী। ঠিক সেই সময় আমার সবচেয়ে ভাল বন্ধু ছিল একজন পাকিস্তানী। আন্তর্জাতিক স্কুলে পড়ার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বন্ধু জুটেছিল আমার। পাকিস্তানী সেই বন্ধুটি একদিন আমাকে পবিত্র কুরআনের একটি কপি হাতে দিয়ে বলল, 'আশা করি তুমি এটা পড়বে, কারণ আমি চাই না তুমি জাহান্নামবাসী হও।' সেই সময় জাহান্নাম সম্পর্কে আমার ততটা সচেতনতা ছিল না। কাজেই কুরআনটি শেলফে সাজিয়ে রাখলাম এবং সেখানেই সেটি বহু বছর পড়ে থাকল। কয়েক বছর পর আমার মাথা থেকে কমিউনিজমের ভূত দূর হল, যখন জানলাম যে প্রকৃতপক্ষে কিভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কমিউনিজম চর্চা হচ্ছিল। আমি এই দর্শন ত্যাগ করলাম। এটা ঘটল বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে প্রবেশ করার পর। যাইহোক, ছেলেবেলা থেকেই আমি একটু ভাবুক প্রকৃতির ছিলাম এবং সব সময় জীবনের আসল অর্থ নিয়ে ভাবতাম। এমনকি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন থেকেই আমার মনে উদয় হত কিছু মৌলিক জিজ্ঞাসা। যেমন: কেন আমরা আজ এ পৃথিবীতে? আমাদের ভবিষ্যৎ গন্তব্য কোথায় এবং কেনই বা এত কষ্ট পাচ্ছি? তারপর একদিন বড় হলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ে পা রাখলাম এবং পড়াশোনায় নিজেকে নিবদ্ধ করলাম।

আচ্ছা, আমার দাদির কথা স্মরণ আছে কি যার কথা পূর্বে একবার বলেছিলাম? বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার কারণে আমি তখন ওয়াশিংটন ডিসিতে। একদিন হঠাৎ চাচাত ভাইয়ের ফোন পেয়ে চমকে উঠলাম যখন জানতে পারলাম যে দাদি, চাচা-চাচী ওয়াশিংটনে বেড়াতে এসেছেন। সেদিন রাতে তাদের সাথে খেলাম। বেশিরভাগ সময় দাদির সাথে নানা বিষয় নিয়ে আলাপ করে কাটল। তাকে জানালাম যে, আমি নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রান্সফার নিতে যাচ্ছি। তিনি আমার পরিকল্পনাকে স্বাগত জানালেন। খাওয়া শেষ হওয়ার পর যখন আমরা গাড়ির দিকে হাঁটছিলাম, তখন দাদি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। বললাম, 'দাদিমা ঠিক আছেন তো?; তিনি বললেন, 'আমায় নিয়ে ভেবো না ভাই, নিজের চিন্তা কর।' তাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে কপালে আলতো করে চুমু খেয়ে বললাম, 'আশা করছি, নিউইয়র্কে ফিরে শিগগিরই আপনার সাথে দেখা করতে পারব।' তিনি শুধু বললেন, 'ঈশ্বর ইচ্ছা করলে।'

দাদির মৃত্যু

পরদিন ভোরে আবার চাচাত ভাইয়ের ফোন পেলাম। সে বলল, 'দাদি মারা গেছেন।' ভাবলাম মজা করছে। 'সত্যি? কি আবোল-তাবোল বকছ?' সে বিস্তারিত জানাল যে, ঘুমের মধ্যে দাদির হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। বার বার তার শেষ বাক্যটা কানে বাজতে লাগল- 'ঈশ্বর ইচ্ছা করলে।' খুবই বিস্মিত হলাম কেন দাদির সাথে এমন অপ্রত্যাশিত শেষ সাক্ষাৎ হল যিনি ছিলেন ধর্মের সাথে আমার সংযোগের একমাত্র মাধ্যম। নিউইয়র্কে উপস্থিত হলাম দাদির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে, যা ছিল একটি গতানুগতিক ইহুদী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। সেখানে র‌্যাবাই (ইহুদী ধর্মযাজক) দাদির অতি উচ্চ প্রশংসা করে বললেন, 'সারাহ ছিলেন এক দূর্লভ সম্পদ যাকে ঈশ্বর ফিরিয়ে নিয়েছেন।' পরে সেই রাবাই যখন দাদার বাড়িতে এলেন, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কেউ মারা গেলে কেন বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে হয়। তিনি বললেন, 'এগুলো নিয়ে ভাবার দরকার নেই কারণ এগুলো শুধুই প্রথা মাত্র।' তাকে শুধালাম, 'ঠিক আছে। কিন্তু আপনি কি করে দাদি সম্পর্কে এত ভাল কথা বললেন? আপনি তো তাকে চিনতেনই না। আপনি বললেন যে ঈশ্বর তাকে ফিরিয়ে নিয়েছেন তাহলে তিনি এখন কোথায়? আরও ব্যাপার হচ্ছে, আমার গন্তব্য কোথায়? আর আপনারই বা কোথায়? এবং আরও অনেক প্রশ্ন। এখনও স্পষ্ট চোখে ভাসে, রাবাই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার একটু তাড়া আছে।' তার এই পলায়ন আমাকে যে কতটা রাগান্বিত করেছিল তা তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন কিনা জানি না।

সত্যের সন্ধানে

প্রতিজ্ঞা করলাম দাদির স্মৃতির সম্মানার্থে ঐ প্রশ্নের উত্তরগুলো জানার চেষ্টা করব। তখন আমার বয়স ছিল ১৮ কি ১৯ বছর। বেশ কয়েকটি ইহুদী সংস্থার দারস্থ হলাম প্রশ্নের ঝুড়ি নিয়ে। কিন্তু কেউই আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। আমাকে বলা হল 'ঈশ্বর হলেন একমাত্র ইহুদীদের ঈশ্বর, অন্য কারও নন।' আমার মাথায় একটি যুক্তি খেলে গেল পৃথিবীতে তো মাত্র ২ কোটি লোক ইহুদী, কিন্তু আরও শত শত কোটি লোক আছে, তাদেরকেও তো ঈশ্বরই সৃষ্টি করেছেন তাই না?

তারপর শুরু হল অধ্যয়ন। বাইবেল পড়া যখন শুরু করি তখন আমি শিক্ষানবীশ হিসেবে ইংল্যান্ডে ছিলাম। সেখানে কিন্তু ইভানজিক্যাল খ্রিষ্টানদের (যারা বিশ্বাস করে 'যিশু ঈশ্বর', শুধু এই বিশ্বাসেই মুক্তি মেলে) সাথে আমার সখ্য গড়ে ওঠে। বাইবেল পড়ে যীশু খ্রিষ্টের প্রতি আমার গভীর ভালবাসা ও সম্মান তৈরী হল। কিন্তু তারা চাচ্ছিল আরও একধাপ এগিয়ে আমি যেন যিশুকে ঈশ্বর, রক্ষাকর্তা হিসেবে গ্রহণ করি যা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। বড়জোর তিনি আমার কাছে ছিলেন একজন মহান ব্যক্তিত্ব এবং আদর্শ শিক্ষক। আমি তাদের দাবী অগ্রাহ্য

করলাম। বাইবেল ছাড়াও অনেক বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করলাম। যেমন–বৌদ্ধ ধর্মের মত প্রাচ্য দর্শন; বিভিন্ন পাশ্চাত্য দর্শন, যেমন–গ্রীক, রোমান এবং ঐতিহাসিক দর্শন ইত্যাদি। দুঃখের বিষয় কোনটাতেই আমার সেই নিগূঢ় প্রশ্নগুলোর সমাধান পেলাম না।

এক সময় নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে বিভিন্ন ধর্মের প্রচারকদের দেখা মিলত। সংশয়বাদীদের মত আমিও তাদের সাথে ধর্ম নিয়ে কথা বলতে ভালবাসতাম। একদিন টাইম স্কয়ারের এক কোণায় সাদা টুপি, জুব্বা পরিহিত লম্বা-কালো দাড়িওয়ালা কিছু মানুষকে দেখলাম। সম্ভবত তারা আফ্রিকান বা আফ্রিকান-আমেরিকান ছিল। তাদের দেখতে বাইবেলের নূহ বা ইব্রাহীম (আঃ)-এর মত লাগছিল। জানতে চাইলাম তারা কে এবং কোন ধর্ম প্রচার করছে। সরাসরি উত্তর না দিয়ে তারা বললেন যে, বোধহয় আমি শুনে খুশি হতে পারব না।

আমি বললাম, 'কেন নয়?' তারা বলল, 'কারণ আপনি একটা শয়তান', বললাম, 'কি বললেন, আমি শয়তান?' তারা বলল, 'হ্যাঁ সব শেতাঙ্গরাই শয়তান।' তখন তাদের পাল্টা আক্রমণ করে বসলাম, 'যদি শয়তানই হই তবে কেন ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার এত আগ্রহ?' তাদের ব্যাখ্যা, 'এমনকি শয়তানও ঈশ্বরে বিশ্বাস করে'। তাদের চেপে ধরলাম কোথা থেকে তারা এ কথা জেনেছে অর্থাৎ আমাকে শয়তান বলার উৎসটা কি? তারা বাইবেলের 'বুক অব ড্যানিয়েলে'র কথা বললেন। আমি বললাম, 'না, না। বাইবেল নয়। আপনারা কোন বই পড়েন? আপনারা কি কুরআন পড়েন না?' তারা আমাকে সূরা কাহাফের কিছু আয়াত পড়তে দিলেন।

কুরআন অধ্যয়ন

বাসায় এসেই শেলফ থেকে সেই কুরআনটি বের করলাম যেটি আমার পাকিস্তানী বন্ধু মনসুর দিয়েছিল। কুরআন পড়তে শুরু করলাম বিশেষ করে সেই আয়াতগুলো পড়লাম যেগুলো পড়তে তারা পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেগুলোতে কোন চিহ্নই পেলাম না যেখানে বলা আছে যে আমি বা সব শেতাঙ্গরাই শয়তান। কিন্তু যেহেতু পড়া শুরু করেছি তাই বইটি পড়তে থাকলাম যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন থেকে যখনই অবসর পেতাম তখনই শুধু কুরআন পড়তাম। বাস্তবিকই কুরআন আমাকে অভিভূত করল যা অন্য কোন গ্রন্থ করতে পারেনি। বাইবেলে কুরআনের মত প্রত্যক্ষ কোন নির্দেশনা নেই অপরপক্ষে কুরআনে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে অত্যন্ত সরাসরি এবং আন্তরিকভাবে। কুরআন আমাকে এক নতুন পথের সন্ধান দিল। কুরআন পড়ার সময় মাঝে মাঝে অনুভব করতাম আমার গাল বেয়ে অশ্রু ঝরছে। কেন এমনটা হত তা বুঝতাম না। কখনও কখনও ঘাড়ের লোম খাঁড়া হয়ে যেত। কখন, কোথায় এমনটা ঘটত তা ব্যাখ্যা করতে পারব না কিন্তু এটা বুঝতে পারতাম যে, আমি ঈশ্বরের কালাম পাঠ করছি।

১৯৯০ সনের জানুয়ারী মাসের ঘটনা, একদিন স্কুলের বন্ধুরা মিলে আড্ডা দিচ্ছিলাম। একজন আমাকে হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'তুমি কি ঈশ্বরে আদৌ বিশ্বাস কর?' আসলে সে জানত যে স্কুলে আমি কমিউনিস্ট ছিলাম। তাই এ জিজ্ঞাসা। আমি স্পষ্ট ভাবে উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি।' সে বলল, 'সত্যি? কোন ঈশ্বর?' দ্বিধাহীন চিত্তে ব্যক্ত করলাম। 'ঈশ্বরতো মাত্র একজন।' তারা জানতে চাইল, 'তুমি এটা কিভাবে জানলে?' আমি অকপটে স্বীকার করলাম, 'মহাগ্রন্থ আল কুরআন পড়ে জেনেছি,' তাদের মধ্যকার একজন যে কিনা মুসলিম ছিল সে বলল 'যেহেতু তুমি কুরআন পড়েছে সুতরাং তুমি অবশ্যই বিশ্বাস কর যে এটা আল্লাহ্‌র বাণী এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বার্তাবাহক,' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আমি তো তাই-ই মনে করি।'

সে বিস্মিত হয়ে বলল, 'দাঁড়াও, আমাকে ব্যাপারটা ভালভাবে বুঝতে দাও। তুমি বিশ্বাস কর যে ঈশ্বর মাত্র একজনই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর রাসূল?' আমি বললাম, 'তুমি যদি এভাবে ভাবতে চাও তবে তাই।'

সে আমাকে অবাক করে বলল, 'তাহলে তুমি তো একজন মুসলিম,' আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি বললে! আমি মুসলিম? মুসলিম তো তুমি, কারণ তুমি পাকিস্তানী, আমি তো কেবল এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি।' সে ব্যাখ্যা করল, 'না তুমিও মুসলিম কারণ তুমি বিশ্বাস কর যে আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসুল। হ্যাঁ, তুমি অবশ্যই একজন মুসলিম।' আমি প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম।

এক আত্মগোপনকারী মুসলিম

পরে বেশ কয়েকদিন ঘটনাটা নিয়ে ভাবলাম এবং মনসূরের সাথে যোগাযোগ করলাম যে আমাকে পবিত্র কুরআনটি দিয়েছিল। সে তখন পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত এবং একটি মুসলিম ছাত্র সংস্থার সাথে জড়িত ছিল। তাকে কিছু বই পাঠাতে বললাম যাতে করে ইসলামের পরিচয় এবং একজন মুসলিমের জীবন-যাপন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারি। সে কিছু বই পাঠাল। বিশেষ করে, ১টা বই (Islam in Focus) আমাকে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস এবং পাঁচটি খুঁটি সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা দিল। বইটি থেকে জানলাম, কিভাবে ওযু করতে হয়, কিভাবে ছালাত আদায় করতে হয় এবং কিভাবে কালেমা শাহাদাৎ পাঠ করতে হয়। আমি ইবাদাত করা শুরু করলাম। তখন বাবা-মার সাথে থাকতাম বলে ঘরের দরজা দিয়ে আমাকে ছালাত আদায় করতে হত। কাজেই আপনারা আমাকে আত্মগোপনকারী মুসলিম বলতেই পারেন। এমনকি প্রথমবার যখন ছিয়াম পালন করি তখন সম্পূর্ণ গোপনেই তা করতে হয়েছিল। খেয়াল রাখতাম কখন সূর্য উদিত হয় এবং কখন অস্ত যায়। আর সে অনুযায়ী সেহরী ও ইফতারী খেতাম। এভাবে নও মুসলিম হিসেবে ৬ বা ৮ মাস সম্পূর্ণ একাকী ইবাদাত করেছি যখন একমাত্র কুরআন ছিল আমার পথ নির্দেশ। এক সময় পরিবারকে আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানালাম। একদিন রাতে খেতে খেতে বললাম, 'আমি কুরআন পড়েছি।' বাবা-মা বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা সেটা জানি। আমরা তোমাকে সেটা সব জায়গায় বহন করতে দেখি।' বললাম, 'আমি সত্যি সত্যিই এতে বিশ্বাস করি এবং সে বিশ্বাসের দাবি অনুযায়ী আমি কুরআনের শিক্ষা অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার মনে হয় আমি তাতে মুসলিম হয়ে গেছি।'

পরিবারের প্রতিক্রিয়া

মার প্রতিক্রিয়া ছিল খুব কঠোর। তিনি কাঁদলেন এবং বাবার দিকে তাকিয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করলেন, 'আমাদের ভুল ছিল কোথায়, কিভাবে এমনটা ঘটল?' বাবার প্রতিক্রিয়া ছিল অনেকটা শান্ত। সম্ভবত তিনি ভাবলেন। 'ঠিক আছে, আমার ছেলে তো ১৩ বছর বয়সে কমিউনিস্ট হয়েছিল, ১৬ বছর বয়সে চুল ছোট করা বাউন্ডুলে। সে বিভিন্ন অবস্থা পাড়ি দিয়ে এসেছে। হয়তো এটাও তেমনই একটা।' কিন্তু না, আমি জানি, আমার বর্তমান অবস্থাটা কখনই পরিবর্তন হবে না। আল্লাহ্‌র কাছে এটাই আমার একমাত্র কামনা। কারণ অনেক চড়াই উতরাই পার হয়ে অবশেষে আমি চূড়ান্ত সত্য, সঠিক পথ এবং এক কালজয়ী সুন্দর আদর্শের সন্ধান পেয়েছি। তাই কায়মনোবাক্যে সর্বদা প্রার্থনা করি আমি যেন আর কখনই সে অন্ধকারে ফিরে না যাই। আমীন!

[লেখক : ৩য় সেমিস্টার, ইংরেজী বিভাগ, নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ক্যাম্পাস]

Contents

ভারতে মুসলমানদের মুখোমুখি

ফিরোজ মাহবুব কামাল

ভারতে গিয়ে সেদেশের মুসলমানদের দেখার ইচ্ছাটি ছিল আমার বহু দিনের। আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাথে ভারতীয় মুসলমানদের নাড়ীর সংযোগটি প্রায় ৮'শত বছরের। মুসলিম রূপে আমাদের পরস্পরের যে আত্মার সম্পর্ক, সেটি সহজে বিচ্ছিন্ন হবার নয়। ইসলামের এটিই আন্তর্জাতিক ভাতৃত্বের বন্ধন। সে বন্ধন বিশ্বের সকল মুসলমানের সাথে। ঈমান থাকলে সে বন্ধন থাকবেই। না থাকলে সেটি হবে ঈমানহীনতা। ভারতে আমি একাধিকবার গিয়েছি। তবে সেটি মুম্বাই এবং পশ্চিম বাংলার মুর্শিদাবাদ ও কোলকাতাতে। এবং সেটিও স্বল্প সময়ের জন্য। ফলে বিশাল ভারতের অন্যান্য এলাকার সাধারণ মুসলমানদের মুখোমুখি হয়ে তাদের হাল-হকিকত জানার তেমন ফুরসত খুব একটা ঘটেনি। সে সুযোগটি আসে ১৯৯৬ সালে।

আমি তখন এক পোষ্ট গ্রাজুয়েশন কোর্সে ভারতের জয়পুর শহরে প্রায় ৬ মাসের জন্য অবস্থানের সুযোগ পাই। এটি আমার মনোবাসনা পূরণের এক প্রচণ্ড সুযোগ এনে দেয়। কোর্সের ফাঁকে ফাঁকে চেষ্টা করেছি ভারতের বিভিন্ন শহরে বেড়াতে যাওয়ার এবং চেষ্টা করেছি সেসব শহরে মুসলমানদের সাথে কথা বলার। এভাবে সুযোগ করে নিয়েছিলাম জয়পুর, আজমির, আগ্রা, দিল্লী শহরকে দেখার এবং এসব শহরের মুসলমানদের সাথে কথা বলার। কোর্সের ফাঁকে দেশে ফিরতাম দিল্লী বিমানবন্দর হয়ে। ফলে ফেরার পথে দিল্লী শহরকে দেখার বাড়তি সুযোগ মিলতো। যেখানেই গেছি দেখেছি সবাই উর্দূ বুঝে। উর্দূ শুধু দিল্লী বা উত্তর ভারতের মুসলমানদের ভাষা নয়, সমগ্র ভারতের মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভাষা। ভারতীয় হিন্দুদের তেমন কোন সর্বভারতীয় ভাষা নেই। হিন্দি ভাষা এখনও দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোতে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। ভাষাটি এতই সহজ যে শিখতে এক মাস বা দুই মাসের বেশী লাগে না। উর্দূ ভাষা জানা থাকার ফলে আমার পক্ষে তাদের সাথে কথা বলার একটি বাড়তি সুবিধা ছিল। তাদের সাথে কথা বলেছি কখনও বা মসজিদের মেঝেতে, কখনও দোকানে দাঁড়িয়ে, কখনও বা রাজপথে।

লক্ষ্য করেছি, ভারতীয় মুসলমানদের সামনে যখনই নিজেকে বাংলাদেশী ডাক্তার রূপে পরিচয় দিয়েছি, দেখেছি তৎক্ষণাৎ তারা আমাকে কনফিডেন্সে নিয়েছে। মন খুলে কথা বলেছে। তখন তাদের ক্ষোভের কথাগুলো নির্ভয়ে বেরিয়ে এসেছে। মনে হয় যেন এগুলো তাদের অনেকদিনের অব্যক্ত কথা। সেগুলো কেউ শুনবে বা লিখবে তেমন কোন লোকও যেন নেই। আমাদের ইন্সটিটিউটটি একটি প্রাইভেট হেলথ ম্যানেজম্যান্ট ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ঢাকার আইসিডিডিআরবির সাথে তার সামান্য কিছু মিল আছে। প্রায় ৫০ বিঘা জমির উপর গড়ে উঠা সে বিশাল প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছেন এক মারোয়ারি ধনিক পরিবার। জয়পুর হল রাজস্থানের রাজধানী। আর রাজস্থান হল মারোয়ারীদের আদি বাসভূমি। বাংলাদেশে বহু মারোয়ারি দেখেছি, তাদের রমরমা ব্যবসাও দেখেছি। ইচ্ছা ছিল তাদের আদি ভূমি দেখার। এবার সে সুযোগও মিলল। অবাক হলাম, এতবড় প্রতিষ্ঠানে কোন মুসলমান শিক্ষক নেই। কোন কেরানীও নেই। এমনকি কোন দারোয়ানও নেই। বাংলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যা দেশের জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ১০ ভাগ। কিন্তু এমন কোন সরকারী ও বেসরকারী অফিস-আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আছে কি যেখানে তারা নজরে পড়ে না? তারা নজরে পড়ে বাংলাদেশের ট্রেনে, বাসে, লঞ্চেও। কিন্তু লক্ষণীয় হল, ভারতীয় মুসলমানেরা সেদেশের বাসে ট্রেনে এতটা নজরে পড়ে। যাত্রাপথে তো তারাই বের হয় যাদের চাকুরি-বাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও স্বচ্ছলতা আছে। লক্ষ্য করলাম, এতবড় প্রতিষ্ঠানে কোন ছালাতের ঘরও নেই। যেখানে মুসলমান কর্মচারীই নেই সেখানে থাকবেই বা কেন? ভারতে জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ মুসলমান। বিলেতে মুসলিম জনসংখ্যা শতকরা ৩ ভাগও নয়। লন্ডনে সে হার শতকরা ১০ ভাগের কিছু বেশী। তবুও লন্ডনে এমন কোন হাসপাতাল নেই যেখানে মুসলমানদের জন্য কোন ছালাতের ঘর নেই। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সেটি নিজ থেকেই নির্ধারিত করে দিয়েছে। ইবাদতের অধিকার যে মৌলিক অধিকার সেটি ব্রিটিশ সরকার নীতিগত ভাবে স্বীকার করে। তাই এ আয়োজন। ভারত ধর্মনিরপেক্ষতার দাবী করলেও সেদেশে সংখ্যালঘুদের সে অধিকারটি যে কতটা অবহেলিত সেটি বুঝবার জন্য কোন গবেষণার প্রয়োজন পড়েনা। পথে-ঘাটে সেটি নজরে পড়ে। বিলেতের প্রায় প্রতিটি হাসপাতালে জুম'আর ছালাত আদায় হয়। ছালাতের ঘর রয়েছে হিথ্রো এয়ারপোর্টে। অথচ ছালাতের কোন ঘর দেখিনি মুম্বাই বা দিল্লী এয়ারপোর্টে।

বাংলাদেশে বা পাকিস্তানে যত মুসলমানের বাস তার চেয়ে বেশী মুসলমানের বাস ভারতে। অথচ সমগ্র বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের কথা দূরে থাক, শুধুমাত্র ঢাকা বা করাচী বা লাহোরের মত একটি শহরে যে সংখ্যক মুসলিম ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষাবিদ, হিসাববিদ, আইনবিদ বা চাকুরিজীবি আছেন সমগ্র ভারতের প্রায় বিশ কোটি মুসলমানের মাঝে তার অর্ধেকও নেই। শিক্ষাদীক্ষা ও চাকুরিতে তাদের বেড়ে উঠাকে কতটা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এ হল তার নমুনা। জনসংখ্যায় শতকরা ১৫ ভাগ হলে কি হবে চাকুরিতে তাদের সংখ্যা শতকরা ৩ ভাগেরও নয়। ভারতীয় মুসলমানদের এ বঞ্চনার কিছু পরিচয় লন্ডনে বসেও বোঝা যায়। আমি বিলেতে সেসব হাসপাতালে কাজ করেছি সেখানে প্রচুর ভারতীয় ডাক্তার দেখেছি। তাদের অধিকাংশই হিন্দু। লন্ডনের হাসপাতালগুলোতে বহু বাংলাদেশী ও পাকিস্তানী ডাক্তারও কাজও করে। কিন্তু হিন্দুস্থান থেকে আগত মুসলমান ডাক্তার খুব একটা নজরে পড়ে না। লিবিয়ার জনসংখ্যা মাত্র ৬০ লাখ। কিন্তু লন্ডনের হাসপাতালে যত লিবিয়ান ডাক্তার দেখিছি তত ভারতীয় মুসলমান ডাক্তার দেখিনি।

এ যাত্রায় আমার ভারত দেখা শুরু হয় জয়পুর শহর থেকে। রাজস্থান একটি মরুভূমিময় রাজ্য, জয়পুর তারই রাজধানী। ফলে শহরটির বাতাসে রুক্ষতা। শহরটিতে গিয়ে যেটি প্রথম নজরে পড়ল সেটি বিল্ডিংগুলোর রং। অধিকাংশ ভবনগুলোর দেয়ালের রং গোলাপী। এজন্য শহরটি পরিচিত পিঙ্ক সিটি বা গোলাপী শহর রূপে। প্রচুর বিদেশী আসে এ শহর দেখতে। বিদেশীদের কাছে বড় আকর্ষণ শুধু জয়পুরে অবস্থিত রাজাদের প্যালেস ও তার স্থাপত্য নয়, বরং রাজস্থানের মরুভূমি। তারা ছুটে যায় জয়সালমীর, বিকানিরের মরুভূমিতে। সেখানে গিয়ে তারা উটের পীঠে চড়ে। ইউরোপ-আমেরিকা থেকে আগত টুরিস্টদের জন্য সেটিও মজার ব্যাপার।

আমাদের ইন্সটিটিউট জয়পুর শহর থেকে বেশ দূরে। সপ্তাহে একবার আমাদেরকে ইন্সটিটিউটের পক্ষ থেকে বাসে জয়পুর শহরে শপিংয়ে আনা হত। শপিংয়ের তেমন কিছু থাকতো না, আমি সে সময়টি ব্যয় করতাম বেড়ানোর কাজে। আছরের বা মাগরিবের ছালাত পড়তাম একেকবার একেক মসজিদে গিয়ে, যাতে ছালাতের সাথে সেসব মসজিদগুলো ও তার মুছল্লীদের সাথে দেখা হয়। ছালাত শেষে চেষ্টা করতাম তাদের সাথে কথা বলার। জয়পুর শহরে গোটা চারেক মসজিদের সন্ধান পেয়েছিলাম। সবগুলো মসজিদ দেখেই মনে হত সেগুলো হাল-আমলের গড়া নয়। গড়া হয়েছে সম্ভবত ব্রিটিশ আমলে। বাংলাদেশের যেলা বা থানা পর্যায়ে আজকাল যে মানের ঝকমকা

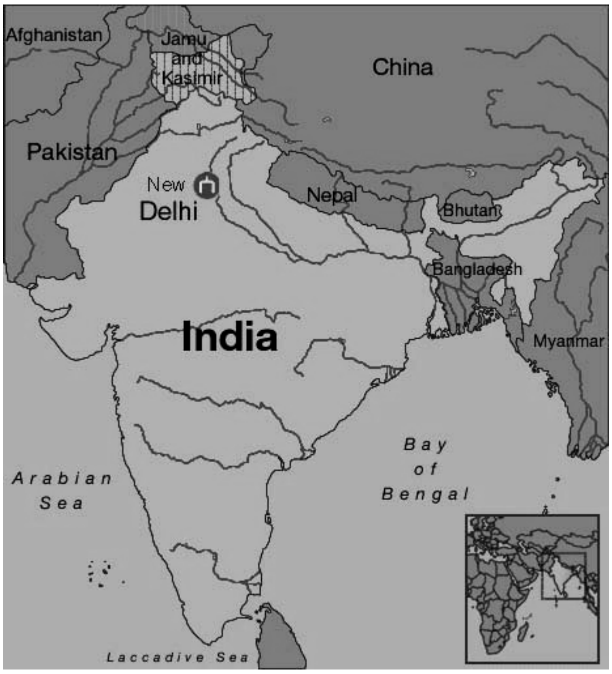

মসজিদ দেখা যায় সেটি জয়পুরের ন্যায় প্রাদেশিক রাজধানীর মসজিদেও দেখিনি। জুম'আর দিন মসজিদগুলোতে স্থান সংকুলান হয় না। কারণ মুসলিম জনসংখ্যা বিগত ৫০ বছরে অনেক বেড়েছে কিন্তু সে তুলনায় মসজিদের সংখ্যা বাড়েনি। পুরানো মসজিদগুলোর আয়তনও বাড়েনি। এমনকি আগ্রায় গিয়ে শাহজাহানের গড়া ঐতিহাসিক মসজিদে ছালাত পড়তে গিয়ে তার জরাজীর্ণ দশা দেখে বিস্মিত হয়েছি। দারিদ্র্যতা ফুটে বেরুচ্ছে এ বিশাল মসজিদের মেঝে, জায়নামায, দেয়াল ও সিঁড়ি দিয়ে। কোন মসজিদেই কোন কার্পেট দেখিনি। অথচ কার্পেট দেখা যায় এখন বাংলাদেশের খুব সাধারণ মানের মসজিদেও। মনে হল, মসজিদকে ঠিকমত ঝাড়ুও দেয়া হয়না। আজমিরে গিয়ে তো অবাক। টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়ায় দরগাহ সংলগ্ন পাবলিক টয়লেটে গেলাম। দেখলাম মল-মূত্র সেখানে উপচিয়ে পড়ছে। অবস্থা দেখে আর সামনে এগুনোর হিম্মত হল না। পরে এক হোটেলে খেতে গিয়ে কাজ সারলাম। জুম'আর ছালাত পড়তে আমার ইন্সটিটিউটের সবচেয়ে কাছের মসজিদে মাঝেমধ্যে যেতাম। সেখানে যেতে হলে আমাদেরকে টেম্পোতে চড়ে যেতে হত। একদিন মসজিদের জায়নামাযে বসে যে কাহিনী শুনলাম সেটি নিতান্তই করুণ। মসজিদটি এককালে বিশাল ওয়াকফ সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে জমি বেদখল হয়ে গেছে। আমাকে পাশের পাবলিক ওয়াকার্স ডিপার্টমেন্টের অফিস আর তার আশেপাশে স্তূপিকৃত নানা যন্ত্রপাতি দেখিয়ে বলা হল, এ অফিসটি মসজিদের জমির উপর। ১৯৪৭-এর পর মসজিদের জমি হিন্দুরা জোর পূর্বক দখল করে নেয়। মসজিদের ইমাম সাহেবের বসবাসের জন্য কোন ঘর নেই, ঘর নির্মাণের কোন স্থানও নেই। ইমাম সাহেবকে ঘুমাতে বা বিশ্রাম নিতে হয় মসজিদের মেঝেতে। তার কাপড়-চোপড় রাখতে হয় মসজিদের এক কোনায়। দেখলাম মসজিদের জবরদখল করা ভূমিতে বসে কিছু লোক গল্পগুজব করছে, তাদের আওয়াজও মসজিদে ভেসে আসছে। ভারতে অবস্থানকালেই একবার রামাযানের ঈদ এল। ঈদের ছালাত পড়তে গেলাম শহরতলীর এক মসজিদে। যারা ঈদের ছালাত পড়তে মসজিদে এসেছে তাদের চেহারা-সুরত, কাপড়-চোপড় ও দেহের ভাষা দেখে আমার নিজের আনন্দটাই মারা পড়ল। বাংলাদেশের ঈদের মাঠে গেলে মনটি যেন এমনিতেই আনন্দে নেচে উঠে। যারা সচরাচর হাসতে জানে না, তারাও সেদিন নির্মল হাসি দেয়। প্রাণ খুলে কথা বলে। চারিদিকে থাকে আনন্দের প্রচণ্ড গুণগান। শিশু-যুবক-বৃদ্ধ সবার মধ্যে থাকে উচ্ছল আনন্দের লেশ। সে আনন্দ শুধু মুখের ভাষায় নয়, দেহের ভাষা ও পোষাকের ভাষাতেও প্রকাশ পায়। আনন্দের সে প্রবল সুরটি ঘর-বাড়ি, মসজিদ-ঈদগাহ, রাস্তাঘাট, দোকান-পাট তথা সমগ্র পরিবেশে ধরা পড়ে। কিন্তু জয়পুরের ঈদের মাঠে সেটি আমার নজরে পড়েনি। বরং দেখেছি পুষ্টিহীনতা, দেখেছি মলিনতা। সেদিনেও দেখলাম মসজিদের মেঝেতে বিছানো ময়লাধরা বহু পুরনো জায়নামাজের সিট। নির্জীব মানুষগুলো মলিন বেশে মামুলী লেবাস পড়ে মসজিদে ঢুকছে। ইমাম সাহেব বড় কষ্ট করে খুৎবা পাঠ করলেন। তার দেহে যেমন পুষ্টিহীনতা, তেমনি পোষাকেও দারিদ্রতা। তার মধ্যেও সে জোশ, সে আবেগ, ঈদের সে ছবি দেখলাম না। সমগ্র ঈদের মাঠে যেন নীরব ক্রন্দনের সুর। ছালাত শেষে প্রাণঢালা মোলাকাত হয় সেটিও খুব একটা দেখলাম না।

জয়পুরের বড় মসজিদের মেঝেতে একদিন আলাপ হচ্ছিল এক মুছল্লির সাথে। বুঝা গেল, ভদ্রলোক তাবলীগ জামায়াত করেন। তিনি বললেন, তাবলীগ জামাতের পক্ষ থেকে জয়পুরের শহরতলীতে একটি দোতলা মসজিদ নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। তাবলীগ জামায়াত দীর্ঘ দিন ধরে তেমন একটি মসজিদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিল। কিন্তু সেটির নির্মাণে রাজস্থান সরকার অনুমতি দেয়নি। অনুমতি দিয়েছে এক তলার। তাদের কথা, দোতলা মসজিদ নির্মাণ করা হলে তাতে মুসলিম স্থাপত্য ও ঐতিহ্যের প্রকাশ ঘটবে। ভারত হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের দেশ, শহরের স্থাপত্যে একমাত্র সেটিরই প্রকাশ ঘটতে হবে। অন্য কোন স্থাপত্যে হিন্দু ঐতিহ্য ঢাকা পড়ুক বা খর্ব হোক সেটি সরকার চায় না। মসজিদ নির্মাণ এতটাই নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে যে জুম'আর দিনে মসজিদগুলোর অভ্যন্তরে স্থান সংকুলান না হওয়ায় শত শত মুছল্লী উপচে পড়ে মসজিদের পাশের রাজপথে। এতে বন্ধ হয়ে যায় রাস্তাঘাট, সৃষ্টি হয় আশেপাশের রাস্তায় প্রচণ্ড যানজট। সে চিত্র মোম্বাই, দিল্লী, হায়দারাবাদ, আহমেদাবাদের ন্যায় শহরগুলোতে অতি করুণ। স্বভাবতই তাতে গাড়িচালক ও পথচারীদের প্রচণ্ড অসুবিধা হয়। অসন্তোষও গড়ে উঠে। আর সে অসন্তোষকে পুঁজি করে শিবসেনা, আরএসএস, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বজরং দলের ন্যায় কট্টোর সাম্প্রদায়িক দলগুলোর নেতারা সে যানজটের জন্য মুসলমানদের দায়ী করে। তারা সরকারের কাছে দাবী করে রাজপথে ছালাত পড়া বন্ধের। কিন্তু একথা বলে না, মুসলমানদের জন্য নতুন মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দেয়া হোক। সরকারকে তো তারাও ট্যাক্স দেয়। মসজিদ কোন ব্যক্তির প্রতিষ্ঠান নয়, এটি কম্যিউনিটির। সরকার থেকে জমি বরাদ্দ না পেলে কি কোন শহরে মসজিদ নির্মাণ করা যায়? অথচ সরকারের তাতে ভ্রুক্ষেপও নাই। এভাবেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে

ধর্মপালনের ন্যায় মুসলমানদের মৌলিক মানবিক অধিকার। আর এটিই হল ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা। অথচ জয়পুর শহরের রাস্তায় ঘন ঘন মন্দির দেখা যায়। অনেকগুলো গড়ে উঠেছে ফুটপাথ দখল করে। জয়পুর শহরের শতকরা ৪০ ভাগ বসতি মুসলমান। কিন্তু সে তুলনায় তাদের ধর্মীয় বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান দেখলাম না।

জয়পুর শহরটি মূলত দুই ভাগে বিভক্ত। মুসলিম প্রধান পুরানো শহর, এর অবস্থান শহরের মধ্যভাগে। আর সেটিকে ঘিরে রয়েছে হিন্দু প্রধান বিশাল আধুনিক শহর। মুসলমান জনসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, প্রচণ্ড চাপ বাড়ছে পুরানো বসত বাড়ীর উপর। জয়পুরের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ মুসলমান হলেও শহরের শতকরা ১০ ভাগ জমির উপরও তাদের দখল নেই। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার রাস্তাঘাটও নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর। রাস্তার উপর স্তূপিকৃত হয়ে আছে আবর্জনা। বুঝা গেল সেগুলি সরানোতেই রয়েছে গাফলতি। সে আবর্জনার পাশেই দেখলাম একটি মসজিদ। মসজিদটি পুরানো হলেও দেয়ালের কোন কোন স্থানে প্লাস্টারের কাজও এখনও শেষ হয়নি। পুরাপুরি ঘিঞ্জি এলাকা। কোন পার্ক নাই, স্কুল নাই, ড্রেন নাই, প্রশস্ত রাস্তাও নাই। অথচ যুগ যুগ ধরে মুসলমানগণ সেখানেই বসবাস করছে। চাইলেও তাদের পক্ষে সেখান থেকে বেরিয়ে আশা সম্ভব নয়। একে তো আধুনিক আবাসিক এলাকায় জমি কেনা ও বাড়ি নির্মাণের আর্থিক সামর্থ্য তাদের নেই। আর সামর্থ্য থাকলেও হিন্দু প্রধান সে সব এলাকায় তাদের নিরাপত্তা নেই। শহরে দাঙ্গা বাধলে সর্বপ্রথম হামলা শুরু হয় হিন্দু এলাকায় ঘর বাঁধা মুসলিম পরিবারগুলোর উপর। ধর্ষণের শিকার হয় সেসব মহিলারা। আর সে সাথে নিহত হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। ১৯৪৭ সাল থেকে ভারতীয় মুসলমানদের সে করুণ অভিজ্ঞতা বহু হাজার বার হয়েছে। মুসলিম-নির্মূল দাঙ্গাই ভারতীয় রাজনীতির প্রবলতম সংস্কৃতি। সেটি শুধু মোম্বাই, আহমেদাবাদ, হায়দারাবাদ, মিরাট বা সুরাটের ব্যাপার নয়, সমগ্র ভারতের। ফলে এটাই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেখানেই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু আছে সেখানে দাঙ্গা হবেই। তাই অবর্ণনীয় দুর্দশার শিকার হলেও জান-মাল ও ইজ্জত-আবরু রক্ষা খাতিরে তাদের সে ঘিঞ্জি এলাকা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় নেই। এটি যেন আরোপিত জেলখানা।

১৯৪৭ সালে ভারত-বিভাগের সময় ব্যাপক দাঙ্গা শুরু হয় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে। সে দাঙ্গা থেকে বাঁচবার তাগিদে ভারতীয় মুসলমানদের মাঝে বিপুল হারে মাইগ্রেশন শুরু হয়। সেটি হয় দুই ভাবে। এক, ভারত থেকে পূর্ব বা পশ্চিম পাকিস্তানে গমন। দুই, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের মাঝের বসতি ছেড়ে ভারতেরই কোন মুসলিম প্রধান শহরে গিয়ে ঘরবাধা। ডেমোগ্রাফির ভাষায় এটি হল, আভ্যন্ত রীণ মাইগ্রেশন। সাতচল্লিশের দাঙ্গার সে মহামারি আপাততঃ কমলেও ভারতীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা আজও থামেনি। এনডেমিক রূপে এখনও সেটি মাঝে মধ্যেই ভয়ংকর রূপ নেয়। তাই পাকিস্তানে যাওয়া থেমে গেলেও আভ্যন্তরীণ মাইগ্রেশন শেষ হয়নি। ফলে বাড়ছে ভারতীয় শহরগুলির মুসলিম প্রধান এলাকার উপর জনবসতির প্রচণ্ড চাপ। অধিকাংশ বড় বড় শহর তাই হিন্দু-মুসলিম এ দুই এলাকায় বিভক্ত। বিভক্তির সে সীমারেখা দাঙ্গাকালে সীমান্ত রেখা রূপে কাজ করে। জিন্নাহর বিখ্যাত 'টু-নেশন' বা দ্বি-জাতি তত্ত্ব নিয়ে অনেকেরই ভীষণ আপত্তি, কিন্তু সে "দ্বি-জাতি" তত্ত্ব বিশাল বাস্তবতা নিয়ে সমগ্র ভারতে আজও প্রচণ্ডভাবে বেঁচে আছে। সেটি বুঝা যায় ভারতের শহরগুলোর দিকে নজর দিলে। এককালে জার্মান, ফ্রান্স, রাশিয়া, পোলান্ডের ন্যায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলোতে ইহুদীরা নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বড় বড় শহরে ghetto তথা ইহুদী বস্তি গড়েছিল। এভাবে তারা নিজেদেরকে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ খৃষ্টান থেকে আলাদা করে ফেলেছিল। এটি শুধু তাদের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে নয়, নিজেদের ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বাঁচানোর তাগিদেও। বহু হাযার বছরের পুরানো হিব্রু ভাষা তার জন্মস্থানে মৃত্যুবরণ করলেও ইউরোপের ইহুদীদের মাঝে তা আজও বেঁচে আছে বস্তুত ইহুদীদের এই 'ঘেটো' জীবনের কারণেই। দেখে মনে হয় ভারতীয় মুসলমানগণও সে স্ট্রাটেজী বা কৌশলই গ্রহণ করেছে। ফল দাঁড়িয়েছে, হিন্দী ভাষা ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রবল জোয়ারের মাঝে উর্দূ ভাষা ও মুসলিম কালচার এখনও বেঁচে আছে এসব মুসলিম ঘেটোগুলিতে।

আজমীরে গিয়ে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতীর মাযারের সম্মুখের বড় রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। দেখি ৬ ফুটের বেশী লম্বা, কালো শিরোয়ানী ও টুপিধারি এক বিশাল ভদ্রলোক রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছেন। বয়স সত্তরের কাছাকাছি। আগ্রহ ভরে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে সালাম পেশ করলাম এবং পরিচয় দিলাম। ভদ্রলোক স্কুলশিক্ষক ছিলেন। এখন অবসরপ্রাপ্ত। তাঁর কাছে আজমীরের মুসলমানদের অবস্থা জানতে চাইলাম। ভদ্রলোক প্রচণ্ড ক্ষোভের সাথে উর্দূতে যা বললেন তার অর্থ হল, 'আপনি এখানকার মুসলমানদের অবস্থা জানতে চাচ্ছেন? তাদের অবস্থা আর কি বলব? এই যে রাস্তার উপর সারি সারি বহু দোকান দেখছেন এর একটিও মুসলমানদের নয়। এর সবগুলো হিন্দুদের। মুসলমানদের কাজ এসব দোকানে মুটেগিরি করা। অনেকের কাজ এ মাযারে ভিক্ষে করে খাওয়া। আর চাকুরি-বাকুরি? আমার চারটি সন্তান। সবাই গ্রাজুয়েট। কিন্তু কারো কোন চাকুরি নাই।' রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। দেখলাম, হতাশা আর কাকে বলে? আজমীরে মুসলিম জনসংখ্যা শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ, কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে তারা পঙ্গু। সত্যিই, মাযারে অনেককে ভিক্ষা করতে দেখলাম। কেউ কেউ মাযারের ধারে বিছানা পেতে কাওয়ালী গেয়ে পয়সা উপার্জন করেছে। সারা ভারতের নানা স্থান থেকে আসা মানুষের সেখানে ভীড়। সেখানে বাংলাদেশীরাও আসে। পরিচয় হল পশ্চিম বাংলা থেকে আগত কিছু গ্রামীণ মানুষের সাথে।

আগ্রায় গিয়ে তাজমহল দেখার পর এক দোকানে ঢুকলাম তাজমহলের রেপ্লিকা কিনতে। চেহারা সুরত ও পরিচয়ের মাধ্যমে বুঝলাম দোকানদার মুসলমান। বয়স সম্ভবত চল্লিশ হবে। তাঁকেও জিজ্ঞেস করলাম আগ্রার মুসলমানদের অবস্থা। ভদ্রলোকের কাছ থেকে যা জানলাম সেটিও চরম হতাশার। বললেন, 'আমার পরিবারে কয়েকজন গ্রাজুয়েট, একজন ডাক্তার। কিন্তু কারোই কোন চাকুরি নেই।' জিজ্ঞেস করলাম উত্তর প্রদেশের রাজনীতি নিয়ে। সেখানেও নিদারুণ হতাশা। এককালে মুসলমানগণ কংগ্রেস করতো। তারপর জনতা দল। এরপর ধরেছিল মোলায়েম সিংয়ের সমাজবাদী দল। কেউ কেউ যোগ দিয়েছিল মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টিতে। কিন্তু কিছুতেই কোন কাজ হচ্ছে না। রাজনীতিবিদদের ব্যস্ততা নিছক ক্ষমতায় যাওয়া নিয়ে, মুসলমানদের সমস্যার সমাধান নিয়ে কারো কোন মাথা ব্যথা নেই। মুসলমানের সমস্যা পরিণত হয়েছে নিছক রাজনৈতিক পণ্যে। প্রশাসন, রাজনীতি, মিডিয়া, বুদ্ধিজীবীদের মাঝে মুসলিম বিরোধী সাম্প্রদায়িকতা এতটাই প্রকট যে তার সমাধান এতটা সহজ নয়। মুসলমানদের প্রতি ঘৃণাই এখান সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সামাজিক রীতি। সে ঘৃণার বিষ দেশ জুড়ে ছিটানো হয়েছে প্রশাসন, ছাত্র-শিক্ষক, পুলিশ, মিডিয়া ও সাধারণ মানুষের মধ্যে। সে ঘৃণা থেকেই মাঝে মধ্যে জ্বলে উঠে মুসলিম বিরোধী ভয়ানক দাঙ্গা। শুকনো কাঠের উপর পেট্রোল ছিটানো থাকলে তাতে আগুণ জ্বালাতে কি বেশী কিছু

লাগে? সে কাঠের উপর দূর থেকে সিগারেটের পিছনটুকু ছুঁড়ে ফেললেই তাতে বিস্ফোরণ শুরু হয়। ভারতের প্রকৃত অবস্থা মূলত তাই। তাই গোদরাতে কে বা কারা ট্রেনে বোমা ফাটালো সেটি জানা না গেলে কি হবে, সে খবরটুকু ছড়িয়ে পড়াতেই ব্যাপক মুসলিম নিধন শুরু হয়ে গেল গুজরাটে। হাযার হাযার মুসলমান তাতে নিহত হল। ধর্ষণের উৎসব শুরু হয়ে গেল। অথচ পরে তদন্তে জানা গেল, ট্রেনে সে বিস্ফোরণের জন্য কোন মুসলমান দায়ী ছিল না। সারা ভারতে এ যেন এক বিস্ফোরণ-উন্মুখ অবস্থা। এথেকে মুক্তির জন্য চাই বিশাল সমাজ বিপ্লব। চাই, হিন্দুদের দর্শন ও চিন্তারাজ্যে পরিবর্তন। শুধু রাজনৈতিক দলবদলে তা সম্ভব নয়। তাই বিজেপির বদলে কংগ্রেস আসছে কিন্তু দাঙ্গা থামছে না। এ অবস্থার প্রতিকারে চাই শত শত সত্যসেবক বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ ও সমাজসংস্কারক। কিন্তু ভারতের বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে সেটিরই প্রচণ্ড অভাব। কোন নেতা বা দলকে নিছক ভোট দিয়ে পাহাড়সম এ সমস্যা থেকে মুক্তির সম্ভাবনা নেই। সাতচল্লিশের পূর্বেই বহু মুসলিম চিন্তানায়ক হিন্দুদের মনের এ পরিচয়টি জেনেছিলেন। ফলে তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাতে অন্ততঃ পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মুসলমানগণ ভয়াবহ এ বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে গেছেন।

ভারতীয় মুসলমানগণ আজ নানা ভাবে নীরবে পিষ্ট হচ্ছে। রাজনীতির ময়দানে মাঝে মধ্যে এসব পিষ্ট মানুষের কিছু ক্রন্দন শোনা যায়, প্রতিবাদও উঠে। কিন্তু তাতে সে দুঃখের বোঝা নামে না। মুসলমানেরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে সামনে এগুবে তাদের সামনে সে পথও নেই। আলীগড়, মুরাদাবাদ, আহমেদাবাদ, এলাহাবাদ বা মোম্বাইয়ের মত কিছু কিছু শহরের মুসলমানেরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে সামনে এগুলেও হঠাৎ দাঙ্গা বাধিয়ে তাদের সারা জীবনের সম্বলকে মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দেয়া হয় বা লুট করে নেয়া হয়। সে দুর্ভোগ নিয়েও ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় কোন লেখালেখি নেই। সরকার মাঝেমধ্যে ঘটা করে কমিটি করে মুসলমানদের সমস্যা জানার জন্য। রিপোর্টও বের হয়। তাতে সুপারিশও থাকে। কিন্তু সেগুলো কখনও কার্যকর করা হয় না। জয়পুরে আমাদের অর্থনীতি পড়াতেন ভারতের একজন নামকরা অর্থনীতিবিদ। উনি এক সময় হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় এবং এমআইটিতেও ছিলেন। সে সময় সেখানে তার সাথে ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংও ছিলেন। মনমোহন সিং হলেন উনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সে সময় ছিলেন ভারতের অর্থমন্ত্রী। মাঝে মধ্যে মনমোহন সিংয়ের সাথে তার ফোনে আলাপ হত সেটি বলতেন। উনি কোর্সের ভিজিটিং প্রফেসর রূপে আমাদেরকে পড়াতেন হেলথ ইকোনমিকস। কেরালার মানুষ, মনে হত অর্থনীতির গুরু। পরে তিনি কেরালায় আন্তর্জাতিক মানের একটি পোষ্টগ্রাজুয়েট ইন্সটিটিউটও খুলেছেন। উনি থাকতেন আমাদের ক্যাম্পাসেই। মেসে রাতের খাবার শেষে টেবিলে বসে উনার সাথে মনখুলে নানা বিষয়ে নানা আলাপ করেছি। এমনও হয়েছে, খাওয়া শেষে সবাই চলে গেছে কিন্তু আমরা দুই জন আলাপ চালিয়ে গেছি। প্রতিদিন আমার কাজ ছিল, বিকেলে লাইব্রেরীতে গিয়ে ভারতীয় পত্রিকাগুলোর খবর এবং সেসাথে রাজনৈতিক কলামগুলো পড়া। সে কাজ কখনও ক্লাসের ফাঁকেও করতাম। সেখানে থাকতো The Time of India, The Hindustan Times, The Hindu, The Pinoneer, India Today, The Front Line ইত্যাদি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা। হিন্দি পত্রিকাও ছিল। আমি ধীরে ধীরে হিন্দি পত্রিকা পড়ার চেষ্টা করতাম। তখন চেষ্টা শুরু করেছিলাম হিন্দি ভাষা পড়তে শেখার। পত্রিকাগুলো পড়া যেন আমার নেশায় পরিণত হয়েছিল। কিন্তু প্রচণ্ড হতাশ হতাম এসব পত্রিকার বুদ্ধিবৃত্তিক অসততা দেখে। উক্ত প্রফেসরের সাথে আলাপে আমার সে হতাশার কথা নিঃসংকোচে বলতাম। আমার কথার যথার্থতা প্রমাণে প্রকাশিত বিভিন্ন নিবন্ধের উদাহরণও দিতাম। ভারতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টে ভারতীয় মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা যে অতি দুঃখজনক তা নিয়ে আমার ক্ষোভের কথা জানাতাম। আলোচনায় আনতাম, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, পাকিস্তান ও নেপালের প্রতি ভারত সরকারের দাদাগিরি নিয়ে। দেখতাম, তিনি আমার সাথে এসব বিষয়ে একমত। মনে হত আমার সে আলোচনা তিনি উপভোগ করছেন। আমি এই প্রথম একজন শিক্ষকের সাথে মনের কথা খুলে বলবার সুযোগ পেয়েছিলাম। এ সুযোগ এর আগে কোন কলেজে, এমনকি স্কুলেও পায়নি। আমার স্কুল ও কলেজ জীবনে তো শিক্ষকের সাথে কথা বলতেও ভয় হত। মনে হত, উনারা যেন লোহার তৈরি মানুষ, হাসতেও জানেন না। কিন্তু জয়পুরে যাদের শিক্ষক রূপে পেয়েছিলাম তারা সম্পন্ন ভিন্ন জগতের। ভারতের অনেক নামকরা শিক্ষকদের সেখানে আনা হত। অনেকে আসতেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। আমাদের ক্লাসের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশটাই ছিল ভিন্ন। বলতে দ্বিধা নেই, জয়পুরের ৬টি মাস ছিল আমার সমগ্র শিক্ষা জীবনের সবচেয়ে আনন্দপূর্ণ সময়। শিক্ষাও যে এতটা আনন্দময় ও উপভোগ্য হতে পারে, তা এর আগে আমি বুঝতে পারিনি।

আবার ফিরে আসি মূল বিষয়ে। অনেকের মত, ভারতের প্রশাসনিক কর্মকর্তারা দেশের কট্টোর সাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিদদের চেয়েও সাম্প্রদায়িক। ভারতীয় সরকারী কর্মচারীদের বহুবার মুখোমুখি হয়েছি মোম্বাই ও দিল্লী বিমান বন্দরে। ইরানে যখন চাকুরি করতাম দেশে ফেরার পথে মোম্বাইতে প্রায়ই ট্রানজিট থাকতো। ফলে বিমান বন্দরের ইমিগ্রেশন পুলিশের মুখোমুখি হয়ে বেরুতে হত। আমাদের বাংলাদেশী পাসপোর্ট দেখার পরই তাদের দেহের ভাষা পাল্টে যেত। তখন বুঝা যেত তাদের মনের মুসলিম বিদ্বেষ। আমরা দেশে-বিদেশে আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট নিয়ে ঘুরাফেরা করি সেটিতেও যেন তাদের ক্ষোভ। তাদের ক্ষোভের সে সাথে আফসোসের কারণ বোধ হয় এই, ভারতের প্রায় ২০ কোটি মুসলমানকে যেভাবে খাঁচায় পুরে রেখেছে, বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের মুসলমানদের ক্ষেত্রে সেটি পারিনি। অথচ ১৯৪৭ সালের আগে সেটিই তো তাদের প্রবলতম বাসনা ছিল। সমুদ্রের তলায় লুকিয়ে থাকা বিশাল বরফ টুকরো যেমন ক্ষুদ্র শির তুলে নিজের গোপন উপস্থিতিটি জানিয়ে দেয়, এসব ইমিগ্রেশন পুলিশরাও তাদের মুসলিম বিদ্বেষ ও তাচ্ছিল্যের ভাবটি জানিয়ে দিতে কখনও ভুলতো না। ভারতীয় পত্রিকায় বহুবার প্রকাশ পেয়েছে, কি করে দাঙ্গার সময় পুলিশ গুণ্ডাদের সাথে মিলে মুসলমান হত্যা করে। মিরাটের রায়টে এ পুলিশরাই তাদের কালিমালিপ্ত ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় যোগ করেছিল। তারা মুসলিম নিধন অভিযানে নিহত মুসলমানদের সংখ্যা ভারতবাসী ও বিশ্ববাসীর সামনে কম করে দেখাবার জন্য শত শত লাশ ক্যানালে ফেলেছিল। মুসলিম নরনারীর সেসব লাশের ছবি ভারতীয় পত্রিকাতেও ছাপা হয়েছিল। তবে নিজেদের চরিত্রে কালিমা লিপ্ত করার কাজটি ভারতীয় পুলিশের কাছে কখনই থেমে যায়নি। তাদের সে চরিত্রটি আবার ধরা পড়ে বাবরী মসজিদ ধ্বংসের সময়। ধরা পড়েছে মোম্বাই ও গুজরাটে মুসলিম নিধনযজ্ঞের দিনগুলিতে। হাযার হাযার দুস্কৃতিকারি যখন অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ ধ্বংস করছিল, পুলিশ তখন কাছে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য উপভোগ করেছে। মসজিদ ধ্বংসের সে ঘটনাটি দুয়েক ঘণ্টার কাজ ছিল না, চলেছে বহু ঘণ্টা ধরে। বিশ্বের যে কোন আইনে সেটি ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ, এমনকি ভারতীয় আইনেও। মসজিদ রক্ষার পক্ষে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের রায়ও ছিল। কিন্তু ভারতীয় পুলিশ সে অপরাধে শামিল হাযার হাযার মানুষের মধ্য থেকে একজনকেও

গ্রেফতার করতে পারিনি, আদালতে তুলে শাস্তিরও ব্যবস্থা করতে পারিনি। মুসলিম বিরোধী গণহত্যা, ধর্ষণ ও মসজিদে ধ্বংসের মত অপরাধের সাথে ভারতীয় পুলিশ যে কতটা জড়িত এ হল তার নজির। যেখানেই গেছি তাই পুলিশ নিয়ে প্রচণ্ড হতাশা দেখেছি। মুসলিম বিরোধী দাঙ্গার সময় কিভাবে রাজনীতিবিদরা অপরাধে জড়িত হয়ে পড়ে সে বিবরণও পড়েছি। সম্প্রতি গুজরাটের এক পুলিশ অফিসার ভারতীয় আদালতে বলেছে, কিভাবে সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পুলিশ অফিসারদের বলেছিল, 'এবার মুসলমানদের একটু মজা দেখাবার সুযোগ দাও।' গুজরাটের সে দাঙ্গায় হাযার হাযার মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছিল। ধর্ষিতা হয়েছিল বহু মুসলিম নারী। বহু শিশুকে সে দাঙ্গায় জ্বলন্ত আগুনে ফেলা হয়েছিল।

মুসলিম বিরোধী হত্যাকাণ্ডগুলির সাথে যে শুধু অশিক্ষিত গুণ্ডা প্রকৃতির মানুষ জড়িত হয় তা নয়। জড়িত হয় ভদ্রবেশী শিক্ষিতরাও, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারীরাও। বেরেলীর এক ডাক্তার বলেছেন, কিভাবে তার মহল্লার এক প্রফেসরকে বন্দুক দিয়ে হত্যা করে তার শিক্ষিত প্রতিবেশী। সমস্যা শুধু এটুকু নয়, দাঙ্গা বাধিয়ে মুসলমানদের হত্যা ও তাদের সম্পদ শুধু দখলে নেয়া হচ্ছে না, বরং দখলে নেয়া হচ্ছে মুসলমানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও। ফলে পঙ্গু করার ব্যবস্থা হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রেও। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুসলমানদের অর্থে। তখন হিন্দুদের জন্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল বেনারসের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। ভারতীয় মুসলমানদের মাঝে শিক্ষার বিস্তারে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা বিশাল। বলা হয়, পাকিস্তান আন্দোলন গড়ে উঠেছিল আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের হাতে। কিন্তু এখন আলীগড় পরিচিত মুসলিম বিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য, মুসলমানদের মাঝে শিক্ষাবিস্তারের জন্য নয়। বিখ্যাত সে বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্রই বদলে দেয়া হয়েছে। এখন সেটি হিন্দুদের দখলে। শিক্ষক ও ছাত্রদের অধিকাংশই এখন হিন্দু। সেখান থেকে পাশ করা এক ডাক্তারের সাথে আলাপে জেনেছিলাম, মুসলিম বিদ্বেষী প্রফেসরগণ তাকে কিভাবে পোষ্ট গ্রাজুয়েশন কোর্সে ঢুকতে দেয়নি। অথচ বেনারসের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্রে সে পরিবর্তন আনা হয়নি। মুসলমানগণ যদি নিজেদের পশ্চাদপদ জনগণের কল্যাণে বিদেশ থেকে দান-খয়রাতের অর্থ তুলে কোন স্কুল বা কলেজ প্রতিষ্ঠা করে তবে তাতেও হিন্দুরা ভাগ দাবী করে বসে। সেসব প্রতিষ্ঠানে হিন্দুদের ভর্তি করতে বাধ্য করা হয়। সরকারী অফিস থেকে চিঠি পাঠানো হয়, ভারত সেকুলার দেশ, এখানে শুধু মুসলমানদের জন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা চলবে না।

ভারতীয় সরকারী কর্মচারীরা যে কতটা সাম্প্রদায়িক ও মুসলিম বিদ্বেষী সেটি চিত্তরঞ্জন দাশের ন্যায় অনেক রাজনীতিবিদও হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন। ভারতীয় প্রশাসন ও রাজনীতিতে মুসলমানদের বঞ্চনার ইতিহাস যে কত গভীর ও করুণ সেটি বহু বিবেকমান ভারতীয় হিন্দু রাজনৈতিকও বুঝতেন। তাদের মধ্যে সেরূপ এক বিরল ব্যক্তিত্ব ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি দেখলেন, বাংলার জনসংখ্যার গরিষ্ঠ জনগণ হল মুসলমান। অথচ সরকারী চাকুরিতে তাদের হিস্যাটি শতকরা তিন ভাগও নয়। এ অবিচার বুঝার জন্য কি মহামানব হওয়া লাগে? কিন্তু সে ন্যূনতম মানবতা অধিকাংশ হিন্দু রাজনীতিবিদ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের মত সাহিত্যিক বা বুদ্ধিজীবীদেরও ছিল না। ফলে সে ভয়ানক অবিচারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র একটি বাক্যও লেখেননি। অথচ তাঁরা হিন্দুদের কল্যাণে সে সমাজের অনেক অনাচার নিয়ে কলম ধরেছেন। চিত্তরঞ্জন দাশই প্রথম সেটির সুরাহা করার লক্ষ্যে চাকুরিতে মুসলমানদের অধিক হারে নিয়োগের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তাতে তেলেবেগুণে জ্বলে উঠে প্রশাসনের হিন্দু কর্মচারীরা। তারা বস্তুত ভারতীয় প্রশাসনকে কব্জা করেছিল ঔপনিবেশিক ব্রিটিশদের নিষ্ঠাবান সেবক রূপে। ভারত স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু নিজেদের অধিকৃত সে স্থানকে ধরে রাখতে চায় নতুন প্রজন্মের জন্য। এটি তাদের প্রতিষ্ঠিত কায়েমী স্বার্থ। মুসলিম সন্তানকে সে চাকরিতে ভাগ দিয়ে তারা নিজেদের সন্তানকে বঞ্চিত করতে চায় না। এমন এক কায়েমী স্বার্থ চেতনার ফলে চিত্তরঞ্জন দাশ এবং সোহরাওয়ার্দী মিলে হিন্দু-মুসলিম বৈষম্য নিরসনে যে বেঙ্গল প্যাক্ট করেছিলেন, সেটি ডাস্টবিনে গিয়ে পড়ে। একই কারণে আজও বিফল হচ্ছে মুসলিম-বঞ্চনা প্রতিকারের সকল উদ্যোগ।

দেখলাম, ভারতীয় হিন্দুদের মনে মুসলিম ভীতিও অতি প্রকট। সে ভীতিটি প্রকটভাবে ধরা পড়ে ভারতীয় পত্রিকার পাতায়। তাদের ভয়, মুসলিম জনসংখ্যা বিস্ফোরণে ভারতে তারা সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে। উগ্রবাদী হিন্দুদের পক্ষ থেকে সরকারের উপর প্রবল চাপ, মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণে আনা হোক। সে দাবী নিয়ে হিন্দুস্থান টাইমস, টাইম্‌স অব ইন্ডিয়া, পাইয়োনীয়ার ও ইন্ডিয়া টুডের ন্যায় পত্রিকাগুলোতে বহু নিবন্ধ পড়েছি। লক্ষ্য করেছি, এ ভীতি বাঁচিয়ে রাখতে এ পত্রিকাগুলো এ বিষয়ে নিয়মিত রিপোর্ট ছাপতো। এসব নিবন্ধে যে বিষয়টিকে তুলে ধরা হত তা হল, বাংলাদেশ থেকে নিয়মিত হাযার হাযার মানুষ ভারতে প্রবেশ করছে। তারা দাবী করত যে, এর ফলে নাকি পশ্চিম বাংলা ও আসামের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোর হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা লোপ পেতে চলেছে। তাদের ভয়, এসব এলাকা নিয়ে অচিরেই আরেকটি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবী উঠবে। ভারত সরকার বাংলাদেশ ঘিরে যেভাবে কাঁটা তারের বেড়া দিচ্ছে তার কারণ তো এমন এক মুসলিম ভীতি। আদমশুমারীতে মুসলিম জনসংখ্যা কম করে দেখানোর জন্য পশ্চিম বাংলা ও আসামের বহু মুসলিমকে তারা ভারতীয় নাগরিক হিসাবে নথিভুক্তও করছে না। বলছে তারা ভারতীয় নাগরিক নয়, এসেছে বাংলাদেশ থেকে। বিজেপি, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, শিবসেনা, বজরং দলের ন্যায় উগ্র মুসলিম বিদ্বেষী দলগুলো দাবী করছে এসব মুসলমানদের সত্তর বাংলাদেশে পাঠানো হোক। অতীতে ভারত সরকার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাদের ঠেলে পাঠানোর উদ্যোগও নিয়েছিল। এটিকে তারা 'পুশ ইন' বলতো। কিন্তু সেটিও সফল হয়নি। দেখলাম বাংলাদেশ নিয়েও তাদের প্রচণ্ড ভয়। এরশাদের সময় চীন থেকে বাংলাদেশ সরকার কয়েকখানি মিগ খরিদ করেছিল। দেখি তা নিয়ে সাপ্তাহিক 'ইন্ডিয়া টুডে' তে এক গুরুতর নিবন্ধ। লেখকের মূল প্রশ্ন, বাংলাদেশের আবার মিগ কেনার কেন প্রয়োজন দেখা দিল? নিশ্চয়ই সেগুলি ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য। ব্রিটিশরা যখন ভারত শাসন করতো তখন হায়দারাবাদের নিযাম ছিল বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। কিন্তু তাকে একখানি কামানও কিনতে দেয়নি। বড়জোর কিছু পুলিশ পালতে দিত। ফলে ১৯৪৭ সালে হায়দারাবাদের নিযাম যখন ভারতে যোগ না দিয়ে স্বাধীন থাকার মনস্থ করল তখন ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভ ভাই প্যাটেলকে হায়দারাবাদ দখলে কোন যুদ্ধ করতে হয়নি। যুদ্ধের ভয় দেখিয়েই মুহূর্তের মধ্যে সে রাজ্যকে তারা ভারতভুক্ত করেছিল। হায়দারাবাদের নিযামের রাজ্যের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সরকার যেমন নিজেদের পণ্য ও সৈন্য চলাচলের জন্য ইচ্ছামত রেললাইন বা ট্রানজিট গড়েছিল ভারত মূলতঃ সেটিই চাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে। একাত্তরের আগে এমন দাবী তারা মুখেও আনতে পারিনি। অথচ এখন সেটি সহজেই পাচ্ছে। তাই বিপদ শুধু ভারতের মুসলমানদের জন্য নয়। মুসলমানদের শক্তিহানী করার যে প্রকল্প ভারতে দেখলাম সেটি এখন গ্রাস করছে বাংলাদেশকেও।

[লেখক : লন্ডন প্রবাসী ডাক্তার]

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন যুগান্তকারী সেই মানুষগুলো

এস.এম. রিয়াজুল ইসলাম

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না পশ্চিমা দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসের, যার কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছিলেন গনিতবিদ এবং এথেন্সে পশ্চিমা বিশ্বের প্রথম উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা আরেক গ্রীক দার্শনিক প্লেটো। এই প্লেটোর ছাত্র ছিল আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেটের শিক্ষক এরিষ্টেটল। তাহলে? সক্রেটিসই বিশ্ব ইতিহাস পরিবর্তনে রেখে গেছেন অসাধারণ প্রভাব। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন ভালো ছাত্র হিসাবে কখনই তুলে ধরতে পারেননি নিজেকে। এই সব অতি পরিচিত ব্যক্তি ছাড়াও আরো অনেক অসাধারণ মানুষ এসেছেন পৃথিবীতে যারা কিনা এই আধুনিক বিশ্ব গড়ার পিছনে রেখেছেন বিস্ময়কর সব অবদান, অথচ তাদেরও ছিল না কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। চলুন তাহলে দেরি না করে তাদের উপর একটু চোখ বুলিয়ে নিই।

মাইকেল ফ্যারাডে (১৭৯১-১৮৬৭)

বই বাঁধাইকারী থেকে বিজ্ঞান উৎপাদনের যন্ত্র

আপনি নিশ্চয় বিদ্যুৎ-চালিত বেশ কিছু যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন, নিশ্চয় ম্যাগনেটিসম বা চৌম্বকত্বের উপরও কিছু জানেন, নিশ্চয় জৈব যৌগ বেনজিনের নাম শুনেছেন বা এর উপর শ্রেণীকক্ষে লেখাপড়া করেছেন। তাহলে আসুন আমরা জনাব ফ্যারাডেকে বিশেষভাবে সম্মান জানাই। কারণ, এই সব তাঁরই আবিষ্কার! মাইকেল ফ্যারাডে প্রকৃতপক্ষেই একজন প্রতিভা এবং বিশ্ব-ইতিহাসের প্রভাবশালী বিজ্ঞানীদের একজন। অথচ, এই অসাধারণ কর্মদক্ষতার মানুষটির প্রথাগত কোন শিক্ষাই ছিল না! শিল্পনগরী লন্ডনের এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম এই ফ্যারাডের, আর তাই পয়সা দিয়ে বিদ্যালয়ের পাঠ নেওয়া হয়নি তার কখনই। পরিবর্তে ১৪ বছর বয়সে শিক্ষানবিশ হিসাবে কাজ নেন স্থানীয় একটি বই বাঁধাইয়ের দোকানে। সেখানে তিনি বছর সাতেক কাজও করেন। এই কাজ করার সময় যে সমস্ত বই তিনি পেতেন সেগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে নিতে ভুলতেন না। কোন কোন বই তার কাছে এতো ভালো লেগে যেত যে সেগুলোতে রীতিমতো ডুবে যেতেন। এর মধ্যে বিজ্ঞানের বইগুলো তার কাছে দিনে দিনে প্রিয় হয়ে উঠতে লাগলো। এরই ধারাবাহিকতায় নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে সে সময়ের লন্ডনের বিখ্যাত বিজ্ঞানী হামফ্রি ড্যাভির কাছে যান এবং হামফ্রি ড্যাভির ল্যাব সহকারী হিসাবে কাজ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। সত্যি কথা, একজন ফ্যারাডের কোন ধরণের বিজ্ঞান চর্চার অভিজ্ঞতা ছিল না, অথচ তিনি সে সময়ের বিখ্যাত বিজ্ঞানীর ল্যাবে কাজ করতে চেয়েছিলেন। যাই হোক, তিনি পরের বছর কাজ পেয়েছিলেন এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তৈরি করেন বৈদ্যুতিক মোটর, বৈদ্যুতিক জেনারেটর, বুনসেন বার্ণার, ইলেকট্রোলাইসিস, ইলেকট্রোপ্লাটিং। তিনিই আবিষ্কার করেন বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় আবেশ, বেনজিন। চৌম্বকক্ষেত্রের কাঠামো কেমন হবে সেটাও তিনি দেখান, ধাতব ন্যানো-কণাও (মনে করা হয় ন্যানো সায়েন্সের জন্য তার মাধ্যমেই) তারই আবিষ্কার। এছাড়াও আরো জটিল জিনিষ তিনি আবিষ্কার করেছেন, বলা যায় তিনি ছিলেন বিজ্ঞান উৎপাদনের যন্ত্র!

সারা জীবনেও কারো কাছ থেকে ফ্যারাডে কিছু শিখেন নাই। একাধারে দিয়ে গেছেন আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতাকে। রেখে গেছেন অসংখ্য অবদান। যেমনটি আগেই বলেছি ড্যাভি ছিলে সে সময়ের বিশ্ব সেরা বিজ্ঞানী যিনি কিনা শুরুতে ফ্যারাডের চাকুরিই দিতে চাননি। সেই ড্যাভিকে জিজ্ঞাসা করে হয়েছিল বিজ্ঞানে আপনার সেরা আবিষ্কার কোনটি? উত্তরে তিনি বলেছিলেন 'মাইকেল ফ্যারাডে'!

উইলিয়াম হার্শেল (১৭৩৮-১৮২২)

সুরকার থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানী

উইলিয়াম হার্শেল ১৭৩৮ সালে জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি মিশে ছিলেন মিউজিকের সাথে। বাজাতেন সেলো, সানাই, অর্গান, হার্পসিকর্ড আর সেই সাথে নিজেকে পরিচিত করে তোলেন বিশ্বমানের এক মিউজিশিয়ান হিসাবে। অসংখ্য সঙ্গীত-কাজের মধ্যে ছিল ২৪টি সিম্পফোনি, করেছেন অনেক সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং প্রচুর চার্চ-সঙ্গীত। সঙ্গীতের উপর কাজ করতে গিয়ে তিনি গণিত এবং লেন্সের উপরও আগ্রহ খুঁজে পান। একসময় ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী নেভিল মাসকেলাইনের সাথে পরিচিত হওয়ার পর তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর ইন্টারেস্ট আরো জোরদার হয়। আকাশের দিকে তাকিয়ে অজানা জিনিষ খুঁজে পাওয়ার ইচ্ছাটা তার অনেক বেশি বেশি হয়ে আসলেও তার কোনো টেলিস্কোপ ছিল না! সমাধান হিসাবে নিজেই একটা টেলিস্কোপ তৈরির বাসনা নিজের মনে নিয়ে আসেন এবং সেই লক্ষ্যে কাজও শুরু করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর প্রাতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষাই তার ছিল না।

যাই হোক, তিনি টেলিস্কোপের জন্য আয়না এবং লেন্সটাকে সুন্দর করে তৈরি করার জন্য সেগুলো দিনে ১৬ ঘন্টা করে পোলিশ করতে লাগলেন। টেলিস্কোপ তৈরি হলে তিনি গ্রহ-নক্ষত্রদের দেখতে শুরু করলেন। এবং আকাশে বিচরণ করতে থাকেন অবাধে, তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকেন হরেক রকমের গ্রহ, নক্ষত্র। কয়েক বছর পরে হঠাৎ তিনি মজার এক জিনিষ দেখতে পান। যেটি ঠিক নক্ষত্রও নয় আবার কোন ধূমকেতুও নয়। তার এই পর্যবেক্ষণটি তিনি রাশিয়ান এক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নিকট পাঠান। এর মধ্য দিয়ে তিনি আবিষ্কার করেন আমাদের সৌরজগতের একটি গ্রহ, ইউরেনাস! নিজেকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন একজন স্বনামধন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে। ইউরেনাস আবিষ্কার করে থেমে থাকেননি হার্শেল। একাধারে তিনি আবিষ্কার করেছেন ইউরেনাসের ২টি মূখ্য চাঁদও যাদের নাম টিটানিয়া এবং অবেরণ। আবিষ্কার করেছেন শনি গ্রহের ২টি চাঁদ। তিনিই আবিষ্কার করেছেন ইনফ্রারেড বিকিরণ। সাগর প্রাণী কোরালের বিশেষ ধরণের বৈশিষ্ট্য বের করতে তিনি আবিষ্কার করেন এক ধরণের মাইক্রোস্কোপ। এভাবে মিউজিশিয়ান হিসাবে জীবনের অর্ধেক পার করে এসে কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও হার্শেল নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে।

নিভাস রামানুজন (১৮৮৭-১৯২০)

জন্ম থেকেই গণিতবীদ

অসাধারণ গণিত প্রতিভার অধিকার ছিলেন দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়া রামানুজন। অথচ তেমন কোন শিক্ষা ছাড়াই তিনি আবিষ্কার করেছেন মজার মজার সব গণিত। বয়স যখন ১০ তাঁর বাবা-মা ছেলের গণিত প্রতিভা আঁচ করতে পেরে তাকে একটি এ্যাডভান্সড

ত্রিকোনমিতির বই কিনে দেন। কিন্ত রামানুজন দেখলো এখান থেকে তেমন কিছু শিখার নেই তার। কারণ ওগুলো ছিল খুবই সহজ। তাই নিজেই তৈরি করতে লাগলেন গণিতের বাস্তবধর্মী সব থিওরি। বয়স হলে তিনি কলেজে ভর্তি হন কিন্তু পরীক্ষায় পাস করলেন না। কারণ, একসাথে ইতিহাস, বায়োলজি এবং অন্য সব বিষয়ে ফোকাস করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে, অবসর সময়ে তিনি আবিষ্কার করতে লাগলেন সংখ্যাতত্তের নানা সুত্র!

দারিদ্রতা কখনই তার পিছু ছাড়লো না। তবে তার নিজের আবিষ্কারের উপর ছিল অনেক আত্মবিশ্বাস। তাই তার নিজের তৈরি গণিতগুলো ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষার করার জন্য পাঠাতে লাগলেন ইন্ডিয়া এবং ইংল্যান্ডের বড় বড় সব গনিতবেত্তাদের নিকট। বেশিরভাগ সময় ঐসব অংকগুলোকে কেবল হক্স বলে উড়িয়ে দিয়েছেন অনেকেই। আবার অনেকেই একটা ছোঁকরা আর কি তৈরি করবে এই ভাবনা থেকেই না পড়েই রায় দিয়েছেন, এসব কিছু না। আবার অনেকেই একেবারেই বুঝেন নি যে, রামানুজন তাঁর গণিতে আসলে কি বলতে চেয়েছেন। অনেকেই দেখেছেন রামানুজনের দেওয়া কিছু থিওরি আগে থেকেই কেউ হয়তো করে দিয়ে গেছেন।

যাই হোক, রামানুজনের দেওয়া থিওরি ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সটির প্রফেসর হার্ডি দেখলেন এবং বুঝলেন রামানুজন গণিতের একজন জীবন্ত কিংবদন্তি। অধ্যাপক হার্ডি রামানুজনকে ইংল্যান্ডে যাওয়ার জন্য আহবান করলেন। কিন্ত রামানুজন বিদেশের মাটিতে যেতে রাজি হলেন না। তবে সাদা চামড়ার একজন প্রফেসর রামানুজনকে সম্মান দেখানোর ফলে, ভারতীয় গণিতবেত্তাদের নিজেদের অবস্থান বুঝতে আর দেরি হলো না। তারাও রামানুজনকে যথাযথ সম্মান দিলেন; উপমহাদেশে যা প্রায়ই ঘটে আর কি! পরবর্তীতে অনেক বুঝানোর পরে রামানুজন ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। গণিতের এই যাদুকরের থিওরি ব্যবহৃত হয় স্ট্রীং থিওরিতে, ক্রিস্টালোগ্রাফিতে, তথ্যের নিরপত্তা প্রদানে। লনডাও-রামানুজন ধ্রুবক, থিটা ফাংশন, মক থিটা ফাংশন, রামানুজন মৌলিক, রামনুজনের যোগ, রামানুজনের মাষ্টার থিওরি, রামানুজন-সোল্ডার ধ্রবক, রোজার-রামানুজন আইডেনটিটি আরো কত কত সব থিওরি। রামানুজনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এই যে বিরাট গণিত প্রতিভা এসবের রহস্য কি? উত্তরে বলেছিলেন আমি কিছু জানি না, সপ্নে বিদ্যাদেবি আমাকে যে সব বলে দিয়ে যায়, আমি ঘুম থেকে উঠে সে সব লিখে রাখি। যেভাবেই যা ঘটুক না কেন রামানুজন যে গণিতের অসাধারণ এক প্রতিভা ছিলেন এতে কারো সন্দেহ নেই বিন্দুমাত্র। প্রফেসর হার্ডি রামানুজনের গণিত প্রতিভাকে নিউটন এবং আর্কিমিডসের সংগে তুলনা করেছিলেন। গণিতের এই যাদুকর মাত্র ৩২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, নতুবা বিশ্ববাসী হয়তো অনেক কিছুই পেত।

ম্যারি এ্যানিং (১৭৯৯-১৮৪৭)

ঝিনুক কুড়ানী থেকে জীবাশ্মবিজ্ঞানী

'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলেও পাইতে পারো অমুল্য রতন'। সেরকমই রতন আমাদেরকে এনে দিয়েছিলেন সাগর তীরে ঝিনুক কুড়িয়ে বেড়ানো ব্রিটিশ নারী ম্যারি এ্যানিং। চার্চের রবিবারের পাঠ ছাড়া তেমন কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তার ছিল না। কিন্তু পরিশ্রম করে, জীবনের ঝুকি নিয়ে সাগরের জোয়ার-ভাটাকে জয় করে তিনি গড়ে তুলেছিলেন শামুক-ঝিনুকের ব্যবসা। সময়ের সাথে কিছুটা পরিচিতিও পেয়েছিলেন এতে। অবশ্য অনেকেই সমালোচনা করতেও ছাড়েনি; ম্যারি এ্যানিংকে কটাক্ষ করতো এই ঝিনুক বিক্রি নিয়ে। তবে, এসবে তাঁর কিছু আসে যায়নি, তিনি এগিয়ে গেছেন তার নিজের পরিকল্পনা নিয়ে। জীবাশ্ম সংগ্রহ করে গেছেন আপন মনে।

অবশেষে তার পুরস্কার পান তিনি। একটি সুন্দর দিনে, তার ভাই তাদের বাড়ির নিকটে একটি খাঁড়া বাঁধে মাথার খুলি সাদৃশ্য কিছু দেখতে পায়। ছোট ভাই এ্যানিংকে তা জানালেন। এ্যানিং সময় নিয়ে ওটা খুঁড়ে তোলেন এবং খুলি সাদৃশ্য জিনিষের মধ্যে থেকে পুরো একটি কুমিরের কংকাল উদ্ধার করেন। কিন্তু ওটা আসলে কুমির ছিল না, ছিল ডাইনোসার! পরবর্তিতে যার নাম দেয়া হয় ইচথিওসাইরাস। তিনি আরো খুঁজে পান প্লেসিওসাইরাস, টারোডেকটাইলাস, স্কোয়ালোরাহা। তাঁর আবিষ্কারসমূহ উনিশ শতকের ইতিহাসের দর্শনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে যখন অধিকাংশ মানুষ ধরে নিয়েছিল ডাইনোসারের অস্তিত্ব শুধুই কল্পনা। তাই আধুনিক ভূতত্বের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে এই ম্যারি এ্যানিংকে চিহ্নিত করা হলেও বাড়িয়ে বলা হবে না মোটেও। ১৮৪৭ সালের ৯ মার্চ বিজ্ঞানের ইতিহাস বদলে দেয়া এই নারী ব্রেস্ট ক্যান্সারে মারা যান।

হেডি লামার (১৯১৩-২০০০)

শিল্পী থেকে টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার

তিনি ছিলেন অস্ট্রিয়াতে জন্ম নেওয়া এক মার্কিন অভিনেত্রী। ছোট বেলা থেকে মিউজিকের উপর বিশেষ আকর্ষণ ছিল তার। সেটার ধারাবাহিকতায় ২৮ বছর বয়সে স্বয়ংক্রিয় পিয়ানোতে কিভাবে গোপনীয় প্রোগ্রাম সেট করা যায় তার উপর নিজের তৈরি বিশেষ কৌশল আবিষ্কার করে বসেন। আসলে তিনি আবিষ্কার করে ফেললেন টেলিকমিউনিকেশনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কলাকৌশল 'ফ্রিকোয়েন্সি-হপিং স্প্রেড-স্পেকট্রাম টেকনোলজি'। অথচ এসব বিষয়ে বিন্দুমাত্র নলেজ তার ছিল না কখনই। তার সেই আবিষ্কার আজকের যুগের ওয়াই-ফাই, ব্লুটুথ, সিওএফডিএম, সিডিএমএ প্রভৃতি তারহীন প্রযুক্তির ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

গ্রেগর মেন্ডেল (১৮২২-১৮৮৪)

সন্ন্যাসী থেকে আধুনিক জীনতত্ত্বের জনক

জীনতত্ব? এটা মানুষের অস্বাভাবিক রোগ নির্ণয়ে ব্যবহার হতে পারে, শরীরের মেদবৃদ্ধির জন্য এটাকে দায়ী করা যায়, কুমিরের শরীর আর শিম্পাঞ্জীর মাথার সমন্বয়ে একটি কাল্পনিক এবং বিস্ময়কর প্রাণী তৈরিতেও ব্যবহার হতে পারে এই জীনতত্ব। সুতরাং আমাদের মনে

হতে পারে এটা হয়তো কিছু সুপার-সায়েন্টিস্টস বা অধিবিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন। প্রিয় পাঠক, আপনি নিশ্চয় এমনটি ভাবেননি, কারণ পোষ্টের শিরোনামটি তাহলে মিথ্যা হয়ে যাবে। যে লোকটি এই আধুনিক বিজ্ঞানের জনক তার জীবন-বৃত্তান্তে এসবের ধারের কাছে কিছু ছিল না। এমনকি তিনি গবেষণাগারের সাদা কোর্ট পরা কোন ভদ্রলোকও নন। এমনকি তার এমন কোন পোষাকও ছিল না। তিনি হলেন জাত সন্ন্যাসী গ্রেগর মেন্ডেল। ১৮২২ সালে চেক রিপাবলিকে জন্ম নেওয়া মেন্ডেল পয়সার অভাবে কলেজের গন্ডি পৌঁছাতে পারেননি। তাই ভেবে চিন্তে অবশেষে বার্ণের অগাস্টিন সন্ন্যাসী আশ্রমে যোগ দেন এবং সেখানে তিনি বাগান পরিচর্যা করতে শুরু করেন। এই বাগান পরিচর্যা করতে করতে তিনি মোটর গাছের চারার কিছু মজার জিনিস পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি বুঝলেন যে কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন গাছের রং, আকার, ইত্যাদি আসল মোটর গাছ থেকে চারা মোটর গাছে চালিত হচ্ছে। তিনি বিষয়টি নিয়ে আরো কয়েকটা পরীক্ষা করলেন এবং একজন প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিয়মমাফিক কাজ করেন তিনিও ঠিক তেমনই করতে লাগলেন। আর এভাবেই ঘটনাক্রমে তিনি হাটতে লাগলেন আধুনিক জীনতত্ব আবিষ্কারের পথে।

টমাস আলভা এডিসন (১৮৪৭-১৯৩১)
পত্রিকার হকার থেকে বিশ্ব সেরা উদ্ভাবক

মাত্র তিন মাস স্কুলে গিয়েছিলেন টমাস আলভা এডিসন। স্কুল শিক্ষক তাঁকে প্রায় স্থূলবুদ্ধির এক বালক বলে অভিহিত করতো। শেষমেস স্কুল ছেড়ে দেন এডিসন। একটি অসুখের কারণে তিনি এসময় প্রায় বধিরও হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে বাড়ীতে মায়ের উৎসাহে কিছু পড়াশোনা করেছিলেন। ছোটবেলা থেকেই অসম্ভব কৌতুহলী এডিসন বাবার ব্যবসাতে মন্দা আসার কারণে ট্রেনে চকলেট আর পত্রিকা বিক্রি করতে লাগলেন। একদিন চলন্ত ট্রেনের আঘাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন ৩ বছর বয়সের জিমি মেকেঞ্জিকে। জিমির বাবা ছিলেন রেলওয়ের একজন স্টেশন মাষ্টার। নিজের মেয়ের জীবন বাঁচানোর জন্য তিনি কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে এডিসনকে টেলিগ্রাফ অপারেটর পদে চাকুরির ব্যবস্থা করে দেন। এই চাকুরির সাথে নিজের অবসর সময় বই পড়ে এবং গবেষণা পরীক্ষা করে কাটাতেন। একসময় গবেষণার প্রতি তিনি এতটাই কৌতুহলী হয়ে ওঠেন যে রাতেও নিজের অফিসে কাজ করতে থাকেন। একরাতে লেড-এসিড ব্যাটারি নিয়ে কাজ করার সময় মেঝেতে কিছু সালফিউরিক এসিড পড়ে গেল এবং ওটা অফিসের বসের ডেস্কের নিচ পর্যন্ত গড়িয়ে পড়লো। পরদিন সকালে এডিসনকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হলো। এডিসনের এই দূর্দিনে এগিয়ে আসলেন তাঁরই অফিসের এক ইঞ্জিনিয়ার, ফ্রাংকলিন লিওনার্ড পোপ এবং নিজ বাড়ীর বেসমেন্টে এডিসনের থাকার এবং কাজ করার জায়গা করে দেন।

কিছুদিনের মধ্যেই এডিসন আবিষ্কার করেন উন্নতমানের টেলিগ্রাফ যন্ত্র! এরপর শুধু এগিয়ে যান তিনি। আর বিশ্বকে দেন নব নব আবিষ্কার। উদ্ভাবন করেন ফনোগ্রাফ, মুভি ক্যামেরা, ব্যবহারিক বৈদ্যুতিক বাতি। একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিদ্যুৎ তৈরি করে সেটা বাড়ী-ঘরে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, ফ্যাক্টরিতে বিতরণ করা যেতে পারে এমন ধারণা তিনিই প্রথম প্রবর্তন এবং বাস্তবায়ন করেন। ১৮৮২ সালে নিউইয়র্কের ম্যানহাটানে তাঁর তৈরি বিদ্যুৎকেন্দ্রটিই বিশ্বের সর্বপ্রথম পাবলিক পাওয়ার স্টেশন। তিনি আরো আবিষ্কার করেছেন স্টক টিকার (টেলিগ্রাফ ব্যবহার করে শেয়ারবাজারের তথ্য প্রদান), যান্ত্রিক ভোট রেকর্ডার, গাড়ির জন্য ব্যাটারি, রেকর্ডেড মিউজিক আরো অনেক কিছু! এসব আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে এডিসন বিশ্বকে নিয়ে গেছেন সভ্যতার পাহাড়ে।

আমি নিশ্চিত যে খুঁজতে থাকলে এই তালিকা আরো লম্বা হতে থাকবে। প্রিয় পাঠক, একজন বাচ্চাকে স্কুলে দিতে হবে এটা যেমন ঠিক সাথে সাথে তার নিজস্বতাকেও গুরুত্ব দিতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক মানুষকে বিশেষ প্রতিভা দিয়ে পাঠিয়েছেন। এই প্রতিভাকে বিকশিত হতে দিতে হবে সাবলীলভাবে। তাই ছোট্ট শিশুর উপর পাহাড়সম লেখাপড়া, দায়িত্ব, প্রতিযোগিতার বোঝা চাপিয়ে দেয়া ঠিক হবে না কোনভাবেই। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় শিখানোর পাশাপাশি একজন শিশুকে তার মতো করে বেড়ে উঠতে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে তার প্রকৃত প্রতিভাটাকে কাজ লাগানো সম্ভব নয় কি?

[লেখক : সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

নিঃস্ব ব্যক্তির সামনে স্বীয় ধন-সম্পদের আলোচনা করো না।
অসুস্থ ব্যক্তির সামনে নিজের সুস্থতার গল্প জুড়ে দিও না।
দুর্বলের সামনে তোমার ক্ষমতার বড়াই করো না।
দুর্ভাগার সামনে নিজের সৌভাগ্যের কচ্‌কচানি করো না।
কারাবন্দীর আপন স্বাধীনতার গর্ব প্রকাশ করো না।
বন্ধ্যা নারীর কাছে নিজের সন্তানদের খোশগল্প করো না।
ইয়াতীমের সামনে নিজের পিতার গল্প করো না।
কেননা তারা আঘাতপ্রাপ্ত, তাদের সে ক্ষত আধিক্য সহ্য করার মত অবস্থায় থাকে না।

=====================

তোমার আলাপচারিতাকে সৌন্দর্যময় কর
জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে অপরের
অনুভূতির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখাকে
তোমার ব্যক্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত করে নাও।
যেন এমন দিন তোমার সামনে উপস্থিত না হয়,
যেদিন তুমি নিজেকে কেবল
তোমার ক্ষত'র সাথেই উপস্থিত পাবে।
তাই অন্যের আঘাতের উপর দাঁড়িয়ে
নৃত্য-ক্রীড়ায় লিপ্ত হয়ো না।
যেন এমন দিন না আসে, যেদিন তোমার
আঘাতের উপর দাঁড়িয়ে মানুষ নৃত্য করবে।

আমাদের শারীরিক গঠন ও আল্লাহর অসীম কুদরত

হারুণ ইয়াহইয়া

১. একটি অপূর্ণাঙ্গ চোখ দেখতে পারে না'

'চোখ' শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে আপনার মনে সর্কপ্রথম কোন্ ভাবনার উদয় হয়? দেখবার ক্ষমতা যে আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়– সে সম্পর্কে আপনি কি সচেতন আছেন? ধরে নিচ্ছি, আপনি এ ব্যাপারে সচেতন। কিন্তু আপনি কি কখনো ভেবে দেখছেন, আপনার চোখ স্রষ্টার কোন্ কোন্ নিদর্শন (sing) বহন করছে? মানুষসহ অন্যান্য জীবিত প্রাণী যে সৃষ্ট, তার সবচেয়ে স্পষ্ট প্রমাণগুলোর একটি হচ্ছে এই 'চোখ'। চোখ মানেই পারফেক্ট ডিজাইন। মানুষসহ সকল জীব-জানোয়অর যে অঙ্গটি দিয়ে তার চারপাশের সবকিছু দেখে বা দেখতে পারে সে অঙ্গটিকে 'পারফেক্ট ডিজাইন'-এর উদাহরণ বলা যেতে পারে। এই অসাধারণ অঙ্গটি এমন জটিল যে, মনুষ্যসৃষ্টি সবচেয়ে সফিসটিকেটেড (sophisticated) ও জটিল যন্ত্রও এর কাছে নস্যি। একটা চোখ দিয়ে কখন দেখা য়ায়? উত্তর : যখন চোখের সবগুলো অংশ সহবস্থান করে এবং একসঙ্গে কাজ করে। ধরা যাক, চোখের পাতা (eyelid) ছাড়া একটি চোখের কর্নিয়া আছে, আছে চোখের তারা, লেন্স, কনীনিকা(iris), রেটিনা, চক্ষুপেশী, আশ্রুগ্রন্থি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সকল উপাঙ্গ। কী ঘটবে? খুব দ্রুত চোখ তার দেখার ক্ষমতা হারাবে। আবার ধরা যাক, চোখের পাতাসহ চোখের অন্যসব উপাঙ্গই বর্তমান আছে, শুধু চোখে অশ্রু উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। কী গটবে কুব দ্রুত চোখ শুকিয়ে যাবে এবং এক সময় তা অন্ধ হয়ে যাবে। বিবর্তনবাদীদের বিশ্বাস এই চোখের কাছে এসে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য। তারা বিশ্বাস করে যে, জীব-জন্তুদের (মানুষসহ) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সরল অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে জটিলতর হয়েছে দৈবক্রমে।যদি তা-ই হয়, তবেচোখকে ব্যাখ্যা করা যায় কি প্রকারে? চোখ হচ্ছে অনেকগুলো উপাঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত জটিল একটি অঙ্গ এবং যেমনটি ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে সকল সকল উপাঙ্গ একসাঙ্গে কাজ করলেই কেবল এটি দেখরার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। কোন অবস্থাতেই একটি অপূর্ণঙ্গ চোখ কাজ করে না: না একটি অর্ধগঠিত (half-developed) চোখ পূর্ণাঙ্গ চোখের তুলনায় অর্ধক দেখতে পারে। এ প্রসঙ্গে একজন বির্বনবাদী বিজ্ঞানের বক্তব্য শুনুন: "(জীব-জন্তর)" চোখ এবং (পাখিদের) পাখার বিশেণ বৈশিষ্ট্য এমন যে, এগুলো পূর্ণাঙ্গ এবং পূর্ণবাবে বিকশিত অবস্থাতেই কেবল কাজ করতে পারে। অন্যভাবে বললে, একটি অর্ধ-বিকশিত (halfway-developed) চোখ দেখতে পারে না, না একটি অর্ধ বিকশিত পাখাওয়অলা পাখি উড়তে পারে।" *{সূত্র : Billim ve Teknik magazine (Science and Technology Magazine), vol. 203, p.23]* এখন আমরা আবারো সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মুখোমুখি হয়: কে চোখের সকল অংশ বা প্রত্যঙ্গগুলো একসঙ্গে সৃষ্টি করেছেন? এটা তো স্পষ্ট যে, মানুষসহ কোন জন্তু-জানোয়ারই নিজেদের চোখর গঠন ও ধরন কেমন হবে-তা ঠিক করেনি; না তারা নিজেরাই নিজেদের চোখ সৃষ্টি করে নিজেদের দেহে সংযুক্ত করে নিয়েছে। তাহলে? কে তিনি– যিনি চোখের মত জটিল ও অসাধারণ একটি অঙ্গের ডিজাইন করেছেন এবং এক অস্তিত্বে এনেছেন? কেউ কেউ বলতে চেষ্টা করেন যে, অচেতন কোষ হঠাৎ করেই এবং দৈবক্রমে সচেতনতা লাভ করার ফলেই প্রাণীরা দেখার ও শুনার ক্ষমতা অর্জন করেছে। এ দাবি যে কতো অযৌক্তিক ও অবাস্তব তা ব্যাখ্যা করে বোঝাবার দরকার পড়ে না। প্রশ্ন হচ্ছে : তাহলে কিভাবে চোখ বা কানের মতো বিশেষ অঙ্গের সৃষ্টি সম্ভব হলো? এখানে এসেই আমাদের স্বীকার করে নিতে হয় একজন মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান স্রষ্টার অসিস্তত্বকে। একজন মহান স্রষ্টাই মানুষসহ অন্যান্য জীব-জন্তুকে দিয়েছেন দেখবার ক্ষমতা। আল কুরআন বলছে যে, একজন মহান স্রষ্টার সৃষ্টি করেছেন দৃষ্টিশক্তি : "বল" 'তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।" *(সূরা কালাম, আয়াত* ২৩)।

২. কোষগুলো পরস্পকে চেনে কিভাবে?

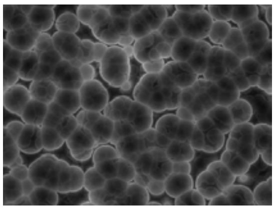

আমাদের মধ্যে অনেকেই মানব-শরীরের গঠন সম্পর্কে জানি। আমরা জানি কিভাবে মায়ের জরায়ুতে মধ্যে ধীরে ধীরে একটি মানবশক্তির শরীর বিকশিত হয়। শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের পে, মায়ের পেটে যে ভ্রূণের সৃষ্টি হয় তা মূলত একখণ্ড মাংসপিণ্ড বৈ আর কিছু নয়। এ ভ্রূণই ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ মানবশিশুতে রূপান্তরিত হয়। আমরা জানি, শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে জাইগোটের (Zygote) সৃষ্টি হয়। সে জাইগোটে প্রথমে থাকে মাত্র দুটি কোষ বা cell। তারাপর দুটি থেকে চারটি, চারটি থেকে আটটি, আটটি থেকে ষোলটি– এভাবে কোষের সংখ্যা জ্যামিতিক হরে বাড়তে থাকে। ক্রমবর্ধমান ওই কোষগুলো বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং কিছু কোষ মিলিত হয়ে হাত সৃষ্টি করে, কিছু কোষ সৃষ্টি করে শরীরের ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কিছু কোষ মিলিত হযে সৃষ্টি করে চোখ ইত্যাদি ইত্যাদি। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, প্রতিটি কোষ জানে যে, কোথায় তাকে যেতে হবে এবং কোন কোষগুলোর সঙ্গে মিলিত হয়ে কোন অঙ্গ সৃষ্টি করতে হবে। মায়ের পেটে ভ্রূণের বিকশিত হবার অত্যাশ্চর্য প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে নিচের উদ্ধৃতি থেকে :

গবেষণাগারের উপযুক্ত পরিবেশে (ক্যালসিয়ামের পরিমাণ হ্রাস করে) যদি আমরা ভ্রূণের সকল কোষকে – যে কোষগুলো বিভিন্ন অঙ্গ সৃষ্টির জন্য নির্ধারিত– আলাদা করে ফেলি এবং পরে আবার উপযুক্ত পরিবেশ সেগুলোকে এলোমেলোভাবে মিলিয়ে দিই,তবে দেখা যাবে যে, কোষগুলো ঠিকই মিলিত হযে ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ তৈরি করছে।" *(pro. Dr. Ahmet Noyan, physioloqy in life and in the field of Medicine, Meteksan publishing Ankara, 1998,Edition 10. p. 40)* অর্থাৎ কোন্ কোন্ কোষ মিলে ে কান্ কোন্ অঙ্গ গঠিত হবে তা পূর্বনির্ধারিত। শুধু তাই নয়, কোষগুলো

নিজেদের কাজ সম্পর্কেও সম্যক ওয়াকিফহাল। হাত সৃষ্টির জন্য নির্ধারিত কোষগুলো একটিও কখনো চোখ সৃষ্টির জন্য নির্ধারিত কোসগুলোর সঙ্গে মিলিত হবে না। কারণ, একটি নির্দিষ্ট অঙ্গের জন্য নির্ধারিত কোষগুলো পরস্পরকে ভালোভাবেই চেনে। ভ্রূণের এই কোষগুলোর কোন ব্রেন নেই, নেই কোন নার্ভাস-সিস্টেম, চোখ বা কান। তাহলে, এরা কি প্রকারে একে অপরকে চিনতে পারে? কিছু পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত এবং চেতনা ও জ্ঞান-বুদ্ধিবিহীন এই কোষ কি প্রকারে সমবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অন্য কোষকে ভিন্নবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বহু কোষের মধ্য থেকে আলাদা করতে পারে? কিভাবে এরা জানে যে, এরা মানবশিশুর জন্মের প্রক্রিয়ার এক পর্যায়েপরস্পর মিলিত হয়ে একই অঙ্গ গঠন করবে? অচেতন পরমাণুর সচেতন আচরণ-এর পেছনে কোন শক্তি কাজ করছে? বলাবাহুল্য,এ শক্তি হচ্ছে আল্লাহ্ –যিনি জগতসমূহের রব এবং যিনি জগতসমূহ সৃষ্টি করেছেন শূন্য থেকে। কুরআন বলছে : "আমি তাদের জন্য আমর নিদর্শনাবলি ব্যক্ত করব–বিশ্বজগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি সত্য।এটা কি তোমাদে প্রতিপালকের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তিনি সর্ববিষয়ে অবহিত?"*(সূরা হা-মীম আস্ - সাজদা, আযাত ৫৩)*।

৩.মানুষের শরীরের অভ্যন্তরের সৈন্যবাহিনী

প্রতিদিন,আপনার অজান্তেই, আপনার শরীরের অভ্যন্তরে যুদ্ধ চলছে। এ যুদ্ধে একপক্ষ আছে অসংখ্য ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া। এরা আপনার শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, আপনার শরীরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে আগ্রহী। যুদ্ধের অপরপক্ষ হচ্ছে আপনার শরীরের অসংখ্য রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন কোষ– যেগুলো ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার মত ক্ষতিকর জীবাণুর বিরুদ্ধে হামেশা লড়াই করে আপনর শরীরকে রোগমুক্ত রাখবার চেষ্টায় রত। ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার মতো শক্ররা সবসময় আক্রমণাত্নক। সুযোগ পেলেই এরপা শরীরের নির্দিষ্ট অংশে আঘাত হানতে এগিয়ে যায় সর্বশক্তি নিয়ে। কিন্তু এই নির্দিষ্ট এলাকার শক্তিশালী, সুশৃংখল ও সুসংগঠিত বোগপ্রতিবোধ ক্ষমতাসম্পন্ন কোষগুলো যেগুলোকে সৈন্যও বলা যায়–ওই শক্রদের সহজে অনুপ্রবেশ করতে দেয় না। এই সৈন্য-কোষগুলোর মধ্যেও আছে নানা ভাগ। প্রথমে 'যুদ্ধক্ষেত্রে' অবতীর্ণ হয় সেসব 'সৈন্য' – যেসব সৈন্য শক্র পক্ষের সৈন্যদের রীতিমতো গিলে খেয়ে ফেলে এবং তাদেরকে অকার্যকর করে দেয়। তরে, এই 'গিলে খেতে সক্ষম' সৈন্যরা যুদ্ধে পরাজিত হলে, অন্য সৈন্যদের ডেকে পাঠানো হয়। তেমন ক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে অর্থ্যাৎ শরীরের নির্দিষ্ট অংশ বিপদ সংকেত বেজে ওঠে এবং অন্যান্য সৈন্যকেও (সাহায্যকারী 'টি' সেল- helper T cells) যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য আহ্বান জানানো হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে নতুন-আসা সৈন্যরা অতি সহজেই শক্রপক্ষ থেকে মিত্রপক্ষকে আলাদা করতে পারে। অতি দ্রুত এরা 'যুদ্ধাস্ত্র' উপাদনে সক্ষম সৈন্যদের ('বি' সেল) সক্রিয় করে তোলে। এই 'বি' সেলগুলোর ক্ষমতা অসাধারণ। যদিও এরা শক্রপক্ষের সৈন্যদের কোনদিন দেখেনি বা চেনে না; তথাপি এরা শক্রপক্ষের সৈন্যদের অকার্যকর করে দিতে সক্ষম অস্ত্র তৈরি করতে পারে। পাশাপাশি, এরা উৎপাদিত অস্ত্র যতটুকু দূরে প্রয়োজন ততটুকু দূর পর্যন্ত বহন করেও নিয়েযায়। অস্ত্র বহন করে নিয়ে যাবার পথে এরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নিজেদের এবং মিত্রপক্ষের লসন্যদের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে পারে (অথচ এ কাজটি মোটেই সহজ নয়)। এদিকে, সবার শেষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় আক্রমণকারী সৈন্য (কিলার 'টি' সেল)। এরা শক্রপক্ষের সৈন্যদের দুর্বলতম স্থানে, নিজেদের সঙ্গে বহন করে আনা বিষময় বস্তু নিক্ষেপ করে। যুদ্ধে বিজয়ী হলে, সৈন্যদের একটি নতুন গ্রুপ (suppressor T cells) যুদ্ধক্ষেত্রে আসে এবং অন্য সকল সৈন্যকে নিজ নিজ ক্যাম্পে ফেরত পাঠায়। সবশেষ যুদ্ধক্ষেত্রে আসে যে গ্রুপটি (memory cells)- সে গ্রুপটা কাজ হচ্ছে শক্রপক্ষ সম্পর্কে সকল ধরনের তথ্য রেকর্ড করা। বলা বাহুল্য, রেকর্ড করা এসব তথ্য কাজে লাগে ভবিষ্যতে আবারো আক্রান্ত হলে। উপরে আমরা যে অসাধারণ ও সুশঙ্খল সৈন্যবাহিনীর বর্ণনা দিলাম, এটি হচ্ছে আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা বা Immune system। উপরে যুদ্ধের যে বর্ণনা দেয়া হলো, সে যুদ্ধে প্রতিনিয়ত যারা লিপ্ত সে কোষগুলো খালি চোখে দেখা যায় না, সেগুলোকে দেখতে হয় অণুবীক্ষণযন্ত্র দিয়ে। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন হারুন ইয়াহিয়ার গ্রন্থ The Miracle Immune system). কতজন লোক এ ব্যাপারে সচেতন যে, তাদের প্রত্যেকের শরীরের অভ্যন্তরে আছে অমন একটি করে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল ও পারফেক্ট সৈন্যবাহিনী? এদের কতজন এ ব্যাপারে সচেতন আছেন যে, তাঁরা অসংখ্য রোগ-জীবাণু দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা না থাকলে এরা প্রতিনিয়ত অসুখ - বিসুখে আক্রান্ত হতেন এবং মৃত্যুমুখেও পতিত হতে পারতেন? বস্তুত, আমরা যে বাতাসে শ্বাস নেই, যে পানি পান করি, যে খাদ্য গ্রহণ করি, সেসব স্থান স্পর্শ করি – সর্বত্রই আছে ক্ষতিকর ও ভয়ঙ্কর সব রোগ- জীবাণূ দ্বারা পরিপূর্ণ। যখন একজন মানুষ এ ব্রাপারে একেবারে উদাসীন, তখন শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন কোষসমূহ কিন্তু প্রতিনিয়ত বোগজীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচেছ ব্যক্তিকে বাঁচানোর জন্য। দেহকোষ থেকে বোগ- জীবাণুকে আলাদা করে চিনবার বোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন কোষগুলোর ক্ষমতা, শক্রকে না দেখেও শক্রকে ধ্বংশ করার উপযোগী অস্ত্র তৈরি করার 'বি' সেলের ক্ষমতা, নিজেদের এবং মিত্রপক্ষের কারো ক্ষতি না করে প্রয়োজন মুতাবিক সেসব অস্ত্র বহন করে নিয়ে যাবার 'বি' সেলের ক্ষমতা, মেমোরি সেলের ক্ষমতা ইত্যাদি হচ্ছে মানবদেহের বোগ-প্রতিবোধ ব্যবস্থার কিছু সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য। বস্তুত এ কারণেই বিবর্তনবাদী লেখকরা কখনোই বোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থার উদ্ভব সম্পর্কে কোন কথা বলতে নারাজ। বিবর্তনবাদ দিয়ে এ সিস্টেমমের উদ্ভব ব্যাখ্যা করা যায় না। এ ধরণের একটি সিস্টেম কেবল একজন মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান স্রষ্টার পক্ষেই সৃষ্টি করা সম্ভব। রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা ছাড়া বা এুটিযুক্ত রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে একজন মানুষের পক্ষে এই পৃথিবীতে টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব একটি কাজ। কারণ সেক্ষেত্রে সে প্রতিনিযত আক্রান্ত হবে চারপাশে ছড়িয়ে- ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য রোগ- জীবাণু দ্বারা। আধুনিক যুগে চিকিৎসা-বিজ্ঞান অনেক উন্নত হয়েছে। তথাপি,আজো তেমন একজন ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে চাই বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা–যে ব্যবস্থায় ব্যক্তিকে বাখতে হবে অন্য সকল মানুষের বা অন্য যে কোন কিছুর সংস্পর্শ থেকে দূরে (এইডস বোগে আক্রান্ত ব্যক্তির কথাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে । এইডস হলে একজন মানুষের শরীরের বোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় বলেই সে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।-অনুবাদক) এখন মানবজাতির প্রাথমিক অবস্থার কথা ভাবুন। তখন তো কোন চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল না। এ অবস্থায় কি তখন দেহের ভেতরে পূর্ণাঙ্গ বোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল? অবশ্য না। তাহলে আমাদেরকে এ সিদ্ধান্তে আসতে হচ্ছে যে, মানবদেহের রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থার মত একটি জটিল ও অতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা একজন মহান স্রষ্টা কর্তৃক একবারেই সৃষ্ট হয়েছিল এবং শুরু থেকেই ওই সিস্টেমের সকল উপাদান উপস্থিত ছিল মানবদেহে।

সুন্নাতের দুর্ভিক্ষ ও দৃপ্ততেজী তারুণ্য

ইলিয়াস বিন আলী আশরাফ

দেশ এবং জাতি এক ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় অবস্থায় নিপতিত। শান্তি-শৃঙ্খলা, নীতিবোধ এবং জীবনের নিরাপত্তা বলতে আজ আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। গ্রামের পর্ণকুটির থেকে শুরু করে রাজধানীর প্রাসাদোপম অট্টালিকাগুলোতে পর্যন্ত কেউ এখন আর নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারছেনা। একটা ভয়াবহ অনিশ্চয়তা ও অস্বস্তির বোঝা যেন আজকাল সবার বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছে। কি হবে এ দেশের? এ জিজ্ঞাসাই সচেতন, বিবেকবান মানুষকে তাড়িত করছে। মহানবী (ছাঃ) এর কণ্ঠনিঃসৃত হাদীছে যেসব ভয়াবহ ফেতনার আগাম খবর দেওয়া হয়েছে, সেসব ফেতনারই যেন কোন একটার আবর্তে আমরা পতিত হয়েছি। কূল-কিনারাহীন এই ফিতনার ঘূর্ণিপাকে পড়ে ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার ছাড়া আমাদের যেন করার কিছুই নেই। এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে এক ভয়ংকর হায়েনার চক্র এদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, ইসলাম ও মুসলমানদের আদর্শ, ঐতিহ্য, বৈশিষ্ট্য, যা কিছু অর্জন ও গৌরবের, সে সব কিছুই গুড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে। বর্তমানে ইসলাম, মুসলমান, দাঁড়ি, টুপি ও ফৎওয়া নিয়ে এদেশের কিছু সংখ্যক মানুষের যে গাত্রদাহ, তা সত্যিই অবাক করার মত বিষয়। যে দানবীয় শক্তিটাকে আমাদের পূর্বপুরুষগণ সাময়িকভাবে হলেও উচিত শিক্ষা দিয়ে এই উপমহাদেশে আমাদের জাতিসত্তাকে অন্ততঃ এক শতাব্দী কালের জন্য কিছুটা নিরাপদ করেছিলেন, বালাকোটের জিহাদের ময়দানে যে দানবদের হাতে আল্লাহর রাহে প্রাণ দিয়ে আমাদের জন্য আগামী দিনের পথ দেখিয়েছিলেন আমীরুল মুজাহিদীন সৈয়দ আহমাদ শহীদ (রঃ), শাহ ইসমাঈল শহীদ (রঃ) প্রমুখ সেই দানবের অপশক্তির প্রেতচ্ছায়া আজ বাংলাদেশের বুকে নতুন বেশে, নতুন ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে। এদের বিষাক্ত দন্ত, নখর শুধু আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং জাতীয় মর্যাদাবোধকেই ধূলিসাৎ করে দিয়ে ক্ষান্ত হচ্ছে না, আমাদের দ্বীন, ঈমান, তাহযীব-তমুদ্দুন, শিক্ষা ও বোধ বিশ্বাসকে একের পর এক আক্রমণ করে ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে উদ্যত হয়েছে।

ইসলাম ও মুসলমানদের আক্বীদার বিরুদ্ধে মুসলিম নামধারীদের কলবাজি, চাপাবাজি সীমা অতিক্রম করেছে। রাজনীতির ময়দানে মুসলিম জাতিসত্তার স্বতন্ত্র পরিচিতি নিয়ে অগ্রসর হ'তে চাইলেই নানা অপবাদের আড়ালে সেই কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেয়া হচ্ছে। গণ্ডায় গণ্ডায় সংবাদপত্র এবং ইলেক্ট্রোনিক্স মিডিয়াকে লাগামহীনভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ইসলামী বোধ-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। মুসলিম উম্মাহ্র চিহ্নিত দুশমন ইহুদীদের মুখ থেকেও যে সব মিথ্যা ও অপবাদের কথা কল্পনা করা যায় না, তার চাইতেও জঘন্য বক্তব্য উদগীরণ করানো হচ্ছে নামে মুসলিম পরিচয়ে পরিচিত এদেশের এক শ্রেণীর পক্ষ থেকে।

ধর্মীয় ক্ষেত্রেও আজ চরম হতাশা। যুবসমাজের নিকট সঠিকভাবে আদর্শ উপস্থাপনের ব্যর্থতার কারণে ধর্মবিরাগী ও নাস্তিক্যবাদীর সংখ্যা বাড়ছে দিন দিন। পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত ধর্মের খোলস ঝেড়ে ফেলতেও অনেকে উন্মুখ। ইসলামপন্থীগণ নানা দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে কোন্দলে লিপ্ত। একদল বৈরাগ্যবাদের পূজারী, অন্যদল সমাজ সংস্কারে নিয়োজিত থেকে নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে উদাসীন। একদল ইসলামের কাটছাট চান, অপর দল কোন রূপ ঝুঁকি নিতে নারাজ। যারা সত্যিকার ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতি, তাদের মধ্যেও রয়েছে অনৈক্যের আবহ। স্ব স্ব কার্যক্রমে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রাণপণ চেষ্টা, কার্যপ্রণালীর বিভিন্নতাকে প্রাধান্য দিয়েই নির্ভেজাল ইসলাম প্রতিষ্টার জন্য চলছে আন্দোলন।

শিরক-বিদ'আত ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ দিন দিন বাড়ছে। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ সমাজে অনুপস্থিত। আর যদি কেউ শিরক বিদ'আত সম্পর্কে বলতে যায়, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য মানুষের আর অভাব হয় না।

কিন্তু এই ফিতনার সমুদ্রকে তো চিরদিন অবাধ গতিতে সয়লাব হতে দেয়া যায় না। সময়ের ব্যবধানে স্রোতের বিপরীতে কোন না কোন প্রতিরোধশক্তিকে দাঁড়িয়েই যেতে হয় এবং তার মাধ্যমেই রচিত হয় নবযুগের ইতিহাস। আমি আমাদের জগতপুর গ্রামের এমনই একটি বাস্তব ঘটনা তুলে ধরতে চাই।

সময়টি ছিল ১৯৭৭ সাল। আমাদের গ্রামের মধ্যে জামে মসজিদ ছিল একটি, যা জগতপুরের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ নামে পরিচিত। ১৯৭৭ সালের শা'বান মাসে শবেবরাতের আগের জুম'আ। এই দিন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কুমিল্লা যেলার সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তখনো 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। মাওলানা ছফিউল্লাহ সাহেব তখন ২০/২২ বয়সের তরুণ। ফাযেল পরীক্ষা শেষ করেছেন সবেমাত্র। মুখে সামান্য দাঁড়ি গজিয়েছে। তিনি বড় মসজিদে উপস্থিত হলেন। এই সময়ে মসজিদের ইমাম ছিলেন মাওলানা সাইদুর রহমান সাহেব। তিনি মাওলানা ছফিউল্লাহকে বললেন খুৎবা দেওয়ার জন্য। মাওলানা ছফিউল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কোন বিষয়ে আমি খুৎবা দিব। তিনি বললেন, শবেবরাতের বিদ'আত সম্পর্কে আলোচনা কর। খুৎবা হল। খুৎবার অন্যান্য আরো বিষয়বস্তু ছিল, সমাজে ধর্মের নামে প্রচলিত বিদ'আতসমূহ। যেমন শবেবরাত, মানুষের বাড়ী বাড়ী পয়সা নিয়ে কুরআন খতম, দলবেধে পয়সা নিয়ে কবর যিয়ারত, মৃত মানুষকে কেন্দ্র করে কুলখানী, চেহলাম, মৃত্যু দিবস উপলক্ষে বড় অনুষ্ঠান, এই সমস্ত বিষয়ে তিনি জ্বালাময়ী বক্তব্য প্রদান করলেন এবং এগুলো যে শরী'আত সম্মত না বরং বিদ'আত তা প্রমাণ করলেন। তবে তিনি বিশেষ করে শবেবরাত নিয়ে আলোচনা করলেন। কেননা তখন বিদ'আতীদের মত আহলেহাদীছদের মধ্যেও ঘটা করে শবেবরাতের প্রচলন ছিল। এমনকি শা'বান মাসের প্রথম থেকেই পিঠা বানানো, হালুয়া-রুটি, কুরআন খতম ইত্যাদির ধূমধাম চলত। আর শবেবরাতের রাত্রে অর্ধ রাত পর্যন্ত মানুষ ছালাত আদায় করত। এই সবগুলো যে শরী'আত সম্মত না, তা ছফিউল্লাহ সাহেব তুলে ধরলেন। তবে এর আগে তিনি আমীরে জামা'আত ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের শবেবরাত সম্পর্কে 'আরাফাত' পত্রিকায় একটি লেখা অধ্যয়ন করেছিলেন। আর আমীরে জামা'আত শায়খ বিন বাযের ফৎওয়া অনুবাদ করে 'আরাফাত' পত্রিকায় লিখেছিলেন। মাওলানা ছফিউল্লাহর মূল প্রেরণা ছিল মূলতঃ এগুলো থেকেই। তারপর জুম'আর ছালাত শেষ হল, মসজিদভরা মুছল্লী, ছালাত শেষে সমস্ত মুছল্লির গায়ে যেন জাহান্নামের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। তখন তো সবাই চোখ রাঙ্গিয়ে গম গম করে উঠল, মাওলানা ছফিউল্লাহর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য। ছফিউল্লাহ সাহেব এগুলি কিছুই মনে করেননি। বরং তিনি ধৈর্যের সাথে মসজিদের ভিতর বসে ছিলেন। আমাদের গ্রামের একজন সরদার ছিলেন খুবই ভাল মানুষ। তার কথা এখনো সবার মুখে মুখে আছে। কিন্তু তিনি এখন আর বেঁচে নেই। তার নাম ছিল সুলতান সরদার। তখন সুলতান সরদার সাহেব দাঁড়ালেন। কিন্তু মাওলানা সাইদুর রহমান চুপ করে আছেন। সরদার সাহেব দাঁড়িয়ে সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনারা মসজিদের ভিতর কোন কথা বলবেন না। মাদরাসার পুকুরপাড়ে সবাই আসেন এবং মাওলানা ছফিউল্লাহকেও বললেন বসার জন্য। ছফিউল্লাহ সাহেব ঐখানে গিয়ে বসলেন। মাদরাসার উত্তর দিকে একটি আমগাছ আছে, এক ব্যক্তি ঐ আমগাছে হেলান দিয়ে বসে আছে। তিনি মাঝে মাঝে বিদ'আতী দাওয়াতও খায়। মাওলানা ছফিউল্লাহকে লক্ষ্য করে এই ব্যক্তি বলে উঠল, 'ঐ মিয়া, আপনি যে এই গুলি বিদ'আত বললেন, বলেন তো দেখি বিদ'আতের ওযন কতটুকু? এখানে সব মানুষ বসা, সরদার সাবও বসে আছেন'। তখন ছফিউল্লাহ সাহেব বললেন, 'বিদ'আতের এত ওযন, তা এত ভারি যে, যে ব্যক্তি বিদ'আত করবে তাকে বিদ'আত টেনে জাহান্নামে নিয়ে যাবে'। তিনি এই কথাটি বলার পরে সবাই চুপ হয়ে গেল। কেউ কোন কথা বলল না। তখন সুলতান সরদার মাওলানা ছফিউল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, ছফিউল্লাহ মিয়া, আপনি যে কথাগুলো বললেন শবেবরাত সম্পর্কে এবং

অন্যান্য আরো বিষয়ে, আপনি কি এগুলোর দলীল দিতে পারবেন? তখন মাওলানা ছফিউল্লাহ বললেন, জ্বী, ইনশাআল্লাহ অবশ্যই দলীল দিতে পারব। আমি জেনেশুনেই এই কথাগুলি বলেছি। একথা বলার পর, সরদার সাহেব সভা ঐখানে সমাপ্ত করে দিলেন। এই সভাতে সরদার সাহেব কোন সমাধান দিলেন না। সবাই সবার মত বাড়ীতে চলে গেল। তারপর এলাকায় মানুষ খুব তোলপাড় করা শুরু করল। হাটে, ঘাটে, দোকান-পাটে, মসজিদে-মাদরাসায়,স্কুলে সব জায়গায় মাওলানা ছফিউল্লাহ সাহেবরের বিরুদ্ধে গালি গালাজ, বিষোদগার। এই অবস্থা চলতেছে। পরের দিন মাওলানা ছফিউল্লাহ মাদরাসা গেলেন ক্লাস করার জন্য। তখন তিনি মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। যখন তিনি মাদরাসায় গেলেন, তখনকার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা আলী আছগর ছাড়া অন্যান্য যত শিক্ষক আছেন, তারা লাইব্রেরী থেকে কিতাব খুলে ছফিউল্লাহ সাহেবের সাথে তর্ক করার জন্য প্রস্তুত। তারা তাফসীরগুলো খুলল। খুলে তারা কুরআনের একটি আয়াত দেখালো। আয়াতটি হল–

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (٣) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

এছাড়াও আরো বিভিন্ন আয়াতগুলো পর্যালোচনা করে যখন ছফিউল্লাহ সাহেব তাদের যুক্তি খণ্ডন করে দিলেন, তখন তারা কিতাবগুলো রেখে দেয়। পরের জুমআ‘ আর একজন অল্প শিক্ষিত মুন্সি দিয়ে পড়ানো হল। বিদ‘আতপন্থীরা মিশকাতের শবেবরাত সংক্রান্ত যঈফ হাদীছগুলো বাংলায় অনুবাদ করে ঐ মুন্সির কাছে দিয়েছে। মুন্সি ছালাতের পরে উঠে দাঁড়িয়ে সব যঈফ হাদীছগুলো পড়ে শুনালেন। মাওলানা ছফিউল্লাহ এর প্রতিবাদে আর কিছু বলেননি। এদিকে মসজিদের ইমাম মাওলানা সাইদুর রহমান মাওলানা ছফিউল্লাহকে কিতাবাদি দিয়ে সাহায্য করতে থাকেন। তিনি তাঁকে ‘তুহফাতুল আহওয়াযী’ কিতাবটি পড়ার জন্য দিলেন। যাহোক কিতাবটি পাঠ করে মাওলানা ছফিউল্লাহ শবেবরাত সম্পর্কে খুব শক্ত দলীল পেলেন। ওদিকে মুন্সির বক্তব্যের পর সমাজে মাওলানা ছফিউল্লাহর বিরুদ্ধে নারী-পুরুষদের গালি গালাজ তো সীমা অতিক্রম করছে। এমনকি মাওলানা ছফিউল্লাহর বংশের এক মহিলা বলল, ‘আরে সে তো দজ্জাল হয়ে এসেছে এবং বলতেছে শবেবরাত উঠাইছে, কয়দিন পরে ছালাত ছিয়াম সব উঠিয়ে দিবে’। এর মাঝেই ছফিউল্লাহ সাহেবের সাথে এলাকার মোল্লা-মুন্সিদের তর্ক-বিতর্ক চলতে থাকে। অবস্থাদৃষ্টে সুলতান সরদার সাহেব আবার উদ্যোগ নিলেন বাহাছ করার জন্য। বাহাছ হবে মাদরাসায়। নির্ধারিত সময়ে সবাই মাদরাসায় উপস্থিত হল। সুলতান সরদার মাওলানা ছফিউল্লাহকে কানে কানে বললেন, ভাতিজা! তুমি যে এগুলো বলছ তার প্রমাণ দিতে পারবা? এই ফৎওয়ার উপর অটল থাকতে পারবা? মানুষ যে তোমাকে গালাগালি করে, আমার কাছে খুব খারাপ লাগে। ছফিউল্লাহ সাহেব বললেন, আমি যা বলেছি সব দলীল ভিত্তিকই বলেছি। আপনি চিন্তা করবেন না। তখন সরদার সাহেব মনে একটি বল পেলেন কিন্তু প্রকাশ্যে কিছুই বললেন না। তবে মানুষ একাধারে সব ছফিউল্লাহ সাহেবের বিরুদ্ধে। বাহাছের সময় হলো। মানুষ দল বেঁধে আসছে বাহাছ শোনার জন্য। অন্যান্য হুজুররাও বসেছে। আমাদের গ্রামের সর্দাররা সবাই আছেন। মাওলানা ছফিউল্লাহ সাহেব তার ছাত্রদেরকে সিরিয়াল ধরে দাঁড় করে দিলেন তাদের হাতে কিতাব দিয়ে। মাদরাসার মাঠে জমজমাট অবস্থা। বাহাছ শুরু হলে কিছুক্ষণের মধ্যেই মাওলানা ছফিউল্লাহ সাহেব অনুভব করলেন যুবকশ্রেণীর শ্রোতারা সব তার পক্ষে। অবশেষে ছফিউল্লাহ সাহেবই বাহাসে বিজয়ী হলেন। তারপর মসজিদের ইমাম মাওলানা আলী আছগর তার বক্তব্য শুরু করলেন এবং বললেন, শবেবরাত নিয়ে ছফিউল্লাহর সাথে ১৫-২০ দিন তর্ক বির্তক হয়েছে আমাদের সাথে। শেষ পর্যন্ত আমি ছফিউল্লাহকে বলি যে, তুমিও কিতাব দেখ, আমরাও কিতাব দেখি। দেখার পর বুঝতে পারলাম ছফিউল্লাহ যা বলেছে সব ঠিকই বলেছে। এই কথা বলার পর বিরোধীদের চেহারা সব মলিন হয়ে গেল। অন্যদিকে সাধারণ মানুষ হাত তালি দেয়া শুরু করল। পরিস্থিতি দেখে মনে হল অধিকাংশই গোপনে মাওলানা ছফিউল্লাহকে সমর্থন করত। তারপর সরদার সাহেব বিপক্ষের আলেমদেরকে খুব কোণঠাসা করলেন। প্রোগ্রাম শেষ হল। সবাই বাড়িতে চলে গেল। সেদিনের পর আমাদের গ্রাম থেকে শবেবরাত উঠে গেল আলহামদুলিল্লাহ।

এরপর আরো অনেক শরী‘আত বিরোধী কাজে ছফিউল্লাহ সাহেব বাধা দিয়ে ছিলেন এবং সফল হয়েছিলেন। যেমন একদিন দুপুর বেলায় তিনি ভূঁইয়া বাড়ীতে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন, এক ব্যক্তি এসেছে যে মানুষকে তাদের পীরের মুরীদ বানায়। ছফিউল্লাহ সাহেব তাদের কাছে গিয়ে বসলেন। মুরীদকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এইখানে কেন আসছ? সে বলল সিরাজ মাস্টারের কাছে। ছফিউল্লাহ সাহেব বললেন, সিরাজ মাস্টার তোমার কি হয়? সে বলল, আমার পীর ভাই। ছফিউল্লাহ সাহেব বললেন, পীর ভাই আবার কেমন ভাই, সহোদর ভাই, মামাত ভাই, ফুফাত ভাই, খালাত ভাই ইত্যাদি হয়, তবে কি তোমরা দু’জন এক পীরের ঘরে জন্ম নিয়েছ? তোমরা দু’জন কি এক পীরের সন্তান? তখন মুরীদ বলল, না আমরা দু’জন এক পীরের মুরীদ। এরপর ছফিউল্লাহ সাহেব বললেন, তোমরা মানুষকে কি শিখাও? সে ঘর থেকে একটা বই আনল। ছফিউল্লাহ সাহেব বইটি খুললেন, এরপর কিছুদূর পড়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পীর লিখেছে, ‘ফিল কোরআনে ক্বালাল্লাহ ক্বলবুন মু’মিনীন আরশুল্লাহ’ (অর্থাৎ কোরআনে বলছে মু’মিনের ক্বলবই আল্লাহর আরশ *(নাঊযুবিল্লাহ)*। এই কথাটা কুরআনের কোন জায়গায় আছে বল। আমি একটু জানতে চাই। সে বলল, আমি তো কুরআন শরীফ পড়তে জানিনা। এই কথা বলার পরে ছফিউল্লাহ সাহেব রেগে বললেন, ঐ বেটা তুই পীরের মুরীদ হয়েছিস, কুরআন পড়তে জানিস না মানে? না পড়ে মানুষকে এইসব আবোল-তাবোল শিখাচ্ছিস? সে বলল, আমার পীর এইগুলো বলছে। ছফিউল্লাহ সাহেব বললেন, তোকে বলতে হবেই কারণ সব তুই জানিস। সে বলে, আমি জানি না, আমি কুরআন পড়তে জানি না। ছফিউল্লাহ সাহেব আবার বললেন, ‘তুই যখন মুরীদ, তখন তো তোর কাশফ থাকার কথা, তুই কাশফের মাধ্যমে চোখ বন্ধ করে তোর পীরকে বল। পীর যখন বলবে এই কথাগুলি কুরআনের কোন জায়গায়, কত নাম্বার আয়াতে আছে, তখন তুই আমাকে বলবি। তোকে আজকে দেখাইতেই হবে, না দেখালে তোর অবস্থা খারাপ হবে’। তখন সে ভয়ে কাপা শুরু করল। ছফিউল্লাহ সাহেব বললেন, ‘কাপাকাপি চলবে না, আজকে তোর কলবে আরশ কোথায় আছে বাহির কর, না হলে আমি নিজেই তোর ক্বলবটা ফেড়ে বের করব। আল্লাহর আরশটা কোথায় আছে, তোর কলবে আল্লাহর আরশ আছে না?’ সে বলল, ‘আছে’। তখন ছফিউল্লাহ সাহেব আবার বললেন, ‘এখনই ক্বলবটা ফেড়ে বাহির কর নইলে আমি ফেড়ে বাহির করব’। এরই মধ্যে সে জায়গায় লোকজন ভীড় করেছে। যাইহোক শেষ পর্যন্ত তাকে নাস্ত নাবুদ করে ছফিউল্লাহ সাহেব তার বইটা নিয়ে গেলেন। পরে একজন তাকে বলল, এই ফকির এইখানে আর থাকবে না, আপনি তার বইটি দিয়ে দেন। ছফিউল্লাহ সাহেব বইটা দিয়ে দিলেন। ফকির চলে গেল। কিছু দিন পর সে আবার এসেছিল। জহির মাস্টার সাহেব তাকে কিছু প্রশ্ন করল। এই ফকির কোন উত্তর দিতে পারে নি। তারপর জহির মাস্টার সাহেব তাকে চড়-থাপ্পর মেরে বিদায় করে দিলেন।

উপরিউক্ত দুটি ঘটনায় মাওলানা ছফিউল্লাহ যে ধরণের সাহসী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, অনুরূপ ভূমিকা আজ বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামেগঞ্জে নেয়া অতীব প্রয়োজন। প্রতিটি গ্রামে যদি একজন যুবকও শিরক ও বিদ‘আতকে প্রতিরোধ করার জন্য সোচ্চার হন, তাওহীদ ও সুন্নাতের প্রচার ও প্রসারে যতটুকু সামর্থ্য রয়েছে তাই নিয়ে আত্মনিয়োগ করেন, ইনশাআল্লাহ তাদের এই সাহসী প্রচেষ্টাতেই সমাজে একদিন পরিবর্তন সাধিত হবে। আমরা যে যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, সর্বক্ষেত্রে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনাদর্শকে অনুসরণ ও অনুকরণ করার মাধ্যমেই জাতীয় জীবনে তাওহীদ ও সুন্নাতের যে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছে, তা মোকাবেলা ও প্রতিহত করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ। তাই তরুণ ও যুবক ভাইদের প্রতি আমাদের আহ্বান, আসুন যৌবনের এই টগবগে রক্তকে আমরা জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত করি। আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয়িত হোক রাসূল (ছাঃ) এর সুন্নাতের বিপ্লব সাধনে। ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর মত নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী যুবসংগঠন সর্বদা আপনাদের জন্য প্রেরণাশক্তি হিসাবে থাকবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের সম্মিলিত প্রয়াসে এ দেশের বুকে আক্বীদা ও আমলের বিপ্লব এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের বিপ্লব সাধিত হবে, জাহান্নামের হাত থেকে মানুষ রেহাই পাবে–এটাই আমাদের একান্ত স্বপ্নসাধ। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন!

সত্যানুসন্ধানী

রেহনুমা বিনতে আনীস
ক্যালগেরী, আলবার্টা

টেলিভিশনে দেখেছি, গল্প শুনেছি কিংবা বইয়ে পড়েছি অনেক; কিন্তু গতকালই প্রথম সরাসরি নিজের চোখে দেখলাম। আমাদের মসজিদে জুম'আর ছালাতের পর এক শ্বেতাঙ্গ ক্যানাডিয়ান ইসলাম গ্রহণ করলেন। ইমামের সাথে প্রথমে আরবীতে, অতঃপর ইংরেজীতে শাহাদাহর বাক্যগুলো উচ্চারণ করলেন। সাথে সাথে পুরো মসজিদ আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে প্রকম্পিত হ'ল। নবাগত মুসলিম ভাইটি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। ইউসুফ এস্টেস সাহেব একবার এক ব্যক্তির শাহাদাহ কবুলের পর ব্যাখ্যা করলেন, কোন ব্যক্তি যখন সত্যকে গ্রহণ করে তখন তার হৃদয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে করুণাধারা বর্ষিত হয় সে কারণেই তার দুচোখ প্লাবিত হয়, এর দ্বারা তার অতীতের সব পাপ পঙ্কিলতা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়। হয়ত তাই শুধু তিনিই নন বরং যে ভাইরা তাকে জড়িয়ে ধরে নতুন জীবনের আহ্বান জানাচ্ছিলেন, তাদের চোখেও অশ্রু বাঁধ মানছিল না।

কি আশ্চর্য, একটু আগেও যিনি আমাদের কাছে আর দশজন শ্বেতচর্ম ব্যক্তি থেকে আলাদা কিছুই ছিলেন না, তিনিই মাত্র কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করে বনে গেলেন পৃথিবীব্যাপী রঙবেরঙের কোটি কোটি মানুষের ভাই! এখন তিনি পৃথিবীর যেখানেই যাবেন সেখানেই পাবেন হাস্যোজ্জ্বল মুখে 'আস-সালামু আলাইকুম' অভিবাদন। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসবে সাদা কালো লাল হলুদ আরো কত রকম মানুষ, আত্মার বন্ধনে আবদ্ধ হবেন পৃথিবীর নাম না জানা কোন প্রান্তরের, নাম না জানা কোন চেহারার সাথে। শুধু এ কারণে যে, তারা দু'জনেই বিশ্বাস করেন এবং বলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'!

ভাবছিলাম তাদের কথা যারা জীবনটাকে সাগরপাড়ে হাওয়া খেতে যাবার মত সহজ এবং লক্ষ্যহীনভাবে যাপন করে। এ ধরণের মনোভাব আপাতদৃষ্টে আকর্ষণীয় মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এইভাবে যাপিত জীবনের ফলাফল শূন্য। প্রতিটি কাজের পেছনেই কোন না কোন কার্যকারণ থাকা চাই, নইলে সে কাজ করার পেছনে কোন স্পৃহা বা অনুপ্রেরণা কাজ করেনা। সেক্ষেত্রে এমন ধারণা করে নেয়া কতটা যুক্তিগ্রাহ্য যে আমরা যে নিজেদের এই পৃথিবীতে দেখতে পাচ্ছি যেখানে আসার বা যেখান থেকে যাবার পেছনে আমাদের কোন হাত নেই। এর পেছনে কেউ দায়ী নয় এবং আমাদের এখানে কোন দায়দায়িত্ব নেই? গোটা একটা জীবন এভাবে লক্ষ্য উদ্দেশ্যহীনভাবে কাটিয়ে দেয়া কতটা যুক্তিযুক্ত হতে পারে? মানুষ স্বভাবতই মুনাফাপ্রিয়। তাই সে প্রতিটি কাজের পেছনেই লাভ খোঁজে। অথচ অসংখ্য মানুষ নিজের জীবনটাকেই সবচেয়ে নিরর্থক শূন্যতায় সমাপ্ত করে। এই সক্ষম শরীর, এই মেধাবী মস্তিষ্ক, এই কোমল মন, এই চিন্তাশীল মনন যদি অন্য কোন প্রাণীকে দেয়া হত, তারা হয়ত সত্যানুসন্ধানকেই জীবনের লক্ষ্য স্থির করে নিত। যেমন নিয়েছেন আমাদের উপরোক্ত ভাইটি।

যখন লোকজনকে দেখি দু'কানে দু'খানা ইয়ারফোন লাগিয়ে পুরো পৃথিবীটাকে ভুলে থাকে, তখন খুব আশ্চর্য লাগে তারা যে পৃথিবীতে বসবাস করেন সেই পৃথিবীর আসল শব্দগুলোর সাথেই তারা পরিচিত হবার সুযোগ পান না। পাখির কুহুতান, নদীর কলতান, সমুদ্রের গর্জন, পাতার সরসর, জীবনের উচ্ছ্বাস, বেদনার দীর্ঘশ্বাস, বাতাসের হাহাকার সব সবকিছু চাপা পড়ে যায় গান নামে কিছু অহেতুক অনর্থক চিৎকারের কাছে। দিনরাত টিভি, গেম, আইফোন, আইপ্যাড আর ট্যাবলেটের রঙ্গিন চশমা পরে পৃথিবীর বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা এই মানুষগুলো– মানুষের দুঃখ, মানুষের আনন্দ, শিশুদের সারল্য, স্রষ্টার সৃষ্টির সৌন্দর্য, রংধনুর রঙ, কিছুই দেখতে পায়না। কিছুই তাদের চশমার স্তর ভেদ করে হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনা। সমস্যা হল, জীবনের উদ্দেশ্যবিমুখ এবং জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞ এই মানুষগুলো যখন জীবনের মুখোমুখি হয় তখন আরো অনেক সাধারণ মানুষের তুলনায় এরা জীবনের ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয় এবং জীবনের কাছে হেরে যায়। যারা নিজের জন্যই কিছু করতে পারেনা তারা অন্যের জন্য করবে কিভাবে?

এভাবে নিজের যোগ্যতার অবমূল্যায়ন করা এবং মূল্যবান সম্পদের অপব্যয় করা ক্রিমিনাল অফেন্স হিসেবে বিবেচনা করা যায়। তাই হয়ত আল্লাহ বলেছেন, কিয়ামতের দিন যেখানে তিনি সত্যানুসন্ধানীদের *সালাম* সহকারে স্বাগত জানাবেন সেখানে এদেরকে বলবেন, 'হে অপরাধীরা, আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও' *(ইয়াসীন ৫৯)*।

পৃথিবীর কোটি কোটি কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বিজ্ঞানী থেকে সাধারণ মানুষ–চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই এই সত্যের অনুসন্ধান করেছেন। কেউ খুঁজে পেয়েছেন, কেউ কাছাকাছি এসেও নিরাশ হয়েছেন, কেউ পাননি, কেউ পেয়েও বরণ করতে পারেননি। কিন্তু যে সর্বাত্মকভাবে সত্যের অনুসন্ধান করে, তার পাবার আকুতি বিফলে যায় না। সে সত্যকে পাওয়ামাত্র জীবনপণ করে আঁকড়ে ধরে সকল বাঁধাবিপত্তি তুচ্ছ করে, সত্য তার কাছেই ধরা দেয়। তাই আল্লাহ বলেন, 'যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত' *(নাহল ৯৭)*। আমরা সবাই কি এই নবাগত ভাইটির মত পবিত্র জীবন এবং উত্তম পুরস্কারের দিকে ছুটে যেতে প্রস্তুত?

পুণ্যস্রোতের অবগাহনে ক'টি দিন

-আহমাদ
নওদাপাড়া, রাজশাহী

৯ অগাস্ট ২০১২। ইফতারের তখনও ঘণ্টাখানিক বাকি। ঈদের সংক্ষিপ্ত মার্কেটিং সেরে এসে বাসায় ফিরতেই দেখি আব্বা ই'তিকাফে যাওয়ার জন্য হাতের কাজগুলো দ্রুত সেরে নিচ্ছেন। অবশ্য গত কয়েক বছর ধরে উনি নিয়মিত ই'তিকাফে বসেন। এই রামাযানের শুরুতে আমার মনে একবার উঁকি দিয়েছিল যে, এবার ই'তিকাফে বসব। তবে নানা কাজের ব্যস্ততায় সে চিন্তা মাথা থেকে প্রায় হারিয়েই গিয়েছিল। যদিও একেবারে ভুলিনি, যার প্রমাণ দু'দিন আগে একবার স্মরণ হয়েছিল। তবে কাজের চাপ দেখে ধরেই নিলাম যে এবার আর সম্ভব না। তাই কোন পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না। কিন্তু আজ আব্বার শশব্যস্ত প্রস্তুতি দেখে দোটানায় পড়ে গেলাম। তিনি বললেন, 'আল্লাহর নাম করে চল, কাজগুলো পরেও করা যাবে'। অবশেষে ভাবাভাবি ছেড়ে দিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললাম, নিয়ত যখন করেছি এবার বসব। আবার কবে এমন সুযোগ আসবে তার তো কোন নিশ্চয়তা নেই। এটাই আমার প্রথমবারের অভিজ্ঞতা। তাই বাসা থেকে বের হওয়ার

মুহূর্তে মনে উঁকি দিল টানা দশদিন দিন থাকতে হবে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে? পারব তো! আল্লাহ ভরসা।

মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণে সারি বাধা ৭টি হুজরা। উত্তর দিকে আব্বার পার্শ্বের হুজরাটিই আমার। ১ম রাতে জামা'আতের সাথে তারাবীহ্‌র ছালাত আদায়ের পরই শুয়ে পড়লাম। রাত ৩টা বাজলে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গল। ফ্লোরে নিজেকে আবিষ্কার করে ধাতস্থ হতে বেশ সময় লাগল। স্মরণ হল গত রাত থেকে আমি মসজিদের বাসিন্দা। সাহারীর আযান হচ্ছে। বিছানায় শুয়ে থেকে শূন্য দৃষ্টিতে নির্নিমেষ তাকিয়ে রয়েছি মসজিদের উঁচু ছাদের দিকে। রাতের আধার চিরে উচ্চস্বরে কেপে কেপে ছড়িয়ে পড়ছে আযানের সমধুর ধ্বনি। খুব মন দিয়ে শুনলাম। অন্তরটা যেন এক অদ্ভুত ভাললাগার অনুভূতিতে ভরপুর হয়ে গেল। আযানের ধ্বনি এতটাই হৃদয়স্পর্শী হতে পারে! প্রতিটি বাক্যের মধ্য দিয়ে যে জীবন্ত আবেদনের অনুরণন ঘটল, তা উপলব্ধির এত নিবিঢ় সুযোগ আগে কখনও পাইনি। এরপর থেকে প্রতিরাতেই নিশুতি রাতের এই আযান শোনার মোহে আমি আগেভাগেই জেগে উঠতাম। শুধু তাই নয় ই'তিকাফের ১০দিনে আমার নিয়মিত কাজ ছিল প্রতি ওয়াক্তে আযান শোনার জন্য বিশেষ সময় বরাদ্দ রাখা।

১ম দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে গোসল সেরে ছালাতুয যোহা আদায় করলাম। যতদূর মনে পড়ে জীবনের প্রথম আমার এই ছালাত আদায়। তারপর টানা যোহর পর্যন্ত কুরআন তেলাওয়াত এবং কুরআনের অর্থ ও তাফসীর পড়লাম। যোহরের আযান হলে ফরয-নফলসহ যোহরের ছালাত আদায়, দুপুরে আবার পড়াশোনা, একটু ঘুমিয়ে নেয়া, আবার আছরের ছালাত আদায়, ছালাতের পর ইফতারের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন ইসলামী বই পড়া, সবাই মিলে ইফতার করে মাগরিব ছালাত আদায়, বাদ মাগরিব আবার পড়াশোনা, তারপর এশা ও তারাবীর ছালাত আদায়, রাতে একসাথে খাওয়া-দাওয়া, খাওয়া শেষে ঘুম না ধরা পর্যন্ত পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া–এই ছিল আমাদের নিত্যকার কার্যক্রম। বিজোড় রাত্রিগুলোতে রাত ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত কুরআন তেলাওয়াত, অতঃপর তাহাজ্জুদের আযান হলে ৫ রাক'আত বিতর ছালাত আদায় করে সাহারী গ্রহণ করতাম। এভাবে সুস্থির ইবাদত-বন্দেগীর মধ্য দিয়ে চমৎকার ১০টি দিন কেটে গেল চোখের নিমিষেই। কোন ফোন-মোবাইলের জ্বালা-যন্ত্রণা নেই। নেই যান্ত্রিক জীবনের কোন স্পর্শ। কোন পিছুটান নেই। দিন-দুনিয়ার সাথে প্রায় শতভাগ সংযোগবিহিন। যরুরী প্রয়োজনে অগন্তুকদের সাথে কথাবার্তা যদিও বেশ বলতে হয়েছে, তবে তা নিত্যদিনের তুলনায় কিছুই নয়। হুজরার মাঝে শুয়ে শুয়ে কখনও কল্পনায় ভেসে আসত হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন রাসূল (ছাঃ)-এর কথা। আল্লাহ্‌র নিবিঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য পূর্বযুগে এজন্যই হয়ত পুণ্যবান মানুষরা বৈরাগ্যবাদী হয়ে পড়তেন। এমনিতেই নির্জনতা আমার খুবই প্রিয়, তারপর সুশৃংখল ইবাদতে লিপ্ত থেকে একেবারে নিজস্ব জগতের মধ্যে এমন বুদ হয়ে ডুবে থাকার সুযোগ পেয়ে মনটা খুব প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। ২৮ রমযানের দিন। সে রাতে সঊদীআরবে চাঁদ উঠার কথা। কেবলই মনে হচ্ছিল যদি চাঁদটা আজ না উঠত! তারাবীর ছালাত পড়ছি আর ভাবছি হয়ত এটাই এ যাত্রায় শেষ তারাবী। বিষন্ন চিত্তে হুজরায় ফিরতেই জানতে পারলাম আজ সৌদিআরবে চাঁদ উঠে নি। অর্থাৎ আরো একটি দিন বোনাস পাওয়া গেল। একটু পরই কাফী ভাই হুজরায় ঢুকলে সুখবরটা দিলাম। জানতাম খুশী হবে। কিন্তু তার চোখের তারায় অব্যক্ত আনন্দের ঝিলিক যেভাবে চমকাল, তাতে বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। সত্যিই পূণ্যস্রোতে অবগাহনের এই যে শুচিতা, এ যে প্রখর চুম্বকীয় অনুভূতি তার কোন তুলনা নেই। মনে হল, এ মহাগুপ্তধনের সন্ধান যে একবার পেয়েছে, তার আর পিছু ফেরার কোন অবকাশ থাকে না। জীবনটা যার পান্থজনের সামান্য আশ্রয়স্থল, গন্তব্যের পানে চেয়ে যার নিত্যদিনের অস্থির অপেক্ষা, যাত্রাপথের যে কোন ক্ষুদ্র প্রাপ্তিতেও তার সত্তাজুড়ে বিজয়ের ঔজ্জ্বল্য ঝলমল করবে–এটাই স্বাভাবিক। বুঝতে পারছি এ আকর্ষণের হাতছানিকে উপেক্ষা করা খুব সহজ নয়।

ঈদের চাঁদ উঠার পর বিদায়ের পালা। মসজিদবাসীরা সবাই সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দো'আ চেয়ে মসজিদ ছেড়ে বেরিয়ে এল। বিষন্নতা আর পরিতৃপ্তি মাখা অপরিচিত অনুভূতি নিয়ে বাসায় ফিরছি। যাওয়ার সময় মনে হচ্ছিল দীর্ঘ দশদিন আটক থাকতে হবে, আর আজ ফিরে আসার দিন মনে হচ্ছে যেন স্বাধীন জীবন ফেলে আটকা পড়তে যাচ্ছি আবার পরাধীনতার নির্মম শিকলে।

আমি, অশীতিপর একজন বৃদ্ধ এবং একটি স্বপ্ন

হাসান ফেরদাউস
বালিয়াপুকুর, রাজশাহী

এক.

'বাবা, তুমি কেমন আছ?' 'অশীতিপর বৃদ্ধ লোকটি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। তার সারা শরীর ঘামে ভেজা। পাতলা মলিন পাঞ্জাবির বাইরে দিয়ে ভেতরের জীর্ণ শরীরটা দেখা যাচ্ছে। মাথার সাদা চুলগুলো রুক্ষ, এলোমেলো। মুখমণ্ডলে ক্লান্তির ছাপ। চোখ দু'টো কোটরের ভেতরে ঢোকানো।

আমি চুপ করে রইলাম। বলার মতো কোন ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ তার মাঝে অস্থিরতার সঞ্চার হল। ডান হাত দিয়ে আমার শরীরটা তিনি স্পর্শ করতে চাইলেন। কিন্তু তারপরই হাতটা সরিয়ে নিয়ে একটু ইতস্তত করে বললেন, 'আমি মন দিয়া চা বেচতাছি। তুমি আইবা কইছিলা, কবে আইবা?' আমি মাথা নিচু করে ফেললাম। অনুশোচনা গ্রাস করল আমাকে।

ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ খুলে দেখি চোখের কোণটা ভেজা। বিছানা ছেড়ে উঠে এক গ্লাস পানি খেলাম।

দুই.

সময়টা ২০০৩ সালের মাঝামাঝি। আমি তখন সবে গ্র্যাজুয়েশনের ফাইনাল ইয়ারে উঠেছি। হোস্টেলেই থাকতাম। পড়ালেখার পাশাপাশি দু'একটা টিউশনি করাতাম।

শুক্রবার ছিল সেদিন। দুপুরে খাবার পর বের হলাম স্টুডেন্টের বাসার উদ্দেশ্যে। গন্তব্য, বখশিবাজার মোড় থেকে রাজারবাগ। দুপুরের কাঠফাটা রোদে দরদর করে ঘামছি আমি। রাস্তায় কোন খালি রিক্সা নেই। দু'একটা যাও এলো, রাজারবাগের দিকে যাবে না। মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল। দেরী করে গেলে স্টুডেন্টের মা কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়বেন না। যেন মাসে দুইটা হাযার টাকা দিয়ে আমাকে কিনে নিয়েছেন। তারপরেও ছাড়ি না টিউশনিটা। মনকে সান্ত্বনা দেই, মাঝে মাঝে একটু খারাপ কথা না হয় শুনলামই। তারপরেও তো মাসে হাযার দু'য়েক টাকা আসছে।

এদিক ওদিক তাকালাম। একটাও খালি রিক্সা নেই। হঠাৎ 'স্যার, কই যাইবেন?' পিছন থেকে হঠাৎ ক্ষীণ একটা ডাক শুনে আমি চমকে উঠলাম। ঘুরে তাকিয়ে দেখি, অশীতিপর সাদা শশ্রুমণ্ডিত এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে। পরনে তার ময়লা একটা পাঞ্জাবি আর ছেড়া লুঙ্গি।

আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বৃদ্ধ অনেকটা জোর করেই তার রিক্সায় আমাকে নিয়ে উঠালো। তারপর তার শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে প্যাডেল মেরে অনেক কষ্টে রিক্সাটাকে অল্প খানিকটা নিয়ে গেল। বেশি দূর টানতে পারলনা। কিছুটা দূরে গিয়ে এক সময় রিক্সাটা থেমে গেল।

আমি নামলাম রিক্সা থেকে। বৃদ্ধ লোকটিও নামল। অপরাধীর মতো সে মাথা নিচু করে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। ভাল করে খেয়াল করে দেখলাম, তার ডান হাতের তর্জনী ময়লা একটা কাপড় দিয়ে পেঁচানো। কেটে গিয়েছে মনে হয়।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মুরুব্বী, আপনার শরীরের অবস্থা তো ভাল না, আপনি রিক্সা চালাইতেছেন ক্যান?' বৃদ্ধ লোকটি বিব্রত ভঙ্গিতে আরও জড়সড় হয়ে দাঁড়াল, যেন এত কঠিন একটা প্রশ্নের সম্মুখীন সে জীবনেও হয়নি। তারপর বলল, 'বাবা, রিক্সা না চালাইলে আমারে আর আমার বউরে খাওয়াইবো কেডা?'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ক্যান, আপনার ছেলে মেয়ে নাই?' বৃদ্ধ বললো, 'বাবা, আমার বয়স আশি পার হইছে। দুইটা বেটা আমার। বিয়া দিছি ওগোরে। হ্যার পর বউ নিয়া আলাদা থাকে। আমার আর আমার বউরে খাওন দেয় না হ্যারা, খোঁজ-খবরও লয় না। না খাইয়া মারা যাওনের থেইকা রিশকা চালাইয়া যদি কিছু টেকা পাই...'। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলতে গিয়ে হাঁপিয়ে গেলেন বৃদ্ধ, গলা ধরে এলো তার।' 'সারাদিনে কত টাকা কামাইছেন আজকে?' জিজ্ঞেস করলাম তাকে। তিনি বললেন, 'দুপুর বারোটা থেইকা আধা বেলার লাইগা রিক্সাডা নিছি। মহাজনরে চল্লিশ টেকা দেওন লাগবো সন্ধ্যার সময়। কিন্তু কেউ আমার রিশকায় উঠেনা বাবা। চালাইবার পারিনা তো, তাই...। এই পর্যন্ত বিশ টেকা কামাইছি। রিক্সার চাক্কা ফুটা হইছিল, সাত টেকা খরচা হইছে সারাইতে। পকেটে অহন বাকী তের টেকা আছে।'

রিক্সাটা সাইডে চাপিয়ে রাস্তার পাশের চায়ের দোকানটাতে তিনি বসলেন আমার সাথে। ড্রামের ভেতর থেকে গেলাসে করে পানি নিয়ে ঢক ঢক করে এক নিঃশ্বাসে শেষ করলেন। আমি তাকিয়ে দেখলাম অবহেলিত অশীতিপর এক বৃদ্ধ মানুষের পানি খাওয়ার দৃশ্য। তারপর তিনি দোকানের পলিথিনে ঝুলতে থাকা সস্তা দামের বন রুটির দিকে তাকালেন। পরক্ষণে চোখ ফিরিয়ে নিতেই আমার সাথে চোখাচোখি হল। আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'আপনি পেট ভরে খান, নিশ্চিন্ত মনে খান, কোন টাকা আপনাকে দিতে হবেনা।'

তার খাওয়া শেষ হলো। কোমরে পেঁচানো ময়লা গামছাটা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, 'চলেন, রওনা হই।' আমি বললাম, 'না, একটু কাজ আছে আমার।' তারপর তাকে ওখানে দাঁড় করিয়ে রেখে হোস্টেলে ফিরে এলাম। মাথায় শুধু একটা কথাই ঘুরপাক খাচ্ছিল, এই মানুষটিকে একলা ছেড়ে দেয়া যাবেনা। কোন ভাবেই না। কিছু একটা করতে হবে তার জন্যে। পকেটে ছিল চারশো টাকার কিছু বেশি। বন্ধু সুকান্তকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে ওর থেকে ধার নিলাম পাঁচশ টাকা। এই নয়শ টাকা নিয়ে আবার এলাম সেই বৃদ্ধ রিকশাওয়ালার কাছে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মুরুব্বি, আপনেরে যদি আমি চা-এর ফ্লাস্ক কিনা দেই, আপনে ঘুইরা ঘুইরা চা-বিস্কুট বেচতে পারবেন?' তিনি প্রথমে একটু ইতস্তত বোধ করলেন। তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে জানালেন, পারবেন।

এরপর তার রিক্সাটা হোস্টেলের ভেতরে একটা নিরাপদ জায়গায় রেখে তাকে নিয়ে গেলাম নিউমার্কেটে। দু'জনে মিলে ঘুরে ঘুরে অনেক দেখে শুনে একটা চা বিক্রির ফ্লাস্ক কিনলাম। তারপর চায়ের পাতা আর কাপ, বিস্কুট। আমি খুব ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম, বৃদ্ধ মানুষটি হঠাৎ করেই যেন আনন্দের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছিলেন। উত্তেজনায় তার হাত এখন আগের থেকে অনেক বেশি কাঁপছে। চায়ের ফ্লাস্ক কেনার সময় আমি প্রথমে একটা পছন্দ করলাম। কিন্তু তিনি বললেন, 'তাড়াহুড়া কইরোনা বাবা, দাম দিয়া একটা জিনিস কিনুম, দেইখা শুইনা কিনি, কি কও?'

কেনাকাটা শেষ করে আমরা আবার ফিরে এলাম হোস্টেলে, যেখানে তার রিক্সাটা রেখে গিয়েছিলাম। এরপর একটা রিক্সাসহ রিক্সাওয়ালা এবং আরেকজন শুধু রিক্সাওয়ালাকে ভাড়া করলাম তাকে আর তার নিজের রিক্সাটিকে তার বাসা পর্যন্ত পৌছে দেবার জন্যে। বিদায় নেবার সময় তিনি বললেন, 'বাবা, তুমি আইজকা যে কাজটা করলা, আমি সারাজীবন মনে রাখুম। গেণ্ডারিয়া রেল ইশটিশনের পাশে বস্তিতে আমি থাকি। ওইহানে গেলেই আমারে পাইবা। আর অহনে তো আমি ইশটিশনেই চা বেচুম। কবে আইবা তুমি?'

'আসুম মুরুব্বি, একটু সময় পাইলেই চইলা আসুম'।-আশ্বস্ত করলাম তাকে। 'আইসা আপনেরে একটা দোকান কইরা দিমু'।-কথাটা বললাম মন থেকেই।

এরপর অনেক দিন পার হয়ে গেলো। পড়ালেখার পাট চুকিয়ে ক্যাম্পাস ছাড়লাম। চাকুরীতে ঢুকলাম। জীবন যুদ্ধে লড়াই করতে করতে ভুলেই গেলাম সেই অশীতিপর বৃদ্ধের কথা।

তিন.

২০১০ সাল। অফিসের কাজে গেণ্ডারিয়া যেতে হল। রেল ষ্টেশনের কাছের বস্তিতে যখন গেলাম, হঠাৎ মনে পড়ল সাত বছর আগের সেই বৃদ্ধ লোকটির কথা। কৌতূহলবশতঃ খোঁজ নিলাম। প্রথমে কেউ কিছুই বলতে পারলনা। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর জানতে পারলাম, বছর দু'য়েক আগে এক চা বিক্রেতা বৃদ্ধ লোক চা বিক্রি করতে গিয়ে ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে মারা গিয়েছেন।

খবরটা শুনে আমি কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে থাকলাম। ২০০৩ সালের সেই দিন আমি তার নাম জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম। তাই, ঐ মানুষটাই যে এই মানুষ, এটা প্রমাণ করাটা কষ্টকর হলেও মনে মনে বললাম, তাকে আমার একটা দোকান করে দেবার কথা ছিল, সেটা করে দিতে পারলাম না। আমি দোষী। বিধাতা, ক্ষমা করো আমাকে।

এখন মাঝে মাঝেই ঐ স্বপ্নটা দেখি। একজন অশীতিপর বৃদ্ধ লোক এসে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'বাবা, তুমি কেমন আছ?' আমি চুপ করে থাকি। তিনি তার হাত দিয়ে আমাকে স্পর্শ করেন, তারপর ইতস্তত করে বলেন, 'আমি মন দিয়া চা বেচতাছি। তুমি আইবা কইছিলা, কবে আইবা?

কথাবলার কুরআনী আদব

১. সর্বদা সত্য কথা বলতে হবে (৩/৭)।
২. স্পষ্টভাষী হতে হবে (৩৩/৭০)।
৩. ন্যায় কথা বলতে হবে (৬/১৫২)।
৪. দয়াদ্রভাবে কথা বলতে হবে (২/৮৩)।
৫. নম্র ভাষায় কথা বলতে হবে (১৭/৫৩)।
৬. সংগত কথা বলতে হবে (১৭/২৮)।
৭. ভদ্রভাবে কথা বলতে হবে (২০/৪৪)।
৮. সুসভ্যভাবে কথা বলতে হবে (১৭/২৩)।
৯. অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকতে হবে (২৩/৩)।
১০. মিথ্যা কথা বর্জন করতে হবে (২২/৩০)।
১১. পশ্চাতে কথা বলা পরিহার করতে হবে (৪৯/১২)।
১২. প্রমাণবিহীন কোন কথা বলা যাবে না (২/১১১)।
১৩. গালি-গালাজ করা যাবে না (৩৩/৫৮)।

সংগঠন সংবাদ

কেন্দ্র সংবাদ

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রশিক্ষণ ২০১২

৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ বৃহস্পতিবার : অদ্য বিকাল ৪টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রশিক্ষণ ২০১২ অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব মুযাফ্ফর বিন মুহসিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি এবং সম্মানিত প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। মুহতারাম প্রধান অতিথি 'পাশ্চাত্য সভ্যতা বনাম ইসলামী সভ্যতা' এবং 'যুবসংঘের কর্মীদের গুণাবলী ও কর্তব্য' বিষয়ে দীর্ঘ প্রশিক্ষণ দান করেন এবং কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের জওয়াব দান করেন। উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন ২০১২
মুযাফ্ফর বিন মুহসিন কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচিত

৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ শুক্রবার : অদ্য সকাল ৮টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রশিক্ষণ ২০১২' অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব মুযাফ্ফর বিন মুহসিন উক্ত সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। স্বাগত ভাষণে কেন্দ্রীয় সভাপতি সংগঠনের সর্বোচ্চ স্তরের কর্মী হিসাবে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যগণ এই সংগঠনের স্থায়ী খুঁটি। সংগঠনের মজবুতির জন্য এই খুঁটির মজবুতিই সর্বাধিক যরূরী। তিনি সকল কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যকে আল্লাহ্র পথের সুযোগ্য দাঈ হিসাবে সমাজের বুকে সাহসী ভূমিকা রাখার জন্য উদাত্ত আহবান জানান। সম্মেলনে আরো বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম এবং কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক আব্দুল হালীম প্রমুখ। বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন যেলা থেকে আগত কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ। এছাড়া সদ্য মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশীপপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদ্বয় মুকাররম বিন মুহসিন এবং মুহাম্মাদ কিবরিয়াকে বিদায়ী সংবর্ধনা দেয়া হয়।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম এবং ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, আগামীর যুবসমাজকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকজ্জ্বল রাজপথে পরিচালনার জন্য 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'কে আরো বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। বিগত ৩৩ বছর ধরে 'যুবসংঘ' এ দেশে শিরক ও বিদ'আতমুক্ত ইসলামের বিশুদ্ধ বার্তা প্রচারে অসামান্য ভূমিকা রেখে আসছে। এ গৌরবোজ্জ্বল ধারাকে বাতিলের শত বাঁধাও যেন স্তিমিত করতে না পারে এজন্য কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের কাছে তিনি আবেগঘন ওয়াদা গ্রহণ করেন।

সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের পরামর্শক্রমে ২০১৩-২০১৪ সেশনের জন্য 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফ্ফর বিন মুহসিনকে পুণরায় মনোনীত করেন এবং বায়'আত গ্রহণ করেন। উপস্থিত কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং তার সার্বিক সফলতার জন্য দো'আ করেন। কেন্দ্রীয় সভাপতি এই গুরু দায়িত্ব পালনে সকলের সহযোগিতা ও আন্তরিক দো'আ কামনা করে বৈঠক শেষের দো'আ পাঠের মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য, জনাব মুযাফ্ফর বিন মুহসিন বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে পিএইচ.ডি গবেষণারত এবং 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র শিক্ষক হিসাবে কর্মরত রয়েছেন। একজন তরুণ সুযোগ্য দাঈ ইলাল্লাহ, লেখক ও গবেষক হিসাবে তিনি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি পিস টিভি বাংলার নিয়মিত আলোচক এবং দারুল ইফতা 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর সদস্য।

দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০১২

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর নিয়মিত দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০১২ আগামী ২০ আগস্ট ২০১২ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ। রাজধানী ঢাকার 'ইঞ্জিনিয়ার্স ইনিস্টিটউশন মিলনায়তন'-এ আয়োজিত এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বক্তব্য রাখবেন যুবসংঘের কেন্দ্রীয় ও যেলা নেতৃবৃন্দ।

যেলা সংবাদ

০২ আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বেলা ৩-টায় নগরীর সাফাওয়াং চাইনিজ রেস্টুরেন্টে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, নোংরা দলীয় রাজনীতি ও অনৈসলামী সংস্কৃতির নামে শয়তানী আগ্রাসন হ'তে তোমরা সর্বদা দূরে থাকবে। আখেরাতে সফলতা লাভকে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করবে। জ্ঞানার্জনের জন্য আমি তোমাদেরকে রাজনীতির মিছিলে নয়, বরং সর্বদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে ও লাইব্রেরীতে দেখতে চাই। তোমরা প্রকৃত মানুষ হও। শিক্ষা মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তোমরা কুরআন ও হাদীছের দু'টি আলোকস্তম্ভ থেকে আলো নিয়ে পথ চলবে। ইনশাআল্লাহ তোমরা ইহকাল ও পরকালে সফলকাম হবে।

'যুবসংঘ' রাবি শাখার সভাপতি হাফেয মুকাররম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফ্ফর বিন মুহসিন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সৈয়দ আবু আব্দুল্লাহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব। এতে উত্তর প্রদান করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফ্ফর বিন মুহসিন। অনুষ্ঠানটি বিকাল ৩ টা থেকে শুরু হয়ে ইফতার-এর মাধ্যমে শেষ হয়। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ' রাবি শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মান্নান।

রাজশাহী ০৮ আগস্ট বুধবার : অদ্য বেলা সাড়ে ৩-টায় নগরীর সাফাওয়াং চাইনিজ রেস্টুরেন্টে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, যে কোন মূল্যে নিজেকে আল্লাহ্র পথে ধরে রাখো। আখেরাতে সফলতা লাভকে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করো। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে তোমরা আত্মনিবেদিত হও! মহানগর 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুখতারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ শরীফুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ ইদরীস আলী।

সাম্প্রতিক মুসলিম বিশ্ব

আরাকানে নির্বিচারে মুসলিম গণহত্যা

গত ২৮ মে মায়ানমারের আকিয়াব শহরের রাম্ব্রী গ্রামের এক রাখাইন শিক্ষিকা কর্তৃক ছাত্র পিটানোকে কেন্দ্র করে অভিভাবক ও শিক্ষকদের গালিগালাজ ও উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে এক শিক্ষিকা মারা যান। এর সূত্র ধরে ৩ জুন আকিয়াব শহর থেকে গাড়ি যোগে তাবলীগ জামা'আতের একটি দল ইয়াঙ্গুন যাওয়ার পথে ৩ জুন টংগু নামক স্থানে পৌঁছলে রাখাইন যুবকরা গাড়ির হেলপারসহ তাবলীগ জামা'আতের ১০ সাথীকে পিটিয়ে হত্যা করে। নির্মম এ হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবীতে ৫ জুন মুসলমানরা ইয়াঙ্গুন শহরে বিক্ষোভ সমাবেশ করে। এ ঘটনায় মুসলিম অধ্যুষিত পুরো আরাকান রাজ্যে ব্যাপক সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ার আশংকায় ইয়াঙ্গুনে শীর্ষ মুসলিম নেতারা বৈঠক করে। ৮ জুন শুক্রবার জুম'আর ছালাতে মুসলমানদের জমায়েত করে শান্ত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ৮ জুন পুরো আরাকানে জুম'আর ছালাতে মুছল্লীরা সমবেত হতে থাকে। মংডু শহরের মারকায মসজিদে জুম'আর ছালাত চলাকালে মংডু বৌদ্ধদের ইউনাইটেড হোটেল থেকে মসজিদের মুছল্লীদের উপর পাথর নিক্ষেপ করা হয়। এতে বিক্ষুব্ধ মুসলমানদের সাথে রাখাইন ও সরকারী নাসাকা বাহিনীর সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। নাসাকার গুলীতে কয়েকজন মুসলিম নিহত হ'লে পুরো আরাকানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। দাঙ্গা সামাল দিতে সেখানে সেনাবাহিনী নামানো হয়। ১০ জুন জারী করা হয় সান্ধ্য আইন।

সরকারের লেলিয়ে দেয়া বাহিনীর হাতে সেখানে বহু মুসলিম রোহিঙ্গা যুবক-যুবতী, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নিহত হয়। রাখাইন যুবকদের হাতে ধর্ষণের শিকার হয়েছে অসংখ্য মুসলিম যুবতী। দেশটির নাসাকা ও রাখাইন যুবকরা মিলে রোহিঙ্গা মুসলিম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অপহরণ করেছে। রাতের আধারে একযোগে চালায় লুটতরাজ, মসজিদ ও বসতভিটাতে অগ্নিসংযোগ। অনেক রোহিঙ্গা মুসলিম সহায়-সম্পদ হারিয়ে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছে। মুসলমানদের রক্তস্রোতে ভাসছে পুরো আরাকান রাজ্য। অসহায় শিশু, কিশোর, ধর্ষিতা, মযলুম মানুষের আর্তনাদে সেখানকার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এ পর্যন্ত দাঙ্গায় ৬ শতাধিক রোহিঙ্গা নিহত হয়েছে। নিখোঁজ হয়েছে ১২ শতাধিক। উদ্বাস্তু হয়েছে প্রায় ৯০ হাজার মানুষ। এদিকে জীবন বাঁচাতে সীমান্ত পেরিয়ে আসা রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদেরকে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী অমানবিকভাবে জোরপূর্বক মিয়ানমারের দিকে ফেরৎ পাঠায়। এসব অনাহারী বাস্তুহারাদের ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত কী ঘটেছে তা জানা যায় নি। তবে নাসাকা বাহিনী বেশ কিছু নৌকা ডুবিয়ে দিয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়। এছাড়া সাগরে বহু লাশ ভাসতে দেখা গিয়েছে। উল্লেখ্য যে, বৌদ্ধ প্রধান মায়ানমার সরকার মুসলিম জাতিভুক্ত রোহিঙ্গাদেরকে সে দেশের নাগরিক হিসাবে স্বীকার করে না। এজন্য তারা বিভিন্ন কৌশল ও সুযোগে 'এথনিক ক্লিনজিং'-এর অংশ হিসাবে রোহিঙ্গাদের উপর নির্বিচার গণহত্যা চালিয়ে আসছে গত ১০০ বছর ধরে। ফলে মিয়ানমারে বসবাসরত ৮ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা পরিণত হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রবিহীন জনগোষ্ঠীতে।

মুহাম্মাদ মুরসী মিসরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

মিসরের ঐতিহাসিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতা মুহাম্মাদ মুরসী। গত ২৪ জুন রোববার মিসরের নির্বাচন কমিশন তাঁকে বিজয়ী ঘোষণা করে এবং ৩০ শে জুন তিনি মিসরের ৫ম প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। ইতিহাসের কি নির্মম পরিহাস! মাত্র দেড় বছর আগেও হোসনী মোবারক সরকারের আমলে যে মুরসী ছিলেন কারাগারে, তিনিই এখন মিসরের প্রেসিডেন্ট। আর মোবারক আজ কারাগারের অন্ধপ্রকোষ্ঠে মৃত্যুর প্রহর গুণছেন নিত্য।

মুরসী ৫১ দশমিক ৭৩ শতাংশ ভোট পেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী হোসনী মোবারকের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আহমাদ শফীককে পরাজিত করেছেন। জয়লাভের পর তিনি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন। তবে ২৯ ও ৩০ জুন তারিখে তিনি তাহরীর স্কয়ারে এবং কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বক্তৃতা দেন তা একদিকে যেমন প্রকৃত ইসলামপন্থীদের হতাশ করেছে, তেমনি প্রমাণ করেছে যে, তিনি ইসলামী শরী'আ আইন প্রতিষ্ঠার চিন্তা কোনভাবেই করছেন না। একইভাবে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন, বর্তমান সময়ে ধর্মনিরপেক্ষতার কোন বিকল্প নেই।

এদিকে দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের আগে সুপ্রিম সামরিক কাউন্সিল নিজেদের হাতে অনেক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে যে ডিক্রি জারি করেছিল তা বেশ শক্ত হাতেই প্রতিরোধ করেছেন মুরসী। জুলাইয়ের শুরুতেই তিনি নিজস্ব ক্ষমতাবলে এই ডিক্রি বাতিল ঘোষণা করেন। অতঃপর ১২ আগস্ট তিনি সেনাপ্রধান তানতাভী এবং সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ সামী আনানকে পদত্যাগ করাতে বাধ্য করেন। তাঁর এই কঠোর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তেমন কোন হুমকি না আসায় বিষয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে বেশ সাড়া পড়ে যায়। ২৭ আগস্ট তিনি ২১ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেন যাতে ৩ জন মহিলা এবং ২ জন খৃষ্টান রয়েছেন। মোটামুটি যোগ্যতার সাথে এবং শক্ত হাতে দেশ পরিচালনা করতে পারবেন বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে মুহাম্মাদ মুরসির প্রাথমিক ক্রিয়াকলাপে। ভবিষ্যতই বলে দিবে, ইতিহাসে তিনি কেমন শাসক হিসাবে নিজেকে প্রমাণিত করতে সক্ষম হবেন।

মালির সালাফী সংগঠন আনছারুদ্দীন শিরকের আড্ডাখানা গুঁড়িয়ে দিল

সম্প্রতি মালির উত্তরাঞ্চলের দুই-তৃতীয়াংশে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে সালাফী বিদ্রোহী সংগঠন আনছারুদ্দীন এবং এমএনএলএ। অতঃপর তারা দখলীকৃত টিম্বুকটু শহরের ছূফী সাধকদের বড় বড় মাযারসমূহ ভেঙে ফেলতে শুরু করেছে। ইসলামী শরী'আতের কট্টর অনুসারী এই সংগঠনটি মুসলিম ছূফী সাধকদের এসব সমাধিকে মূর্তি হিসাবে বিবেচনা করে। বিগত বছরগুলোতে আফগানিস্তান, মিসর ও লিবিয়ায় ছূফী সাধকদের বিভিন্ন সমাধিতে হামলা করেছিল এই সংস্কারপন্থী সালাফীরা। ইতিমধ্যে তারা সিদি মাহমূদ সমাধিসহ আরও দুটি স্তম্ভ সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলেছে। মূলতঃ পুরো মালিতে ইসলামী শরী'আ আইন চালু করতে এবং সকল প্রকার শিরকের মূলোৎপাটন চায় এই সালাফী সংগঠনটি।

রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে কুরুচিপূর্ণ চলচ্চিত্র প্রকাশ

সম্প্রতি আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় তৈরীকৃত 'ইনোসেন্স অফ মুসলিমস' নামে প্রকাশিত একটি চলচ্চিত্রে রাসূল (ছাঃ)-কে অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। জানা গেছে যে, এ বছরের জুলাই মাসে চলচ্চিত্রটি প্রথম প্রকাশিত হয় ইংরেজী ভাষায় এবং একটি প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হয়। সে সময় ১৪ মিনিটের একটি পার্ট ইউটিউবে আপলোড করা হয়। তবে বিষয়টি তখন প্রচার পায়নি। অতঃপর সেপ্টেম্বরের শুরুতে প্রযোজকরা এই চলচ্চিত্রাংশটি আরবীতে ডাবিং করে আপলোড করে। এরপর ৮ সেপ্টেম্বর মিসরের 'আন-নাস' টিভিতে ইউটিউবের এই কাটপিসটি প্রদর্শিত হলে সর্বপ্রথম বিষয়টি জনসম্মুখে আসে। ১১ সেপ্টেম্বর থেকে মিসর ও লিবিয়ায় এ ন্যক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ জনতা সহিংস হয়ে উঠে এবং মার্কিন দূতাবাসে হামলা চালায়। ঐদিনই লিবিয়ার বেনগাজীতে মার্কিন দূতাবাসে এক ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টোফার ইভান্স নিহত হন। এ ঘটনায় সারাবিশ্বে মুসলিম সংগঠনগুলো বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য জোর দাবী জানায়। বেশ কয়েকটি দেশে মার্কিন দূতাবাসে হামলার ঘটনা ঘটে। কিন্তু আমেরিকান সরকার বাকস্বাধীনতার দোহাই দিয়ে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। উল্লেখ্য যে, ইসলাম ধর্ম ও রাসূল (ছাঃ)-কে বিদ্রূপ করে নির্মিত এই ঘৃণ্য চলচ্চিত্রটি প্রচারে ইহুদীদের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার কথা প্রকাশ পেয়েছে।

সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ বিষয়াবলী)

১.প্রশ্ন : বাংলাদেশে বর্তমানে ইউনিয়নের সংখ্যা কতটি?
উত্তর : ৪,৫০০টি।
২.প্রশ্ন : বাংলাদেশের বৃহত্তম গ্রামের নাম কি?
উত্তর : বানিয়াচং (হবিগঞ্জ)।
৩. প্রশ্ন : বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইউনিয়নের নাম কি?
উত্তর : সাজেক ভ্যালি, মাছালং, বাঘাইহাট, রাঙামাটি (৬০৬ বর্গ মাইল)।
৪. প্রশ্ন : প্রস্তাবিত আইটি ভিলেজ কোথায় স্থাপিত হচ্ছে?
উত্তর : যশোর।
৫. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে স্থলবন্দর কতটি?
উত্তর : ১৭ টি।
৬. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে নদী বন্দর কতটি?
উত্তর : ২২টি (ফেরীঘাট ১১টি)।
৭. প্রশ্ন : বাংলাদেশের ৩১০টি নদ-নদীর মধ্যে কোন নদীকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে?
উত্তর : ভোলা।
৮. প্রশ্ন : বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (BSS)-এর প্রতিষ্ঠাকালীন সম্পাদক কে?
উত্তর : ফয়েজ আহমদ।
৯. প্রশ্ন : রোহিঙ্গা মুসলিম শরণার্থীরা কোন দেশের অধিবাসী?
উত্তর : মিয়ানমার।
১০. প্রশ্ন : আইভরিকোষ্টের মান শহরে অবস্থিত 'পতিবিআপ্পু' গ্রামের বর্তমান নাম কি?
উত্তর : রূপসী বাংলা।
১১. প্রশ্ন : দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রেল বন্দর কোনটি?
উত্তর : রহনপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
১২. প্রশ্ন : প্রধানমন্ত্রী মোবাইল ফোনে বাংলায় এসএমএস (SMS) উদ্বোধন করেন কবে?
উত্তর : ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১২।
১৩. প্রশ্ন : যাত্রী পরিবহনে বাংলাদেশের বৃহত্তম নদী বন্দর কোনটি?
উত্তর : ঢাকা (দ্বিতীয় বরিশাল)।
১৪. প্রশ্ন : প্রস্তাবিত টাকার জাদুঘর কোথায় স্থাপিত হচ্ছে?
উত্তর : বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী, মিরপুর।
১৫.প্রশ্ন : রুবেলা কি?
উত্তর : ভাইরাসজনিত এক ধরনের হাম, যা ৩-১৫ বছর বয়সী শিশুদের হয়।
১৬.প্রশ্ন : হাদীছগ্রন্থ 'বুখারী শরীফ'-এর প্রথম বাংলা অনুবাদ করেন কে?
উত্তর : আল্লামা আজিজুল হক।
১৭.প্রশ্ন : বাংলাদেশের স্থলপথের ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : বেনাপোল (যশোর)।
১৮.প্রশ্ন : ২০১২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের কতজন ব্যক্তিত্ব র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার লাভ করেছেন?
উত্তর : ১১ জন।
১৯. কোন দেশ বাংলাদেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে?
উত্তর : রাশিয়া।
২০. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী জাতীয় মাথাপিছু আয় কত?
উত্তর : ৮৪৮ মার্কিন ডলার।
২১. প্রশ্ন : বাংলাদেশ সর্বশেষ কোন দেশে দূতাবাস খুলে?
উত্তর : মরিসাস।
২২.আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনাল) সংশোধন বিল জাতীয় সংসদে পাশ হয় কোন তারিখে?
উত্তর: ১৩ জুন ২০১২।
২৩. বর্তমানে বাংলাদেশে মোট বনভূমির আয়তন-
উত্তর : ১.৬০ মিলিয়ন হেক্টর।

সাধারণ জ্ঞান (আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী)

১. প্রশ্ন : আন্ড্রয়েড (Android) অপারেটিং সিস্টেম চালিত ট্যাবলেট কম্পিউটার কোন কোম্পানির? উত্তর : গুগল।
২. প্রশ্ন : বর্তমান জাতিসংঘের প্রধান পরমাণু পরিদর্শক কে?
উত্তর : হারম্যান নাকার্টাস।
৩. প্রশ্ন : ইসরাঈল কর্তৃক দখলকৃত পশ্চিম তীর কোন দেশের অংশ?
উত্তর : জর্ডান (ইসরাইল ১৯৬৭ সালে দখল করে)।
৪. প্রশ্ন : তোপকাপি মিউজিয়াম কোন দেশে অবস্থিত?
উত্তর : ইস্তাম্বুল (তুরস্ক)।
৫. প্রশ্ন : যুক্তরাজ্যের সীমান্তরক্ষী সংস্থার নাম কি?
উত্তর : যুক্তরাজ্য বর্ডার এজেন্সি (UKBA)।
৬. প্রশ্ন : ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থার নতুন রকেটের নাম কি?
উত্তর : ভেগা (Vega)।
৭. প্রশ্ন : ২০১১ সালে বিশ্বে কয়লা উৎপাদন ও আমদানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি? উত্তর : চীন।
৮. প্রশ্ন : বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ ও উচ্চতম সেতু কোন দেশে অবস্থিত?
উত্তর : চীনে।
৯. প্রশ্ন : বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ ও উচ্চতম সেতুর নাম কি?
উত্তর : অ্যাজহাই এক্সট্রা লার্জ সাসপেনশন ব্রিজ (চীন) (দৈর্ঘ ১১৭৬ মিটার)।
১০. প্রশ্ন : মোবাইল ওয়ার্ল্ড ক্যাপিটাল বা মোবাইল রাজধানী হিসেবে খ্যাত কোন শহর? উত্তর : বার্সেলোনা, স্পেন।
১১. প্রশ্ন : বিশ্বের সর্বোচ্চ যোগাযোগ টাওয়ার এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম ভবনের নাম কি? উত্তর : টোকিও স্কাই ট্রি (জাপান)।
১২. প্রশ্ন : কোন দেশের সামরিক বাহিনী স্থায়ীভাবে 'টাটমাদাও' নামে পরিচিত? উত্তর : মিয়ানমার।
১৩. প্রশ্ন : বিশ্বে সামরিক ব্যয়ে শীর্ষ দেশের নাম কি?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র (দ্বিতীয় চীন)।
১৪. প্রশ্ন : ইন্টারনেটভিত্তিক হ্যাকিংয়ের প্রথম ভাইরাসটির নাম কি?
উত্তর : মরিস ওয়ার্ম।
১৫. প্রশ্ন : ২০১২ সালের 'বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি' প্রতিবেদনের তথ্যানুসারে, বিশ্বে মেগাসিটির সংখ্যা কতটি?
উত্তর : ২১টি।
১৬. প্রশ্ন : রাশিয়ায় প্রথম ইসলামিক টেলিভিশনের সম্প্রচার শুরু হয় কবে এবং কি নামে সম্প্রচার শুরু হয়?
উত্তর : ১৯ আগস্ট ২০১২, এএল-আরটিভি নামে।
১৭. প্রশ্ন : বাথ পার্টি কত সাল থেকে সিরিয়া শাসন করছে?
উত্তর : ১৯৬৩ সাল থেকে।
১৮. প্রশ্ন : বর্তমানে জাতিসংঘের কতটি শান্তি মিশন কার্যক্রম চালু রয়েছে?
উত্তর : ১৬টি
১৯. প্রশ্ন : মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশে কোন সংবিধান বা সংসদ নেই?
উত্তর : সউদী আরবে।
২০. প্রশ্ন : পৃথিবীর বৃহত্তম বিমান বন্দরটি কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : সউদী আরবের দাম্মামে।
২১. প্রশ্ন : পৃথিবীর বৃহত্তম শহর কোনটি? উত্তর : নিউইয়র্ক।
২২. প্রশ্ন : সিঙ্গাপুর রাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট কে?
উত্তর : ইনসিক ইউসুফ ইসহাক।
২৩. প্রশ্ন : চাঁদে অবতরণকারী প্রথম মানব নীল আর্মষ্ট্রং কত তারিখে মারা যান? উত্তর : ২৫ আগস্ট ২০১২।
২৪. প্রশ্ন : বিশ্বের কোন দেশ সবচেয়ে বেশি শরণার্থী আশ্রয় দিয়েছে?
উত্তর : পাকিস্তান।
২৫. প্রশ্ন : বিশ্বের কোন দেশের মানুষ বেশি শরণার্থী হয়েছে?
উত্তর : আফগানিস্তান।
২৬. প্রশ্ন : ভারতের কোন রাজ্য সরকার বাংলাকে সেখানকার ২য় রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে? উত্তর : ঝাড়খন্ড।
২৭. প্রশ্ন : কোন দেশকে ইউরেশীয় দেশ বলা হয়? উত্তর : তুরস্ক।
২৮. প্রশ্ন : বর্তমানে বিশ্বে স্বাধীন দেশের সংখ্যা কত? উত্তর : ১৯৫টি।